মিলারেপা

তিব্বতের প্রাণ পুরুষ

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি

শেফালিকা প্রকাশনী
৬৪ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

গ্রন্থাকারে প্রথম প্রকাশ
ফাল্গুন ১৩৬৬

প্রকাশিকা
শ্রীমতী শেফালিকা কীর্তি
শেফালিকা প্রকাশনী
হার্ভার্ড কলেজ ভবন
৬৪ বিপিনবিহারী গাঙ্গুলি স্ট্রীট
কলিকাতা ১২

মুদ্রাকর
শ্রীকমল ভট্টাচার্য
লক্ষ্মী প্রিন্টিং য়্যাণ্ড কোং
৭ শুঁড়া ক্রশ লেন
কলিকাতা ১০

প্রচ্ছদ শিল্পী
ইশা মহম্মদ

দাম চার টাকা পঞ্চাশ নয়া পয়সা

মিলারেপার অলোকসামান্য জীবন-
কাহিনীর প্রতি যিনি প্রথম আমার
দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন, এ যুগের
অন্যতম প্রাণপুরুষ, সেই মহর্ষি রমণের
পূত স্মৃতির উদ্দেশে, এবং যিনি এই
রচনায় আমাকে অনুপ্রাণিত করে-
ছিলেন, সেই পরম পূজনীয় কালাদার
নামে ক্ষুদ্র গ্রন্থখানি উৎসর্গ ক'রে আমি
ধন্য হলাম।

—লেখক

ভূমিকা

সুবিখ্যাত সাপ্তাহিক হিমাদ্রির পৃষ্ঠায় এই বইখানি ধারাবাহিকভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল বেশ কয়েক বৎসর আগে। তখন থেকে এ-যাবৎ বহু পাঠকের কাছ থেকে এই লেখাটি পুস্তকাকারে প্রকাশ করবার সনির্বন্ধ অনুরোধ পেয়েছি। মিলারেপার অলোকসুন্দর জীবন-কাহিনী বাংলা ভাষায় এই প্রথম প্রকাশিত হ'ল যাঁদের সহায়তায় ও উৎসাহে—তাঁদের ঋণ অপরিশোধ্য।

নান্তুর সহায়তা ও ঐকান্তিক উৎসাহ না থাকলে এ বই প্রকাশিত হ'ত না। রেণু, সাধু ও বিবি আন্তরিক আগ্রহে পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত ক'রে দিয়েছে। মনীষী, রুমু ও সুধীনদা ক্রমাগত উৎসাহিত করেছে। কিন্তু এদের ধন্যবাদ দেবার মত ভাষা আমার নেই। খ্যাতনামা চিত্রশিল্পী ইশা মহম্মদ সাগ্রহে প্রচ্ছদপট এঁকে দিয়ে আমাকে কৃতজ্ঞতা-পাশে বেঁধে রেখেছে। লক্ষ্মী প্রিন্টিংএর শ্রীকমল ভট্টাচার্যের কাছেও আমি কৃতজ্ঞ নানাকারণে।

ডক্টর ইভান্স্ ওয়েঞ্জের লেখা থেকে এ বইয়ের বহু তথ্য সংগ্রহ করেছি। তাঁর কাছে আমি কৃতজ্ঞ। কাটমাণ্ডু থেকে পায়ে হেঁটে রক্সৌল পর্যন্ত পরিভ্রমণের পথে, নেপাল তিব্বত সিকিম সীমান্তে মিলারেপার জীবন্ত প্রভাব আমি নিজের চোখে দেখে এসেছি। বাংলাদেশে যে মহামানবের নাম প্রায় অপরিচিত, তিনি ওই সমস্ত অঞ্চলে দ্বিতীয় বুদ্ধের গৌরবে সমাসীন: মঠে মঠে তাঁর জীবনী ও বাণী-সম্বলিত মহাগ্রন্থের পুজা-পাঠ হয়।

এই মহাজীবনের সামান্য একটু দিগ্‌দর্শন মাত্র এখানে পাওয়া যাবে। কিন্তু তারও দাম কম নয়। ভূমিকায় এইটুকুই কেবল বলে রাখলাম।

শ্রীবিভুপদ কীর্ত্তি



মধ্যমণি—মিলারেপা

পটভূমিকা…

মহাযোগী মিলারেপার রহস্যময় জীবন-কাহিনী বহু যুগের তমসায় আবৃত। তুষারাবৃত হিমালয়ের অন্তরালে, দূর-দুর্গম তিব্বতের রহস্যময় অন্ধকারে; মিলারেপার অভূতপূর্ব জীবন-কাহিনী প্রতিবেশী ভারতবর্ষের কাছে পর্যন্ত এ-যাবৎ অস্পষ্ট হয়ে আছে। অথচ তিব্বতের সাধন-রহস্য ভারতবর্ষেরই যোগশাস্ত্রের সম্মিলিত প্রকাশ ছাড়া আর কিছুই নয়। এই কথাটি ভাল ক'রে বুঝতে হ'লে, তিব্বত এবং ভারতবর্ষের মধ্যে অতীতের বহু-যুগপ্রসারী যে যোগসূত্রটি বিদ্যমান ছিল, তারই কতকগুলো অধ্যায় ইতিহাসের আলোয় নতুন. ক'রে পরীক্ষা ক'রে দেখা দরকার।

তিব্বতের সম্বন্ধে, এমনকি আধুনিক তিব্বতের সম্বন্ধে কতটুকুই বা আমরা জানি। আমরা জানি তিব্বত লামাদের দেশ, আধ্যাত্মিকতার দেশ, যাদুবিদ্যার দেশ—দুরতিক্রম্য চিরতুষারাবৃত অরণ্য-বেষ্টিত একটি অজ্ঞাত মহাদেশ। সেখানকার অধিবাসীদের রীতিনীতি আচার-ব্যবহার, ধরনধারন আমরা কিছুই জানি না। যে স্থানের উপত্যকা-গুলির উচ্চতা সমুদ্রতল থেকে প্রায় ১৫৬০০ ফুট, তার সম্বন্ধে আমাদের কৌতূহল নিছক হতাশায় পরিণত না হ'য়ে পারে না। প্রথমতঃ তিব্বতে যাওয়া সহজ নয়। দ্বিতীয়তঃ কোনোরকমে সেখানে গিয়ে উপনীত হ'লেই যে লামাদের জীবন-রহস্যের মর্মস্থলে প্রবেশ লাভ করা যাবে তা নয়।

দার্জিলিঙ অঞ্চলে এবং কলকাতা সহরে মাঝে মাঝে বাণিজ্যরত যে দু-পাঁচজন তিব্বতী লামাকে আমরা দেখি, সচরাচর তাদের আমরা অজ্ঞাতকুলশীল বিদেশী বলেই মনে করি; কারণ আমরা না জানি তাদের

ভাষা, না জানি তাদের ধর্ম ও সামাজিক জীবনের কোনো কথা। অথচ যারা জানেন তারা বলেন, তিব্বতের আনুমানিক পঞ্চাশ থেকে ষাট লক্ষ অধিবাসীবৃন্দ ভারতবর্ষীয় জনগণেরই স্বগোত্র। চার লক্ষ তেষট্টি হাজার বর্গমাইল এই বিশাল ভূখণ্ডের নীতি ধর্ম সমাজ ব্যবস্থার পিছনে প্রাচীন ভারতবর্ষের যে অসামান্য দান ছিল, তার মূল অনুসন্ধান করতে হ'লে আমাদের ফিরে যেতে হবে কতকটা প্রায় প্রাগৈতিহাসিক যুগের কাছাকাছি।

তেরশ' বছর আগে রাজত্ব করতেন তিব্বতের এই বিশাল ভূখণ্ডে বৌদ্ধসম্রাট সং-সেন্-গাম্পো। যতদূর জানা যায় তিব্বতের তিনিই প্রথম একচ্ছত্র বৌদ্ধসম্রাট। তুর্কস্থান এবং নেপাল ছিল তাঁরই অধীনে এবং এ-কথাও মনে করবার কারণ আছে যে বিশালকায় চীন সাম্রাজ্যকেও একদা তাঁর আনুগত্য স্বীকার করতে হয়েছিল। সম্রাট গাম্পো বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে বজ্রযান বৌদ্ধ শাখার আওতায় কেমন ক'রে এলেন সে সম্বন্ধে নিশ্চয় ক'রে কোনো সিদ্ধান্ত করা না গেলেও অনুমান করা যায় যে এই সংঘটনের মূলে তাঁর প্রধান দুই মহিষীর কিছু-না-কিছু প্রভাব নিশ্চয়ই ছিল। কারণ এই দুইজনই ছিলেন বৌদ্ধ। সে যাই হোক্, সম্রাট গাম্পো বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ ক'রে একান্ত ধর্মগতপ্রাণ হ'য়ে উঠেছিলেন এবং তাঁর সভাপণ্ডিত 'সম্ভোট্'কে প্রচুর ধন সম্পদ দিয়ে ভারতবর্ষে পাঠিয়েছিলেন।

সম্ভোটের ভারতবর্ষে যাত্রার প্রধান উদ্দেশ্য ছিল ভারতের প্রাচীন অধ্যাত্ম বিদ্যার দুর্লভ গ্রন্থচয়ের আবিষ্কার ও সংগ্রহ। ভারতবর্ষের দিকে দিকে পরিভ্রমণ ক'রে তিনি অসংখ্য হস্তলিখিত পুঁথি সংগ্রহ ক'রে নিয়ে তিব্বতে ফিরে গেলেন। এই অভিযানের ফলে একদিক দিয়ে যেমন ভারতবর্ষের নিজস্ব সম্পদ বহুল পরিমাণে দেশান্তরে চলে গেল, তেমনি আবার এ-কথাও ঠিক যে ভারতবর্ষের বহুমূল্য এবং দুষ্প্রাপ্য পুঁথিগুলি এইভাবে স্থানান্তরিত না হ'লে

হয়তো তাদের অধিকাংশেরই লুপ্ত হ'য়ে যাবার আশঙ্কা ছিল। এই ঘটনা ঘটেছিল খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীর মাঝামাঝি।

এর পরে খ্রীষ্টীয় ১০৩৮ অব্দে ভারতবর্ষ থেকে আর এক ধর্মগুরু ভারতবর্ষের কৃষ্টি এবং অধ্যাত্মসম্পদ বহন করে তিব্বতে এসে উপস্থিত হলেন। তাঁর নাম অতীশ। তিনি ছিলেন বাঙ্গালি। গৌড়ের রাজপরিবারে তাঁর জন্ম হয়েছিল ৯৮০ খ্রীষ্টাব্দে। মগধের সুবিখ্যাত বিক্রমশীলা মঠের দর্শনশাস্ত্রের ভারতবিশ্রুত অধ্যাপক এবং অধ্যক্ষ রূপে তাঁর খ্যাতি এবং প্রতিপত্তি ছিল অনন্যসাধারণ।

মিলারেপার অধ্যাত্ম সাধনার ধারাবাহিক ইতিহাসে বাঙ্গালি অতীশের সুস্পষ্ট কোনো স্থান হয়তো নেই। অতীশ যে অধ্যাত্মজ্ঞানের বাহন হয়ে তিব্বতে এসেছিলেন, তার সঙ্গে ব্যবহারিক যোগশাস্ত্রের কতখানি যোগাযোগ ছিল সে বিচার এখানে নিষ্প্রয়োজন। কিন্তু যে পটভূমিকায় মিলারেপার উদ্ভব, সেখানে অতীশের দান যে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ—সে-কথা অস্বীকার করবার উপায় নেই। ঐতিহাসিক পারম্পর্যের যে ধারাটি বিস্মৃত কালের অপরাজেয় তমসায় অবলুপ্ত হ'য়ে গেছে, তাকে উদ্ধার করা কঠিন হলেও এ-কথা আজ জোর ক'রেই বলা চলে যে বাংলার ধর্মগুরু শ্রীজ্ঞান অতীশ দীপঙ্করের জ্যোতির্ময় প্রভাব সেকালে তিব্বতীয় অধ্যাত্ম-ধর্মজগতের দিক-দিগন্তে পরিব্যাপ্ত হ'য়ে গিয়েছিল। মিলারেপার জীবনে—বিশেষতঃ তাঁর পরবর্তী জীবনে এই প্রভাব এতই সুস্পষ্ট যে তার আক্ষরিক প্রমাণ নিষ্প্রয়োজন। মিলারেপার সঙ্গে অতীশ দীপঙ্করের সাক্ষাৎ সংযোগ যদি বা কখনো না ঘটে থাকে, তথাপি ইতিহাস এ সত্য অস্বীকার করতে পারে নি যে অতীশ ছিলেন মিলারেপার গুরু মার্‌পার অন্যতম শিক্ষাদাতা। সেই সূত্রে, মার্‌পার মাধ্যমে—আধ্যাত্মিকতার যে বহমান ধারাটি মিলারেপাকে কেন্দ্র ক'রে সমগ্র তিব্বতের ধর্মসাধন-ক্ষেত্রে বিস্তৃত হয়ে গিয়েছিল—তার উৎস অনুসন্ধান করতে গেলে শেষ পর্যন্ত ফিরে

আসতে হয় সে যুগের তন্ত্র ও যোগ সাধনার পীঠস্থান এই বাংলা দেশে।

এই দিক দিয়ে বিচার করলে তিব্বতের যোগীরাজ মিলারেপা এক মুহূর্তে আমাদের ঘরের লোক হয়ে উঠেন। তাঁর সমগ্র জীবনের সমস্ত অভিব্যক্তি, ত্যাগ-বৈরাগ্যে, দৈন্য-তপস্যায় উদ্ভাসিত হয়ে আমাদের যুগযুগান্তের পরিচিত আদর্শলোকে মূর্ত হয়ে ওঠে। মানবাত্মার মাহাত্ম্য-মন্ত্রকে যাঁরা যুগে যুগে বিশ্বলোকের অমৃত-উৎসবে, নব নব রূপে জীবনব্যাপী সাধনায় প্রতিধ্বনিত করে তুলেছেন—মিলারেপা তাঁদেরই স্বগোত্র, তাঁদেরই অন্যতম। সেই সঙ্গীতময় মহামন্ত্রের মূল ধুয়াটিই তাঁর জীবনে আমরা শুনি। তাঁর জীবনে দেখি সেই প্রাচীন ভারতের গুরুকুলের দ্বার যেন নবতম মহিমায় অর্গলমুক্ত হয়ে গেছে। তিনি বৌদ্ধ ছিলেন কি হিন্দু ছিলেন, যোগী ছিলেন কি তান্ত্রিক ছিলেন, তিব্বতীয় মহাযান, হীনযান বা অন্য কোন পথের পথিক তিনি ছিলেন সে প্রশ্ন অবান্তর হয়ে ওঠে। তাঁর জীবনে যে রসের আবির্ভাব ঘটেছিল, সত্য-তপস্যার, পূর্ণ উপলব্ধির অভ্যুদয় হয়েছিল এইটিই বড় কথা। যে আনন্দে তিনি দুঃখকে স্বীকার করে নিয়েছিলেন, সেই আনন্দকে ভূমার আনন্দ বলে চিনতে ভুল হয় না। দেখি তাঁর মধ্যে সুখ-দুঃখ পূর্ণ হয়ে উঠেছে, আনন্দ-বেদনা একটি সুরের ঐকতানে অপরূপ হয়ে বেজে উঠেছে। সর্বগ্রাসী শিখাময় বিপুল একটি হোমানলে তাঁর জীবন-মৃত্যু, অন্তর-বাহির যেন জ্বলন্ত সমিধের মত অগ্নিময় হয়ে উঠেছে।

কেবলমাত্র সেই দিক দিয়েই তিব্বতীয় মহাযোগীর জীবনীর সার্থকতা। মিলারেপার অলৌকিক জীবনের চারিপাশে জড়ানো আছে বহুবিধ অসম্ভব ও অত্যাশ্চর্য কাহিনীর লতাপাতা। প্রচলিত অর্থে, আমাদের সঙ্কীর্ণ অভিজ্ঞতার দৃষ্টিতে, সেগুলি হয়তো নিরর্থক অতিশয়োক্তি বা নিছক প্রলাপ বলেই মনে হবে; এবং সেই মনে হওয়ার জন্য কোন লোককে দোষ দেওয়াও যায় না। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে

পাঠককে এই কথাটাও মনে রাখতে হবে যে এই বিশ্বসৃষ্টির সমস্ত রহস্য আমাদের বুদ্ধিগম্য নাও হতে পারে। প্রত্যক্ষতার স্থূল দাবী সর্বক্ষেত্রেই যে প্রয়োগ করা যাবে এমন নয়। আমাদের জানার বাইরে, বিচারের বাইরে, দেখা-শোনা-বোঝার বাইরে হয়তো বা এমন একটা অজানা বিস্ময়ের গভীর-লোক আছে, যার কিছুই আমরা জানি না, কল্পনা করতে পারি না, অনুমান করতেও পারি না। কিন্তু তবু তার অস্তিত্বকে অস্বীকার করতেও পারি না—উড়িয়ে দিতেও পারি না। কার্যকারণ সম্বন্ধের যতটুকু আমাদের জানা আছে, কেবলমাত্র সেই মানদণ্ডটুকুকে সম্বল করে গুহাহিত সত্তার পরমতম রহস্যের পরিমাপ করার প্রচেষ্টায় আর যাই থাক, সার্থকতা নেই। তা ছাড়া, সর্ব যুগে সর্ব কালে, পৃথিবীর সভ্য-অসভ্য যাবতীয় ভূ-খণ্ডের ধর্মবিশ্বাসের সঙ্গে যে অলৌকিকবাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা অল্পবিস্তর জড়িয়ে আছে, তাকে অস্বীকার করলেই যে সে এককথায় মিথ্যা হয়ে যাবে এমনতর আশা করা চলে না। আমরা বিশ্বাস করি আমাদের জানার বাইরেও শক্তি আছে। বিজ্ঞানের যতটুকু জানার মধ্যে এসেছে, সেই পরিধির বাইরে যা কিছু ঘটে—সেখানেও আছে আর একটি বিজ্ঞান। তার সংজ্ঞা আমরা না জানলেও সে বিজ্ঞান মিথ্যা নয়। আমাদের বুদ্ধি বিচার অভিজ্ঞতার সীমানায় যার হিসাব পাই না, তাকেই আমরা অলৌকিক বলে এক ফুৎকারে নিশ্চিহ্ন ক'রে দিতে চাই। কিন্তু কতটুকু আমাদের বুদ্ধি বিচারের সীমানা?

মিলারেপার জীবন-কাহিনীর পটভূমিকা হিসাবে যেটুকু বলার প্রয়োজন তা মোটামুটি বলা হয়েছে। এর পরে কেবল এইটুকু বললেই বলা শেষ হয় যে তাঁর জীবনের সমস্ত কাহিনী তিনি আগাগোড়া নিজের মুখেই বলে গেছেন এবং এই আত্মকথা প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তাঁর অতি-বিশ্বস্ত শিষ্যের দ্বারা লিপিবদ্ধ হয়েছে। অতএব ধরে নেওয়া যেতে পারে যে ঘটনাগুলির প্রামাণ্য সম্বন্ধে সন্দেহের কিছু

নেই। আজ পর্যন্ত তিব্বতের আপামর জনসাধারণ, শিক্ষিত অশিক্ষিত স্ত্রী পুরুষ নির্ব্বিশেষে, ঐকান্তিক শ্রদ্ধায় সমগ্র কাহিনীটির প্রত্যেকটি অংশকে সমভাবে।বশ্বাস করে। ভারতবর্ষে হিন্দুদের মধ্যে রামায়ণ-মহাভারতের যে স্থান, তিব্বতীয়দের মধ্যে মিলারেপা-জীবনী 'জেতস্থুন-কাবুমের' স্থান প্রায় তদনুরূপ বললে কিছুমাত্র অত্যুক্তি হয় না।

খ্রীষ্টীয় ১০৫২ সালের শরৎ কালে—যতদূর জানা যায়, আগস্ট মাসের মাঝামাঝি, তিব্বতীয় গুন্-থাং প্রদেশের অন্তর্গত কিয়াং-সা উপত্যকায় মিলারেপার জন্ম হয়েছিল। কিয়াং-সা উপত্যকার স্থিতি নির্দেশ করতে হলে, নেপাল সীমান্তে আধুনিক কাটমাণ্ডুর ন্যুনাধিক পঞ্চাশ মাইল উত্তরে কিরং নামধেয় অঞ্চলটির কয়েক মাইল পূর্বে অনুসন্ধান করতে হবে। মানচিত্রে অবজ্ঞাত দুরধিগম্য এই পার্বত্য গণ্ডগ্রামটির নাম মিলারেপার পুণ্যস্মৃতিতে জড়িয়ে আজ পর্যন্ত অমর হয়ে আছে।

মিলারেপার জন্মকালে তাঁর বাবা মিলা সেরাব গিয়ালৎসেন ব্যাবসার খাতির দূরদেশে অবস্থান করছিলেন। নবজাতকের সংবাদ দিয়ে জননী কার্‌মো-কিয়েন মহানন্দে দূত পাঠিয়ে দিলেন। উৎফুল্ল পিতা তাড়াতাড়ি কাজকর্ম সেরে ঘরে ফিরে এলেন। ঘটা ক'রে নামকরণ উৎসব সম্পন্ন হল। সারা গ্রাম জুড়ে কয়েকদিন ধরে চললো বিপুল সমারোহ। রাজা-রাজড়ার ঘরে যত রকমের অনুষ্ঠান হয়, তার কিছুই বাদ গেল না। সাধারণভাবে ধনী পরিবার বলতে যা বোঝায়—এঁরা ছিলেন তার চেয়েও কয়েক ধাপ উপরে। বাণিজ্যের লক্ষ্মী কয়েক পুরুষ ধরে এই সংসারে অচলা হয়ে অধিষ্ঠিতা ছিলেন। জায়গা জমি, ধনরত্ন কিছুরই অভাব ছিল না।

মিলারেপার বয়স যখন চার বৎসর, তখন তাঁর ছোট বোন 'গন্‌মা

কাইতের' জন্ম হ'ল। ফুটফুটে সুন্দর মেয়েটিকে সবাই ডাকতো 'পেতা' বলে। মিলা সেরাবের প্রকাণ্ড পৈত্রিক গৃহ শিশুকণ্ঠের কলরবে মুখরিত হয়ে উঠলো। এমনি ক'রে কাটলো কয়েক বছর। মিলারেপার বয়স যখন মাত্র সাত বছর, তখন এই আনন্দের ঘরে অকস্মাৎ এসে পড়লো মৃত্যুর করাল ছায়া। মিলা সেরাব গিয়ালৎসেন অসুখে পড়লেন। নিকটে দূরে যেখানে যত ছোট বড় লামা চিকিৎসক ছিল, সবাই একে একে এসে জড়ো হ'ল। কিন্তু রোগীর অবস্থা যেভাবে দিনে দিনে ক্ষীণ হতে ক্ষীণতর হতে লাগলো, তাতে আত্মীয়-পরিজন বন্ধুবান্ধব কারুর বুঝতে বাকি রইলো না যে তাঁর জীবন-প্রদীপ তৈলাভাবে ক্রমেই নিভে আসছে।

এমনি সময় একদিন, অত্যাসন্ন মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে মিলা সেরাব গিয়ালৎসেন সমস্ত আত্মীয় বন্ধুদের রোগশয্যাপার্শ্বে ডেকে পাঠালেন। ইতিমধ্যে তিনি তাঁর অন্তিম ইচ্ছা ও নির্দেশ লিপিবদ্ধ করে রেখেছিলেন। সবাইকার সামনে সেই লিখিত নির্দেশটি পঠিত হবার পরে, সমবেত আত্মীয়মণ্ডলীকে উদ্দেশ করে তিনি বললেন, 'আমার দিন শেষ হয়ে আসছে জেনে আমি আপনাদের ডেকেছি। আমার বাড়ি-ঘর, জমি-জায়গা, গরু-ছাগল-মেষপাল, ক্ষেত-খামার, টাকা-পয়সা, সোনা-রূপার তৈজসপত্র সমেত সমস্ত সম্পত্তি আমার ছেলেমেয়ের জন্য রইলো। এই সমস্ত ধনসম্পদের একাংশ আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় ব্যয় হবার পরেও যা অবশিষ্ট থাকবে সে সবই রেখে গেলাম আপনাদের তত্ত্বাবধানে। আপনারা সবাই—বিশেষ করে আমার ভ্রাতা ও ভ্রাতৃবধূ আমার পুত্র-কন্যার হয়ে এ সমস্ত রক্ষণাবেক্ষণ করবেন। যতদিন না এরা বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে নিজেদের প্রাপ্য বুঝে নিতে পারে, এ ভার রইলো আপনাদের সবাইকার উপরে। এই সঙ্গে আরও একটি কথা আপনাদের বলে যাই। জেসে আমার বাগ্‌দত্তা পুত্রবধূ। মিলারেপার একান্ত শৈশবকাল থেকেই এ বিষয়ে উভয়-

পক্ষের পাকা কথা দেওয়া আছে। বয়ঃপ্রাপ্ত হয়ে এরা যাতে যথা-সময়ে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ হতে পারে—সে ভার রইলো আপনাদের উপরে। সেদিন যেন এরা নিজেদের প্রাপ্য সব কিছু কড়ায়গণ্ডায় আপনাদের কাছ থেকে বুঝে পায়—এই রইলো আমার অন্তিম নির্দেশ। মৃত্যুর পরে যেখানেই আমি থাকি, সেখান থেকে আমি দেখবো আপনারা কিভাবে আপনাদের দায়িত্ব পালন করেন।'

এই কয়েকটি কথা বলেই দূরের যাত্রী চোখ বুজলেন। অপ্রাপ্ত বয়স্ক দুটি সন্তানের হাত ধরে বিধবা মাতা অনাগত ভবিষ্যতের পানে স্তব্ধ হয়ে তাকিয়ে রইলেন। একবাড়ি লোকজন আত্মীয়স্বজন চিরাচরিত প্রথানুসারে গগনভেদী আর্তনাদ করতে লাগালেন। সেদিন অনুমান করবারও সাধ্য ছিল না যে অদৃশ্যের পটভূমিকায় এই বিয়োগান্ত নাট্যের শেষ অধ্যায় এই আর্তনাদ দিয়েই সূচিত হ'ল। মৃতের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া সুসম্পন্ন হয়ে যাবার পরেই সংসারের রূপ গেল বদলে। মিলারেপার অভিভাবকেরা সমস্ত ঐশ্বর্য-সম্পত্তির ভার নিলেন, এবং এমন পরিপূর্ণ ভাবেই নিলেন যে দৈনন্দিন সংসার খরচের অপচয় একেবারেই বন্ধ হয়ে গেল। শূন্য পুরীতে তিনটি ভাগ্যবিড়ম্বিত কায়ক্লেশে কোনরকমে বেঁচে রইলো, আর তাদের বুভুক্ষু দৃষ্টির সমক্ষে তাদেরই মুখের গ্রাস অপহরণ করে ও-বাড়িতে উৎসব সমারোহ শুরু হয়ে গেল। আশেপাশে দশ-বিশটা জনপদের লোকে বুঝলো ঘটনাস্রোত দুর্বার গতিতে কোন পথে চলেছে, কিন্তু প্রবলের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করবার মত সাহস কারুরই ছিল না। যাদের প্রাণে একটু সহানুভূতি ছিল, তারা নিঃশব্দে চোখ মুছলো এবং লুকিয়ে-চুরিয়ে দু'এক মুষ্টি গম বা বার্লি অথবা শীতের বস্ত্রখণ্ড দিয়ে দরিদ্র পরিবারকে সাহায্য করতে লাগলো। আর যারা নিজেদের নিয়েই ব্যস্ত, তারা বিরস বদনে নিয়তি বা কর্মফলের দোহাই দিয়ে ক্ষান্ত হ'ল। সংসারের হৃদয়হীন চক্র সমভাবে আবর্তিত হতে লাগলো।

কাকা বললেন, 'এ সমস্ত সম্পত্তি আমাদের পৈত্রিক; দাদার মৃত্যুর পর আমার প্রাপ্য আমি বুঝে নিয়েছি। এতে কারুর কিছু ভাগ নেই। কেউ যদি মনে করে তার পাওনা আছে, সাধ্য থাকে আদায় করুক। সংসারে যারা নিঃস্ব তারাও যখন বেঁচে থাকে, তখন ওদের জন্য বিশেষ করে দুশ্চিন্তা করবার হেতু কি? কাক চিল পশু পাখীর মত বাঁচে বাঁচুক, মরে মরুক! যার যা নিয়তি—আমি তার কি করতে পারি! এ বাড়ি থেকে আরম্ভ করে জমি জায়গা সবই আমার।'

শুধু বলেই ক্ষান্ত হলেন না। মিলারেপার মাকে তাঁর স্বামীর প্রাসাদতুল্য অট্টালিকা থেকে মারধর করে তাড়িয়ে দিলেন। জনমত নিস্তব্ধ হয়ে রইলো, কারণ দুর্বল কোনদিনই সবলের বিরুদ্ধাচরণ করে না। মিলার মা একান্ত নিরুপায় হয়ে পুত্র-কন্যার হাত ধরে ভিখারিণীর মত কালাতিপাত করতে লাগলেন। দিনান্তে কোনদিন একমুষ্টি জোটে, কোনদিন জোটে না। শীতের দিনে প্রচণ্ড শীতে ভাঙা ঘরে ভূমিশয্যায় তাদের দিন কাটে। বিবাহের সময় যৌতুক স্বরূপ যে দু'এক খণ্ড জমি তিনি পেয়েছিলেন—তার ফসল আর কতটুকুই বা হয়? তারও সবটুকু ঘরে আসে না।

প্রথম আঘাতের বিহ্বলতা কাটিয়ে ওঠে কারমো-কিয়েন নিজের পায়ে ভর দিয়ে সোজা হয়ে দাঁড়ালেন। তিনি বুঝলেন সংসারে কারুর কাছে প্রত্যাশা করবার কিছু নেই, অথচ তাঁকে বাঁচতে হবে—ছেলে-মেয়েদের মুখচেয়ে তো বটেই, তার চেয়ে বড় কথা, এই অন্যায় নির্যাতনের প্রতিহিংসার জন্য। প্রতিদিনের অভাব তাঁর অন্তরকে পাষাণে পরিণত করলো। শিশুপুত্র মিলাকে সামনে বসিয়ে বললেন—'শোনো মিলা, যারা বিনাদোষে আমাদের সর্বস্বান্ত করেছে, তাদের আমি ক্ষমা করবো না। প্রতিশোধ আমাদের নিতেই হবে। তুমিই আমার একমাত্র আশা-ভরসার স্থল। তোমাকে মানুষ হতে হবে, শক্তিমান হতে হবে, অন্যায়ের বিরুদ্ধে অভিযান করতে হবে। আমার যেটুকু

জমি আছে সমস্ত বেচে আমি তোমাকে অর্থ যোগাবো। তোমাকে উপযুক্ত গুরু অনুসন্ধান ক'রে তন্ত্রমন্ত্রের সাধনা করতে হবে। গুপ্তবিদ্যা শিখে শত্রু নিধন করতে হবে। যে দুঃখ আমরা পেয়েছি, যে অপমান নির্যাতন আমরা সয়েছি, তার হাজারগুণ ফিরিয়ে দিতে হবে। যদি আমার পুত্র হও, যদি তোমার মধ্যে বিন্দুমাত্র মানুষের রক্ত থাকে— তোমার এই মাতৃআজ্ঞা তোমাকে পালন করতে হবে। যদি না পারো, স্পষ্ট ক'রে বলো, ওই পাহাড়ের চূড়া থেকে নীচের গহ্বরে লাফিয়ে পড়ে আমি তোমার সামনেই আত্মহত্যা করি।'

শিশু মিলা মায়ের বজ্রসুকঠিন মুখের পানে ভয়ে ভয়ে তাকিয়ে বললো– 'পারবো, মা।' মায়ের মুখ প্রসন্ন হাস্যে উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো। তিনি বললেন 'এই তো বাপের ছেলের মত কথা।' ছেলেকে দু-হাত দিয়ে জড়িয়ে বুকে টেনে নিয়ে বললেন—'তুই পারবি, বাবা, পারবি। আমার আশীর্বাদ রইলো তোর রক্ষাকবচ হয়ে। দুধের ছেলেকে আমি যমের বাড়ি পাঠাতে চাই মৃত্যুমন্ত্র শিখে আসবার জন্য, নইলে যে তোরও মুক্তি নেই, আমারও মুক্তি নেই।' তাঁর দু-চক্ষের ধারায় মিলার সারাদেহ অভিষিক্ত হয়ে গেল।

শুরু হয়ে গেল মিলারেপার অলৌকিক জীবনের নিরুদ্দেশের দীর্ঘ পরিক্রমা। বাংলাদেশের তন্ত্রশাস্ত্র সে যুগে যে বাংলাদেশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না, বহু শাখা-প্রশাখা বিস্তার ক'রে সে যে আসমুদ্র হিমাচল প্রদেশেও পরিব্যাপ্ত হয়ে গিয়েছিল এবং বৌদ্ধধর্মের অন্ধ্রেরন্ধ্রে প্রবেশ ক'রে তাকেও বিশেষ ভাবে তন্ত্রাশ্রয়ী ক'রে তুলেছিল—এ সত্য ঐতিহাসিক। পর্বতের পর পর্বত, উপত্যকার পরে উপত্যকা অতিক্রম ক'রে মিলারেপা একাধিক তান্ত্রিক গুরুর কাছে শিক্ষা নিলেন, ঐকান্তিক সরলতায় তাঁর জীবনের আদ্যন্ত বিবরণ প্রত্যেকটি শক্তিধরের কাছে অকপটে নিবেদন ক'রে আনুকূল্য ভিক্ষা করলেন, নির্বিচারে বিভিন্ন আচার্যের প্রত্যেকটি ছোট-বড় আদেশ পালন ক'রে অর্জন

করলেন তাঁদের প্রসন্নতা—এবং পরিশেষে তাঁর বহু আকাঙ্খিত তপস্যার ধন তিনি লাভ করলেন।

মিলারেপার জীবনের প্রত্যন্ত সীমায়, তিনি নিজে এই প্রাথমিক তপশ্চর্যার যে বিচিত্র বিবরণ প্রকাশ করেছেন, তা চিত্তাকর্ষক সন্দেহ নেই। কিন্তু এই বিপথগামী সাধনার বিভৎসতা যে তাঁর অন্তরে বিজাতীয় গ্লানির মত সঞ্চিত হয়েছিল, এ কথা তিনি কখনো অস্বীকার করেন নি। সার্থকতার অমৃতপ্লাবনেও, অপরিণত বয়সের এই অজ্ঞানকৃত দুষ্কৃতি কাঁটার মত নিরন্তর তাঁর বুকে বিঁধেছে। তথাপি মনে হয় তাঁর ভবিষ্যতের পূর্ণাঙ্গ পরিণতির জন্য, বোধ হয়, এই প্রথম জীবনের তিক্ত অভিজ্ঞতার প্রয়োজন ছিল, কারণ বিষের ক্রিয়া পরিপূর্ণভাবে অনুভব না করলে অমৃতসন্ধানী চিত্তের জাগরণ হয় না।

মারণ মন্ত্রে সিদ্ধি লাভ ক'রে মিলারেপা গুরুনির্দিষ্ট পন্থায় সঙ্কল্প সাধনে ব্রতী হলেন। সিদ্ধমন্ত্রের অপ্রতিহত প্রভাবে অন্তরীক্ষ ভেদ ক'রে মূহূর্তের মধ্যে মৃত্যুধ্বংসের করাল ছায়া, মিলারেপার স্বগ্রামে, স্পর্ধিত শত্রুর আশেপাশে বাহুবিস্তার করলো। কাকার বাড়িতে সেদিন এক বিবাহের ভোজ। যেসব আত্মীয় বন্ধু পাকেপ্রকারে মিলারেপা-পরিবারের উচ্ছেদে সহায়তা করেছিল, তারা সবাই সেখানে উপস্থিত। ঝড় নেই, মেঘ নেই, বজ্র-বিদ্যুৎ—কিছুই নেই। অকিঞ্চিৎকর একটা লৌকিক উপলক্ষ্যের মাধ্যমে অকস্মাৎ বিশাল সৌধ উৎপাটিত বৃক্ষের মত হুড়মুড় ক'রে ভেঙে পড়লো এবং এই অতি আকস্মিক সংঘাতে ঘরের লোক থেকে অতিথি অভ্যাগতেরা কেউই রক্ষা পেলো না। কেবল সমস্ত দুষ্কৃতির নায়ক-নায়িকা, মিলারেপার কাকা ও কাকি—এই দুইজন মাত্র এই মহাশ্মশানের মাঝখানে, স্বেচ্ছাকৃত অপরাধের অনুতাপে তিলে তিলে দগ্ধ হবার জন্য কোনরকমে জীবনকে আঁকড়ে বেঁচে রইলো।

এই অতি-অলৌকিক দৈব বিপর্যয়ে জনপদের সমস্ত লোক যে

আতঙ্কিত হয়ে উঠলো, তা বলাই বাহুল্য। কিন্তু কারমো-কিয়েন শতমুখে এই ঘটনাটিকে তাঁর প্রতিহিংসার প্রথম পর্যায় বলে যেভাবে বর্ণনা করতে লাগলেন, তাতে প্রত্যেকেরই মনে ধারণা জন্মালো যে ঘটনাটি নিছক দৈব বলে উড়িয়ে দেওয়া যায় না। গ্রামবাসীদের মনের আতঙ্ক ক্রোধে পরিণত হ'ল। নানারকমের প্রতিক্রিয়া দেখা দিল। বিরুদ্ধ ভাব ক্রমে যখন আক্রমণোদ্যত হয়ে উঠলো, তখন কারমো-কিয়েন পুত্রের কাছে দূতহস্তে পত্র পাঠিয়ে আরও কিছু ভীতিপ্রদ অলৌকিক কর্মের আদেশ জ্ঞাপন করলেন। মায়ের আদেশে মিলারেপাও মন্ত্রবলে এবার শিলাবৃষ্টি ও ঝঞ্ঝার সৃষ্টি ক'রে গ্রামের শস্যক্ষেত্রগুলিকে ধ্বংস ক'রে দিলেন। ঘরে ঘরে উঠলো হাহাকার। মিলারেপা ও তাঁর মায়ের বিরুদ্ধে জনমত উত্তেজিত হয়ে উঠলো। তাঁর আর দেশে ফিরে আসবার পথ রইলো না। ব্যক্তিগত প্রতিহিংসা চরিতার্থ করতে গিয়ে তিনি হয়ে উঠলেন দেশের শত্রু, জাতির শত্রু এবং শেষ পর্যন্ত দেখা গেল, তাঁরই স্বেচ্ছা-প্রজ্জ্বলিত অগ্নিজ্বালায় তাঁর নিজের অন্তর বাহির এককালে প্রধূমিত প্রজ্জ্বলিত হয়ে উঠলো। সার্থক তপস্যার শান্তির বদলে এলো এক অপরিসীম ক্লান্তির বোঝা। তান্ত্রিক গুরুর আশ্রয়ে আত্মগোপন ক'রে কোন রকমে পালিয়ে রইলেন, কিন্তু নিজের কাছ থেকে পালাবার পথ কোথায়? দিবারাত্রির সর্বক্ষণ নিজের কাছে নিজে অপরাধী হয়ে আত্মগ্লানির আগুনে তিনি দগ্ধ হতে লাগলেন। কে যেন অহর্নিশি তাঁর কানের কাছে মুখ রেখে অতি আর্তস্বরে কেঁদে কেঁদে বলতে লাগলো—'মিলা, মিলা,—এ তুমি কি করলে! আগুনের পথে তুমি শান্তিবারি খুঁজতে বেরিয়েছো! কামনায় নিবৃত্তি নেই!'

প্রথম জীবনের এই প্রথম সাফল্য মিলারেপার জীবনে নিয়ে এলো এক দুর্বিষহ পরাজয়ের গ্লানি। বিজয়োল্লাসের পরিবর্তে এলো নৈরাশ্যের অবসাদ। অথচ এই অর্থহীন আত্মগ্লানিরই বা হেতু কি? অন্যায়ের

প্রতিশোধ যদি অন্যায়েই ঘটে থাকে, সংসারের চিরদিনের নিয়মে এর মধ্যে অস্বাভাবিক কি আছে? কোথাকার কে এক সৃষ্টিছাড়া বৈরাগী অহিংসার কথা বলেছেন, ক্ষমার কথা বলেছেন : তাতে সংসারের লুব্ধ, ক্ষুব্ধ, মুগ্ধ জীবনের চিরন্তন ধারাটি কি বদলে গেছে? তথাগত যা বলেছেন, তাতে সংসারের কি এলো গেলো? আমার দুঃখিনী মা কারুর কাছে কোন অপরাধ করেন নি। শক্তির মদে মত্ত হয়ে লোকে আমার মাকে লাঞ্ছিত করেছে—দীনহীনা ভিখারিণী ক'রে দিয়েছে। পুত্রের কর্তব্য আমি করেছি মায়ের আশীর্বাদ পেয়েছি। তবে কেন এই মিথ্যা অশান্তি, কেন এই অহেতুক গ্লানি? তথাগত বুদ্ধের জননীর জীবনে যদি এমনি বিড়ম্বনা ঘটতো—তা হলেও কি সেই অনুপম পুরুষ নির্বিচারে ক্ষমার কথা বলতেন? তথাগত আমাদের মত হলে নিশ্চয়ই বলতেন না। কিন্তু তথাগত যে আমাদের মত ছিলেন না—এ কথাও সত্য। তাঁর পথে চললে আমিও এমন ক'রে দগ্ধ হতাম না—তাও সত্য। কানের কাছে নিরন্তর এই বুকফাটা ক্রন্দনও শুনতে হত না। কিন্তু কে কাঁদে? বাইরের কান্না তো এ নয়—যা কান দিয়ে শোনা যায়। আমারই বুকের মধ্যে বসে এমন ক'রে কে কাঁদে? এই বুঝি তথাগত—আমার বুকে বসে আমারই হিংসার জ্বালায় ব্যথা পেয়েছেন।

এমনি ক'রে অহর্নিশি নিজের মনের আগুনে জ্বলে পুড়ে বালক মিলারেপার জীবনে অবশ্যম্ভাবী এক রূপান্তর ঘটে গেল। বাইরের কেউ জানলো না, বাইরের কেউ লক্ষ্যও করলো না যে অদৃশ্যের পটভূমিকায় আর একটি মহাজীবনের সূত্রপাত হয়ে গেল। কৃতকর্মের অনুশোচনা রূপে যে ছদ্মবেশী আগন্তুক ভাবটি বালক মিলারেপার জীবনে এসে উপস্থিত হল—এর জাত যে আলাদা—ছদ্মবেশী আবরণের নিম্নে এর তাৎপর্য যে সুদূরপ্রসারী, এ সত্য ছাই-চাপা আগুনের মত ধিকিধিকি জ্বলতে লাগলো। বালক

মিলারেপার কৈশোর এই অগ্নিময় উপলব্ধির পথ ধরে পরিণত জীবনের বিপুল বেদনার পথে নিঃশব্দে এগিয়ে চললো। উর্ধ্বের আহ্বান এসে নিম্নজগতের ভ্রান্তিকে লোকোত্তর পথে পরিচালিত করতে লাগলো। দুঃখিনী মায়ের কথা, ছোট বোনটির কথা, বাগ্‌দত্তা বধূ জেসের কথা; অত্যাচার, নিপীড়ন দারিদ্র্যের কথা তিনি যে একেবারে ভুলে গেলেন, তা নয়। কিন্তু তার মনে হতে লাগলো এ সমস্তই যেন নিঃসম্পর্কিত আর একজনের বিস্মৃত বেদনার প্রতিধ্বনি, এসবের সঙ্গে যেন তাঁর নিজের জীবনের কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই; অন্ধকার রাত্রে অনাবৃত আকাশের তলে নিজের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে কিশোর বালক আবিষ্কার করলেন আর একটি সত্যের—আর একটি সত্বার। জীবনে যে একটি চরমতম জিজ্ঞাসার পরমতম উত্তর পাওয়া হয় নি—এই অস্পষ্ট অথচ অতল সমস্যার সম্মুখীন হয়ে তিনি সহসা উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে গেলেন। কি সেই সত্য, কোথায় সেই সত্য, কেমন সে সত্যের রূপ, সে কথা তাঁকে কে বলে দেবে! সেই অজ্ঞাতপূর্ব সত্যের সঙ্গে তাঁর কিসের সম্বন্ধ তাই বা কে জানে? যা জানেন না, তাকে জানতেই বা হবে কেন; যা পান নি, তা না পেলেই বা চলবে না কেন—এ প্রশ্নেরও কোন সদুত্তর নেই। কিন্তু সমস্ত উত্তর প্রত্যুত্তরের এলাকা ছাপিয়ে, তর্ক-যুক্তির প্রসঙ্গ এড়িয়ে, সব কিছু ভাবনা-চিন্তাকে ডুবিয়ে ভাসিয়ে একটিমাত্র গগনপ্লাবি ক্রন্দনের হাহাকার তাঁর জীবনকে এ কোন্ সর্বনাশের পথে নিয়ে যেতে চায়ঃ কে দেবে এই প্রশ্নের উত্তর?

প্রশ্নের উত্তর এল—মৃত্যুর মারফতে। যে গুরুর আশ্রয়ে মিলারেপা ছিলেন, তাঁর এক প্রিয় ভক্তের হ'ল মারাত্মক ব্যাধি। আত্মীয়-পরিজনেরা মহাশক্তিধর তান্ত্রিক গুরুর শরণ নিলেন। যাগ-যজ্ঞ ক্রিয়াকলাপের সমারোহ বড় কম হ'ল না। কিন্তু মৃত্যুকে পরাস্ত করা গেল না। শিষ্যের দেহ শববাহকদের হাতে তুলে দিয়ে বিমর্ষ গুরু কয়েকদিনের মধ্যেই নিজের আবাসে ফিরে এলেন—একেবারে অন্য মানুষ হয়ে।

মিলারেপাকে ডেকে পাঠিয়ে বললেন : বাবা মিলা, সারাজীবন সাধনার নামে ভস্মে ঘি ঢেলেছি ; মৃত্যুর কাছে শিক্ষা পেয়ে আজ জীবনের শেষ প্রান্তে এসে নিজের সম্বন্ধে সচেতন হয়েছি। সর্বকনিষ্ঠ তুমি বয়সের দিক দিয়ে, তাই তোমার কথা মনে ক'রে মনে শান্তি পাচ্ছি না। আমার দৃষ্টান্ত দেখে তুমি সাবধান হও—আমার মত ক'রে ভ্রান্তির পথে ছুটে অমূল্য আত্মার গায়ে কালি মাখিও না। মন্ত্রের শক্তিতে মৃত্যু ঘটিয়েছি ভেবে আমার দম্ভের সীমা ছিল না। মৃত্যুই আমার সে মিথ্যা মোহ ভেঙে দিয়েছে। আমার সারাজীবনের কৃতকর্মের বোঝার উপরে চেপেছে তোমারও দুষ্কৃতি : আমি অনুতাপে দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি। প্রাণের মধ্যে ঘুমিয়ে আছেন যিনি—কোন কালিমা তাঁকে স্পর্শ করে না। আমার নিজের মনের কলুষ আমাকেই ধুয়ে মুছে নির্মল করতে হবে। সে পথ আমি জানি। কিন্তু সে পথ সহজ নয়, কারণ বহির্মুখী মন আর অশুদ্ধ চিন্তার অনধিগম্য সেই ক্ষুরধার দীর্ঘ দুরূহ পন্থা। তবু সেই পথে ছাড়া মুক্তি নেই। তোমাকে আমি বিশ্বাস করি, কারণ আমি জানি অপাপবিদ্ধ তোমার মন। আমার এই ঘর-গৃহস্থালীর সমস্ত ভার যদি তুমি নাও, তাহলে আমি সেই পথের সন্ধানে নিশ্চিন্ত হয়ে যাত্রা করতে পারি : সত্য যদি পাই—সেই তপস্যার ফলে তোমার আমার উভয়েরই মঙ্গল হবে।

মিলারেপা দৃষ্টি নত ক'রে স্থাণুর মত বসে রইলেন। তাঁর মনের ভাব গুরু বুঝলেন ; বললেন : হ্যাঁ, আর একটি উপায় আছে—বয়সে বালক হলেও তোমার সঙ্কল্পের দৃঢ়তা আছে ; তাই ভাবছি—তুমি কি পারবে ?

ব্যগ্র ব্যাকুল কণ্ঠে মিলারেপা বললেন—আপনার আশীর্বাদে নিশ্চয়ই পারবো। আমার মনের গ্লানি আপনার অবিদিত নেই। আদেশ করুন কি করতে হবে।

দীর্ঘশ্বাস ফেলে গুরু কিশোর মিলারেপাকে কঠিন অনিশ্চয়তার পথে

নিরুদ্দেশ যাত্রায় উদ্বুদ্ধ করলেন। গুরুপ্রদত্ত পাথেয় সম্বল ক'রে মিলারেপা সেইদিনই অপরাহ্ণ বেলায়, অনাস্বস্ত বন্ধুর পথে, অরণ্য পর্বতের নীলাভ ছায়ায় মহানির্বাণের অনুসন্ধানে বেরিয়ে পড়লেন। সেই অপসৃয়মান কিশোর মূর্তির পানে তাকিয়ে, পথের বাঁকে, গুরু আর একবার দীর্ঘশ্বাস ফেললেন।

সাং উপত্যকাবাসী সিদ্ধপুরুষের দর্শন পেয়ে মিলারেপা তাঁর উদ্দেশ্য ও প্রার্থনা অকপটে নিবেদন করলেন। সমস্ত কথা ধীরভাবে শুনে তিনি বললেন—তোমাকে সংসার-বন্ধন থেকে মুক্ত করবার শক্তি আমার আছে। বুদ্ধি যাদের প্রখর, তাদের এই যোগপথে সিদ্ধি অনিবার্য। পূর্ণ একজীবনই বা লাগবে কেন—নিষ্ঠাভরে গ্রহণ করলে একটি দিনেই এর ফল পাওয়া যায়। কিন্তু এখানে তোমার স্থান নয়। ভারতীয় ঋষি নারোপার শিষ্য মার্পা আছেন লোত্রাকে, দোত্তলুং সন্ন্যাসক্ষেত্রে। জন্ম-জন্মান্তরের বন্ধনসূত্রে তাঁর সঙ্গেই তোমার যোগ; তোমার প্রাপ্য তাঁর হাত থেকেই তোমাকে নিতে হবে। তুমি ভাগ্যবান, কারণ ত্রিজগতে মার্পার তুলনা নেই।

মার্পার নামটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মিলারেপার দেহমনে যে অভূতপূর্ব আলোড়ন জেগে উঠেছিল, তার বর্ণনা তিনি নিজেই করেছেন: অশ্রুর রূপে এলো আনন্দের প্লাবন, রোমাঞ্চিত হয়ে উঠলো আমার সারাদেহ; অনির্বচনীয়কে তো আর প্রকাশ ক'রে বলা যায় না। জন্ম-যবনিকা ভেদ ক'রে ধ্বনি উঠতে লাগলো—মার্পা, মার্পা, মার্পা! কেমন ক'রে তাঁর দেখা পাব, তাঁর পায়ে নিজেকে সমর্পণ করবো—এ ছাড়া আর দ্বিতীয় চিন্তার স্থান রইলো না আমার মনে। দীর্ঘ পথের ভীতি বা অনিশ্চিতের আশঙ্কা মনে স্থান পেলো না। তখনই একবস্ত্রে যাত্রা করলাম। পর্বতকন্দরে, বৃক্ষতলে, লোকালয়বর্জিত অরণ্যপ্রদেশে যেখানে সেখানে রাত কেটেছে না-দেখা পরিত্রাতার নামের মন্ত্রে। যেখানে মন ছিল সেখানে মার্পার নামটি আছে—আর কিছুই নেই।

এবারকার পথযাত্রায় লেগেছে অভিনব আনন্দের সুর; বন্ধুর পথ যেন এক মুহূর্তে হয়ে উঠছে রমণীয়। নিরুদ্দেশ যাত্রার অনিশ্চয়তা আর নেই। জন্মান্তরের বন্ধনে বাঁধা ত্রিকালদর্শী মহাগুরু তাঁর পথ চেয়ে প্রতীক্ষা ক'রে রয়েছেন। ত্রিজগতে যাঁর তুলনা নেই, গুরু পরম্পরায় যিনি অতীশ দীপঙ্করের তপঃশক্তির উত্তরাধিকারী, মিলারেপার জীবনের কাণ্ডারী সেই মার্পা যে দীর্ঘ পথের প্রান্তে অধিষ্ঠান করছেন—সে পথ যত দীর্ঘই হোক না কেন—কতটুকু সেই পথ! পর্বতের পর পর্বত, উপত্যকা অধিত্যকার আরণ্যভূমি অতিক্রম ক'রে, অনশনে অনিদ্রায়, শ্রান্তি-ক্লান্তিহীন দেহে লোভ্রাকের ক্ষুদ্র জনপথে এসে উপনীত হলেন। মলিন জীর্ণ বেশ দীর্ঘদিনের পথশ্রমে দৈন্যের চরম সীমায় পৌঁছে গেছে, চেহারা হয়েছে রুক্ষ শুষ্ক ক্ষ্যাপার মত,—কিন্তু চোখে মুখে মালিন্যের এতটুকু ছাপ কোথাও পড়েনি।

মিলারেপা যে রাত্রে গুরু মার্পার সন্ধানে লোভ্রাকের কাছাকাছি এসে পৌঁছেছেন, সেই রাত্রেই তাঁর গুরু ও গুরুপত্নী যুগপৎ, অলৌকিক ভাবে, তাঁর আগমনের সংবাদ পেয়েছিলেন। তাঁরা দুজনেই দেখলেন মহাগুরু নারোপা যেন এক অতি পবিত্র বস্তুকে যথারীতি অভিষিক্ত করবার আদেশ জ্ঞাপন করছেন। স্বপ্নের মধ্যেই যেন তাঁরা দুজনেই এই পবিত্র অনুষ্ঠান শাস্ত্রীয় বিধিতে সম্পন্ন করলেন, এবং সঙ্গে সঙ্গে যেন সহস্র চন্দ্রসূর্যের স্নিগ্ধোজ্জ্বল জ্যোতিতে গগনমণ্ডল সমুদ্ভাসিত হয়ে গেল, ত্রিলোক পরিব্যাপ্ত ক'রে উঠলো জয়ধ্বনি, ..অন্তরীক্ষ থেকে পুষ্পবৃষ্টি হতে লাগলো।

ব্রাহ্মমুহূর্তে গুরু ও গুরুপত্নী উভয়েই জেগে উঠলেন। স্বপ্নবৃত্তান্ত সবিস্তারে বর্ণনা ক'রে গুরুপত্নী জিজ্ঞাসা করলেন—'এর অর্থ কি?' মনে মনে দুটি স্বপ্নের মূলগত ঐক্যে বিস্মিত হয়ে মার্পা বললেন,—'স্বপ্ন স্বপ্নই; যার কারণ নেই তার অর্থ বলবো কেমন করে? আমি এখনই শস্যক্ষেত্রে হল-কর্ষণে যাবো: তার সমস্ত ব্যবস্থা করে রাখো।'

অতিমাত্রায় বিস্মিত হয়ে গুরুপত্নী বললেন—'তুমি কোন্ দুঃখে নিজে হল-কর্ষণে যাবে? তোমার লোকজনের অভাব কি? নিজের হাতে লাঙল ঠেললে লোকে বলবে কি?'

হৃষ্টচিত্তে মার্পা বললেন, 'তা বলুক! আমার ক্ষেত আমি কর্ষণ না করলে আর কে করবে? প্রয়োজন হয়নি, তাই এতদিন করিনি। লোকজন দিয়ে কি আর সমস্ত কাজ হয়? পানীয় ছাংয়ের যেন ভাল রকম ব্যবস্থা হয়। আমার নিজের জন্য তো বটেই, তা ছাড়া অতিথি অভ্যাগতের জন্যও যথেষ্ট পরিমাণে ছাং মাঠে পাঠিয়ে দাও।'

মার্পার গৃহিনী দুটি বড় বড় পাত্রে প্রচুর ছাং মাঠে পাঠিয়ে দিলেন। অতিরিক্ত পাত্রটি নিজের টুপি চাপা দিয়ে একপাশে রেখে গুরু মার্পা মহানন্দে হল-কর্ষণে ব্রতী হলেন এবং অনেকখানি জমি চাষ ক'রে এক বৃক্ষতলে, পথের দিকে চেয়ে বসে রইলেন।

এদিকে মিলারেপা গ্রামে পৌঁছে সম্মুখে যাকে পাচ্ছেন তাকেই জিজ্ঞাসা করছেন যোগী মার্পার কথা। আগন্তুক কিশোরের প্রশ্নের উত্তরে সবাই বলে, 'যোগী মার্পা নামে এখানে কেউ নেই। এই গণ্ডগ্রামের সবাইকে আমরা চিনি। মার্পা নামে একজন আছে তাও ঠিক, কিন্তু সে সাধারণ গৃহস্থ মানুষ, জমি-যায়গা ক্ষেত-খামার নিয়ে তার কারবার। লামাদের এই দেশে লামা সবাই, কিন্তু যে রকমের গুণীলোক তুমি সন্ধান করছো, তেমনটি কেউ এখানে নেই। লামা মার্পা যার নাম—ঐ দূরে দেখা যাচ্ছে তার বাড়ি; বেশ সম্পন্ন গৃহস্থ—খানদানি ঘর এই পর্যন্ত।' কেমন ক'রে যেন মিলারেপা বুঝে নিলেন যে এই মার্পাই তাঁর উদ্দিষ্ট—তাঁর ইহকাল-পরকালের পরমতম অবলম্বন।

আরও কিছুদূর অগ্রসর হবার পরে সৌম্য সুবেশ সম্ভ্রান্ত এক বালকের সঙ্গে তাঁর দেখা হল। জিজ্ঞাসার উত্তরে বালকটি বললো, 'আমারই বাবার নাম মার্পা। তিনি কি তা তো আমি জানি না। আমার বাবা এক খেয়ালী মানুষ—যখন তখন ঘরবাড়ির জিনিসপত্র

সর্বস্ব বিক্রি ক'রে, তাল তাল সোনা নিয়ে, তিনি অনেক দূরে ভারতবর্ষে চলে যান; কয়েকমাস পরে রিক্ত হস্তে ফিরে আসেন পাহাড়ি মোষের পিঠে বস্তা-বস্তা হাতে-লেখা কাগজের বোঝা নিয়ে। তাঁকে তোমার কি প্রয়োজন তা তুমিই জানো। আজ তিনি বাড়ি নেই। কি খেয়াল হয়েছে কে জানে, ভোর না হতেই লাঙল নিয়ে জমি চাষ করতে বেরিয়ে গেছেন। আমার জ্ঞানে আমি তাঁকে কখনো জমি চাষ করতে দেখি নি। ঐ পথ ধরে বেশ খানিকটা দূর চলে গেলেই তুমি তাঁকে দেখতে পাবে।'

নির্দিষ্ট পথ ধরে মিলা এগিয়ে চললেন। শরতের সোনার আলোয় স্নান ক'রে পার্বত্য-প্রদেশ বিমুগ্ধ দৃষ্টিতে তাঁর মুখের পানে চেয়ে আছে। পাহাড়ের গায়ে খাঁজ কাটা জমির ফালিগুলি স্তরে-স্তরে নেবে গেছে। আঁকা-বাঁকা পায়ে-চলা পথটি এই সমস্ত জমির গা ঘেঁসে যেন কোন অনন্তের প্যানে কোথায় গিয়ে মিলিয়ে গেছে। যত দূর দৃষ্টি যায়, পাহাড়ের পরে পাহাড়ের সারিগুলি যেন বিশ্বকর্মার নিজের হাতে সাজানো এক সীমাহীন অনন্তের পটভূমিকা রচনা ক'রে রেখেছে। দূব-দিগন্তে, নীল নভস্থল যেন অরণ্যানীর বুকের উপরে ঝুঁকে পড়ে একান্ত মমতায়, পৃথিবীর সাজানো খেলাঘরটিকে দু-চোখ ভরে দেখবার জন্য ব্যাকুল হয়ে চেয়ে আছে।

বহিঃপ্রকৃতির এই নয়নাভিরাম সৌন্দর্য তাকিয়ে দেখবার মত অবসর বা মনোভাব মিলারেপার ছিল না। কিছু দূরে একটি নিঃসঙ্গ মানুষ আপন মনে হল-কর্ষণে নিযুক্ত। আশেপাশে কেউ কোথাও নেই। মিলারেপা পায়ে পায়ে সেই দিকে অগ্রসর হয়ে গেলেন। কাছাকাছি এসে ভালো ক'রে লোকটিকে দেখতে লাগলেন। পরিপুষ্ট দেহ—বরং একটু স্থূল বললেও ভুল হয় না। মুখখানি চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনে হল যেন এমন অপরূপ মহিমা, রাজকীয় সম্ভ্রম আর কোন মুখে তিনি জীবনে কখনো প্রত্যক্ষ করেন নি। তাঁর

মনে হল এ মুখ, এ দৃষ্টি যেন এই পৃথিবীর নয়; এ যেন আর এক জগতের বিস্ময়কর অভ্যুদয়। স্থান-কাল-পরিবেশের সবকিছু বাস্তবতাকে ছাড়িয়ে তিনি যেন কোন্ অপরিজ্ঞাতকে মুহূর্তের মধ্যে আবিষ্কার ক'রে, অপরিসীম বিস্ময়ের অতল তলে তলিয়ে গেলেন। বিনয়-বিনম্র কণ্ঠে জিজ্ঞাসা করলেন—'মহর্ষি নারোপার শিষ্য মার্পার দেখা আমি কোথা পাবো?'

হল-কর্ষণ বন্ধ ক'রে অজ্ঞাত ব্যক্তিটি মিলারেপার দিকে দৃষ্টিপাত করলেন। তীক্ষ্ণ অথচ কোমল, প্রীতিপ্রসন্ন চোখে তিনি আগন্তুককে আপাদমস্তক দেখে নিলেন। জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি, কোথা থেকে আসছো, কি করো তুমি?' মিলা বললেন—'আমি মহাপাপী, গুরুতর অপরাধের ভারে ঋষি মার্পার শরণ নিতে ছুটে এসেছি; আমি মুক্তির জন্য তাঁর আশ্রয় চাই।'

মার্পা বললেন 'ভাল কথা। সে যোগাযোগ আমি ঘটিয়ে দেবো। কিন্তু তার আগে এই ক্ষেতের অকর্ষিত অংশটি তোমাকে উত্তমরূপে কর্ষণ ক'রে দিতে হবে। এই পাত্রে ছাং আছে পান করো—এবং তার পরে কর্ষণে লেগে যাও; কিন্তু দেখো যেন কাজে ফাঁকি দিও না।' এই কথা বলে, মিলারেপাকে কাজকর্মের ভার বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিয়ে, হলকর্ষক নিজের দায়িত্ব হস্তান্তরিত ক'রে প্রস্থান করলেন। মিলাও ছাং পানান্তে পরিতৃপ্ত হয়ে কর্ষণে নিযুক্ত হলেন। বেশ কিছুক্ষণ পরে, পূর্ব-পরিচিত সেই বালকটি মাঠে এসে তাঁকে জানালো, 'লামা তোমার জন্য যা করবেন বলেছিলেন, তা করেছেন! তোমার আদিষ্ট-কর্ম শেষ ক'রে তুমি আমার সঙ্গে চলো।'

মাঠের কাজ শেষ ক'রে মিলারেপা বালকের অনুগমন ক'রে গুরুর দরবারে এসে হাজির হলেন। দেখলেন সেই পূর্ব-দৃষ্ট হলকর্ষক তিন-পাট করা গদির উপরে কার্পেটের আসনে উপবিষ্ট। মিলাকে দেখে স্মিতহাস্যে তিনি বললেন, 'আমাকে তুমি তখন চিনতে পারো নি।

আমিই মার্পা। ইচ্ছা হলে আমাকে প্রণাম করতে পারো।' মিলা তাঁর পায়ে মাথা রেখে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন; বললেন, 'পশ্চিম মালভূমির মহাপাপী আমি—কায়মনোবাক্যে আপনার শরণ নিলাম; ভৃত্যের মত আমি আপনার আবাসেই থাকতে চাই। অন্ন-বস্ত্র ও তার সঙ্গে এই জীবনেই আমি পরিনির্বাণের ভিক্ষা করি।'

গুরু বললেন, 'তোমার পূর্বকৃত পাপের দায় আমার নয়; আমি তো তোমাকে তেমন কোন কর্মে নিযুক্ত করিনি।' তারপরে, সমস্ত অপরাধের পূর্ণ বিবরণ শুনে বললেন, 'কায়মনোবাক্যে আমার শরণ নিতে চাও ভাল কথা, কিন্তু অন্ন-বস্ত্র ও শিক্ষা—তিনই আমি একসঙ্গে যোগাতে পারবো না। অন্ন-বস্ত্র যোগাতে পারি যদি তুমি শিক্ষার ব্যবস্থা অন্যত্র খুঁজে নাও; অথবা শিক্ষা দিতে পারি যদি অন্নবস্ত্রের ব্যবস্থা তুমি নিজে ক'রে নাও। এখন তোমার যেমন অভিরুচি।'

দ্বিধাহীনচিত্তে মিলা নিজের পথ বেছে নিলেন। তিনি বললেন, 'গুরুদেব, সত্যই আমার চাই। খাদ্যবস্ত্রের প্রয়োজন আমি নিজেই মিটিয়ে নেব ঃ আপনি আমাকে পরম ধনের সন্ধান দিন।'

গুরুগৃহের পিছনের একাংশে মিলা স্থায়ীভাবে রয়ে গেলেন। অর্থাগমের একমাত্র পন্থা ভিক্ষাবৃত্তি। কৃষিপ্রধান দেশের গ্রামাঞ্চলে সকলেই অল্পবিস্তর সঙ্গতিপন্ন; অতএব সুকুমার বিদেশী ছাত্র প্রার্থীরূপে যে দ্বারেই গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, সেইখানেই তাঁর ভিক্ষাপাত্র পর্যাপ্ত দানে ভরে উঠেছে। সারাবেলা দ্বারে দ্বারে ঘুরে সুপ্রচুর যবের বোঝা সংগ্রহ ক'রে বোঝা-মাথায় মিলা নিজের আশ্রয়ে ফিরেছেন। অনভ্যস্ত হাতে মাটির বোঝা নামাতে গিয়ে সে বোঝা সশব্দে মাটিতে পড়তে না পড়তেই গুরুদেব রুদ্রমূর্তিতে ছুটে এসে বললেন—'আচরণ সংযত করতে শেখো নি, বেয়াদব!' লজ্জিত স্তম্ভিত শিষ্যকে ধিক্কার দিয়ে, লাথি মেরে তার সেই বহুশ্রমে আহৃত খাদ্যের বোঝা ঘরের বাইরে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন। প্রথম দিনেই মিলা বুঝলেন—গুরুর মেজাজ

বুঝে চলা বড় সহজ ব্যাপার নয়। এমনিতর ব্যাপার প্রত্যহই চলতে লাগলো। ক্ষণে তুষ্ট, ক্ষণে রুষ্ট এই অলোকসামান্য পুরুষের দৈনন্দিন বিপরীতমুখী আচরণে তাঁর ধৈর্য বা বিশ্বাস অটুট হয়েই রইলো। কিন্তু আসল উদ্দেশ্যের যে কি হবে, তার কিছুই বোঝা গেল না। গুরু সে বিষয়ে কিছুই বলেন না। মিলা ভিক্ষা ক'রে আনেন, সাংসারিক কাজকর্মে নিয়মিতভাবে সাহায্য করেন, পাছে কোন ত্রুটি হয় সেই ভয়ে সশঙ্কিত হয়ে থাকেন। কিন্তু কোথায় সেই পরম প্রার্থিত তপস্যার ধন? পরীক্ষা যত কঠিনই হোক, সমস্তই সওয়া যায় যদি আসল ব্যাপারে গুরুর দাক্ষিণ্যটি পুষ্পবৃষ্টির মত ঝরে পড়ে। তার তো কোন লক্ষণই নেই। বৎসরের পরে বৎসর কেটে গেল—কিন্তু গুরু রইলেন সম্পূর্ণ নির্বিকার।

গুরুর কাছে ভয়ে ভয়ে গিয়ে প্রার্থনা জানালেন। গুরু বললেন—'সে সব হবে। আপাততঃ যে বিদ্যা শিখেছো তারই ব্যবহার করো আমার সেবায়। আমার দূর প্রদেশের শিষ্য সেবকেরা ডাকাতের উপদ্রবে যখন তখন আমার কাছে আসতে পারে না। এর প্রতিকার তুমি করো, মন্ত্রবলে ঝড়-বৃষ্টি করকাপাত সৃষ্টি ক'রেঃ দস্যুদলকে ধ্বংস ক'রে আমার সেবকমণ্ডলীর পথ নিষ্কণ্টক করো। মিলার অন্তরের গোপন ব্যথার স্থানটিতে এমন নিষ্ঠুর আঘাত, সমস্ত জেনেশুনেও যে গুরু কেন দিলেন, সে বিষয়ে মিলার মনে প্রশ্ন হয়তো জেগেছিলো, কিন্তু সেখানে দ্বিধার স্থান ছিলো না। অতএব আবার সেই পূর্ব-জন্মের বিভীষিকার হ'ল পুনরাবৃত্তিঃ ইতিপূর্বে যেখানে ছিল উৎসাহের সার্থকতা—এবার সেখানে নিরুত্তাপ অবসাদ। মারণ উচাটনের অনুষ্ঠান সমাধা ক'রে মিলা গুরুর পদপ্রান্তে এসে দাঁড়ালেন। গুরু বললেন—'বলো কি? এই সামান্য মূল্যে তুমি নির্বাণ মুক্তির স্বাদ পেতে চাও? চরম লভ্যকে এমন সহজেই তুমি পেতে চাও? তাই কি হয়, না তাই হওয়াই সঙ্গত? আবার যাও, তোমার মারণমন্ত্রে,

যে সব দুর্দান্ত পার্বত্য অধিবাসী স্থানীয় লোকদের জীবন অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে, তাদের নিধন ক'রে, সর্বসাধারণের জীবন নির্বিঘ্ন ক'রে এসো। যদি সাফল্য প্রমাণ করতে পারো, তবেই, আমার গুরুদেব নারোপা-প্রদত্ত পরম ধন তোমাকে দেবার কথা চিন্তা ক'রে দেখবো।'

মিলার মন্ত্রশক্তিতে এবারেও দুর্ধর্ষ শক্তির পরাজয় ঘটলো। অঘটন-ঘটন-পটিয়সী দৈবশক্তির প্রভাবে তাদের নিজেদের মধ্যে এমনই মতিভ্রম সৃষ্টি হল যে, পরস্পরের হননে তারা নিজেরাই উদ্যোগী হয়ে উঠলো। এই বিপুল হত্যাকাণ্ডের নিমিত্ত-মাত্র হয়ে, মিলারেপা বিমর্ষ-মুখে আবার গুরুর কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। নিষ্ঠুর ব্যঙ্গ-হাস্যে গুরু বললেন—'দুষ্কর্মের বিনিময়ে মুক্তির মন্ত্র চাইতে এসেছো? নিজের এই অসীম স্পর্ধায় তোমার লজ্জা হয় না? তুমি যে মহা-যাদুকর তা আমি স্বীকার করি। কিন্তু বৎস, নির্লজ্জতারও একটা সীমা থাকা উচিত—এ-কথা কি তুমি মানো না? তোমার এই গগনভেদী স্পর্ধা একমাত্র আমি ছাড়া আর কেউ কখনো সহ্য করবে না। এ যাবৎ তোমার জীবনের কীর্তি-কাহিনী এই পুণ্য পথের উপযুক্ত সম্বলই বটে! শোন আমার কথা,—যদি পারো, যাদের জীবনান্ত ঘটিয়েছো তাদের জীবন ফিরিয়ে দাও, যেখানে যত ক্ষতি তোমার জন্য ঘটেছে—সে সব ক্ষতি পূরণ ক'রে এসো। তবেই আমার সামনে ফিরে এসে প্রার্থিত ভিক্ষার পুনরাবৃত্তি কোরো; নচেৎ তোমার ওই মুখ আমাকে যেন আর দেখতে না হয়!' বলতে বলতে তিনি যেন ক্রোধে অগ্নিমূর্তি হয়ে মিলারেপাকে মারতে গেলেন।

দুঃখে অপমানে মিলার দু-চোখ ফেটে অশ্রুধারা বইতে লাগলো—কিন্তু প্রতিবাদে একটি কথাও তিনি বললেন না। নিজের অন্ধকার ঘরে গিয়ে ভগ্নপ্রাণে শুয়ে রইলেন। গুরুমাতা আড়াল থেকে সবই শুনেছিলেন। মায়ের মত ক'রে তিনি সেই ঘরে এসে সাধ্যমত সান্ত্বনা দিলেন। অধিকাংশ রাত্রি ক্রন্দনে অতিবাহিত ক'রে ভোরের দিকে

একসময়ে মিলা ঘুমিয়ে পড়লেন। ঘুম ভাঙতে না ভাঙতেই গুরু স্বয়ং মিলার ঘরে এসে দেখা দিলেন। এবার যেন একেবারে আর এক মূর্তি। বললেন—'কিছু মনে কোরো না মিলা, কাল আমি তোমার প্রতি যথেষ্ট অন্যায় করেছি। সময়টি না হলে কিছুই হয় না, ধৈর্যের চেয়ে বড় আর সংসারে কিছু নেই। নিশ্চিন্ত থাকো—তোমার প্রাপ্য তোমাকে পেতেই হবে। ইতিমধ্যে তোমাকে আর একটি কাজের ভার দিচ্ছি। আমার পুত্রের জন্য একখানি বাড়ি করা দরকার হয়ে পড়েছে। এর দায়িত্ব তোমার। তুমি যদি এই বাড়ি আমার মনের মত ক'রে গড়তে পারো, নির্বাণের পথ আমি তোমার হাতে তুলে দেবো। তোমাকে সাধনাকালে আর যাতে ভিক্ষা ক'রে খেতে না হয়—সে ভারও আমি নেব বলে প্রতিশ্রুতি দিচ্ছি।'

অশ্রুরুদ্ধ-কণ্ঠে মিলা বললেন—'কিন্তু প্রভু, ইতিমধ্যে যদি আমার মৃত্যু হয় তা হ'লে কি হবে? তবে তো আমার এ জীবনে সত্য সাক্ষাৎকার হবে না।'

গুরু মিলার এ কথায় রাগ করলেন কি না কিছুই বোঝা গেল না। গুরুর মুখের দিকে ভাল ক'রে চেয়ে দেখবার সাহসও মিলার ছিল না। কিন্তু বহুকষ্টে সাহস সঞ্চয় ক'রে তিনি বললেন, 'গুরুদেব, আশায় আশায় এমন ক'রে কতদিন আর কাটবে? কি প্রার্থনা নিয়ে আপনার চরণপ্রান্তে এসেছিলাম তা আপনার নিশ্চয়ই মনে আছে। বছরের পরে বছর কেটে গেছে—আমার মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত এখনও শেষ হ'ল না। মৃত্যুর কথা তো কিছুই বলা যায় না—ইতিমধ্যে যে কোন মুহূর্তে শেষের পরোয়ানা এসে যেতে পারে। দেহ-মন-বাক্যে আমি আপনার শরণ নিয়েছি, এখন যদি এমনি ভাবেই আমার মৃত্যু হয়, তবে তো এ জীবন বৃথাই যাবে। যে বাড়ি আমাকে তৈরি করতে বলছেন—একা হাতে তা গড়তে হলে বৎসরের পর বৎসর কেটে যাবে। কিন্তু মৃত্যু যদি ততদিন অপেক্ষা না করে?'

মার্পা বললেন—'সে দায় আমার। মৃত্যুর সাধ্য কি যে সত্য ধর্মের আশ্রিতকে অকালে এসে দাবী করবে। তোমার প্রাপ্য তোমাকে এ জন্মেই পেতে হবে; সে প্রতিজ্ঞা আমার, আমার প্রতিশ্রুত সত্যের। তোমার শরীরে মনে জোর আছেঃ এই জন্মেই পরিপূর্ণ নির্বাণের পথে তোমাকে বাধা দিতে পারে এমন সাধ্য কারুর নেই। পথ যদি সত্য হয়, সে পথের পথিকের ভাবনা কি?'

গুরুর বাক্যে আশ্বস্ত হয়ে মিলা বুঝলেন যে তাঁর পূর্বকৃত অপরাধের প্রায়শ্চিত্তের জন্যই ত্রিকালদর্শীর এই ব্যবস্থা। তিনি বুঝলেন যে এই ভাবেই গুরু তাঁর দেহমনকে শোধন করে নিতে চান। তা ছাড়া যে নিষিদ্ধ ভূমিতে এই গৃহনির্মাণের প্রস্তাব—গ্রাম্য রাজনীতি সেখানে গৃহনির্মাণ সমর্থন না করায়, সে কার্য গুরুর একান্ত অনুগত কোন বিশ্বস্ত ব্যক্তির একক প্রয়াসেই সম্পাদিত হওয়া বাঞ্ছনীয়। নিজেকে সেই নির্বাচিত বিশ্বস্ত ব্যক্তি বলে কল্পনা ক'রে তিনি আত্মপ্রসাদে পুলকিত হয়ে উঠলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে বহুদিন-সঞ্চিত আশাভঙ্গের গ্লানি তাঁর মন থেকে নিঃশব্দে অবলুপ্ত হয়ে গেল। মনে মনে তিনি বললেন—তোমারই আদেশ আমি পালন করবো; আমার নিজের ইচ্ছা অনিচ্ছাকে আর মাথা তুলতে দেবো না। আমার যা হয় হোক। মৃত্যুও যদি হয় তাতেই বা কি? অভয় আমি পেয়েছি,—সেই অভয়ই হবে আমার চিরদিনের পাথেয়।

দু-চোখের উদ্গত অশ্রু মিলা জোর ক'রে মুছে ফেললেন। গুরুর সঙ্গে গিয়ে গৃহনির্মাণের স্থানটি নিশ্চিতভাবে চিহ্নিত করে নিলেন। চারিদিকে উত্তুঙ্গ পর্বতমালা দিয়ে ঘেরা বিশাল ভূখণ্ডের দিকে চেয়ে, বহুদিনের অক্লান্ত পরিশ্রমের জন্য প্রস্তুত হয়ে, সেই দিনই এই দুরূহ কঠিন কর্মে আত্মসমর্পণ করলেন। নিজের হাতে সুদৃঢ় ভিত্তি স্থাপন ক'রে, পার্বত্যপ্রদেশের বড় বড় পাথরের খণ্ড দূর-দূরান্তর থেকে সংগ্রহ ক'রে এনে এই দুঃসাধ্য তপশ্চর্যায় মনোনিবেশ করলেন। শতাধিক

লোকের যেখানে প্রয়োজন, সেই বিরাট কর্ম নিজের দুটি হাতে সমাপ্ত করবার সঙ্কল্প নিয়ে তিনি অসাধ্য সাধন করলেন। সূর্যোদয়ের বহুপূর্বে পৃথিবী যখন অন্ধকারে নিদ্রিত, তখন থেকেই শুরু হত তাঁর কর্মযজ্ঞ। বালসূর্য প্রহরে প্রহরে মার্গশীর্ষে উপনীত হয়ে, ক্রমে দিনের শেষে পশ্চিম-দিগন্তের অস্তপথে ঢলে পড়তো। মিলার সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নেই। দিনের পর দিন তিনি কর্মোন্মাদনায় বিহ্বল হয়ে থাকতেন। পাথরের পরে পাথর সাজিয়ে, কঙ্কর-মিশ্রিত মাটিতে বহুদূরের ঝরণার জল মিশিয়ে কাদা ক'রে, তাই দিয়ে তিনি রচনা করতেন তাঁর তপস্যার স্বপ্ন। রাত্রির অন্ধকারে নিঃশব্দে ফিরে আসতেন গুরুদত্ত আশ্রয়ের দীনহীন শয্যায়। অবসন্ন দেহে আহারে রুচি থাকতো না। মাতৃসমা গুরুপত্নী পরম স্নেহে করুণায় তাঁকে শয্যা থেকে টেনে তুলে আহার্য গ্রহণ করতে বাধ্য করতেন। গুরু কোনদিন ভুলেও এ প্রসঙ্গে কোন কথা জিজ্ঞাসা পর্যন্ত করতেন না। সেই প্রথম দিনটির পরে, গুরু একবারও কর্মস্থলে গিয়ে দেখেন নি কিভাবে মিলা তাঁর আদেশ পালন করছেন।

মিলার আরব্ধ-কর্ম যখন প্রায় সমাপ্তির দিকে চলেছে—অনেকদিন পরে গুরু অকস্মাৎ একদিন কর্মক্ষেত্রে উপস্থিত হলেন। বললেন—'মিলা, আমি ভাল ক'রে না ভেবেই তোমাকে আদেশ দিয়েছিলাম। এ পর্যন্ত যা কিছু গড়েছ—এ সব আবার ভাঙ্তে হবে। প্রত্যেকখানি পাথর যেখান থেকে এনেছো—সেখানে ফিরিয়ে দিতে হবে; যেখান থেকে যত মাটি আহরণ করেছো তাও যথাস্থানে পুনস্থাপিত করতে হবে। এই সব কর্ম সম্পন্ন হলে—নতুন ক'রে কোথায় বাড়ি গড়তে হবে, তখন তোমায় আবার জানাবো। এখন যা বলছি তাই করো।'

বিনা প্রতিবাদে, মিলা নিজের হাতে গড়া বাড়ির পাথরগুলি ভেঙে ভেঙে, যেখানকার প্রস্তর সেখানে সন্নিবিষ্ট করলেন। আবার সেই উদয়াস্ত পরিশ্রম সমান তালে চলতে লাগলো। অসীম ধৈর্যে

নির্বাক অধ্যবসায় মৌন তপস্যার মত, কলের কাঁটার মত দিবারাত্রির সুরে ওতপ্রোত হয়ে রইলো। সাক্ষী রইলেন অনন্ত আকাশের গ্রহ-নক্ষত্র আর নির্বাক, অনাদিকালের প্রাচীন পর্বতমালা। কোথায় ছিল কোন পাথরটি কে জানে? কিন্তু গুরুর আদেশ যেখানকার যে পাথরটি সেখানেই তাকে ফিরিয়ে দিতে হবে। মিলা পরম নিষ্ঠাভরে প্রত্যেকটি প্রস্তরখণ্ড নিজের মাথায় ক'রে বয়ে বয়ে স্বস্থানে সন্নিবিষ্ট করলেন। বহুদিনের সংগঠন যখন নিশ্চিহ্ন হয়ে এলো, তখন গুরু এসে আবার দেখা দিলেন। তাঁর কথা শুনে বেশ বোঝা গেল যে গুরু তখন প্রকৃতিস্থ নন; কথাবার্তা অসংলগ্ন, মুখে মাদকের তীব্র গন্ধ।

মিলাকে পর্বতশ্রেণীর পশ্চিমাংশে নিয়ে গিয়ে এই অবস্থাতেই তিনি নূতন গৃহনির্মাণের স্থান নির্দেশ করে দিলেন। অর্ধচন্দ্রাকার সুবৃহৎ হর্ম্য, পূর্বের মত এই স্থানে গড়ে তুলতে হবে মিলার একক প্রচেষ্টায়। আবার সেই পাথর আনা, মাটি আনা, জল আনা—নবগৃহের ভিত্তি স্থাপনা—সেই পুরাতন উদয়াস্ত শ্রমের নব অধ্যবসায়। প্রথমবারের তিক্ত অভিজ্ঞতা মিলার মনেই ছিল না, কিন্তু তাঁর মনের পটে আঁকা রইলো কোথাকার কোন পাথরটি, কত মাটি কোথা থেকে সংগ্রহ করা হয়েছে। দেখা গেল যে এই স্মরণশক্তির প্রয়োজন ছিল, কারণ নির্মাণ-কর্ম সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্বের মত গুরু এসে দেখা দিলেন; বললেন—'এবারেও তোমার পরিশ্রম বৃথা হল; মত্ত অবস্থায় আমার মাথার ঠিক ছিল না, তাই তোমাকে ভুল আদেশ দিয়েছিলাম। এ বাড়িও ভাঙতে হবে এবং ভাঙার পরে প্রত্যেক খণ্ড পাথর বা মৃত্তিকা পূর্বস্থানে প্রত্যার্পণ করতে হবে।'

বিনা বাক্যব্যয়ে মিলা প্রত্যেকটি আদেশ যথাযথ পালন করলেন। তখন গুরু উত্তরের দিকে গৃহনির্মাণের আর একটি নূতন স্থান নির্দেশ করলেন। বললেন—'দেখো মিলা, অত্যধিক মদ্যপানে আগের বার আমি কি বলতে কি বলেছি। তাই তোমার এতদিনের সমস্ত শ্রম

বৃথা হয়ে গেছে। এবার আর তা হবে না, কারণ এখন আমি সম্পূর্ণ প্রকৃতিস্থ। এবার এইখানেই তুমি বাড়ি গড়তে লেগে যাও—কিন্তু বাড়ি খুব সুন্দর হওয়া চাই: তোমার সাধনার মত সুন্দর।'

মিলা সানুনয়ে নিবেদন করলেন—'বৃথা শ্রমে আপনারও ক্ষতি আমারও ক্ষতি। এবারকার গৃহনির্মাণের আদেশ আপনি ঠিক ভাবে ভেবেছেন তো?' গুরু বললেন—'তাতে সন্দেহ মাত্র নেই। আমি এবার মাদক স্পর্শও করিনি—সে তো দেখতেই পাচ্ছো। তান্ত্রিক কৌশলের উপযুক্ত ত্রিকোণাকার একখানি সৌধ এইখানে তুমি আমার জন্য রচনা করো—এই আমার সুচিন্তিত আদেশ।'

নিশ্চিন্ত হয়ে মিলা আদেশ পালনে যত্নবান হলেন। দিনে দিনে পাথরে কাদায় গড়া ত্রিকোণাকার হর্ম্য মাটি ছাড়িয়ে আকাশের পানে খাড়া হয়ে উঠলো—মিলার অন্তর-সাধনার বাহ্যিক বিকাশ রূপে, তপস্যার বাস্তব বিগ্রহ রূপে। সমাপ্তি যখন প্রায় নাগালের মধ্যে এসে গেছে এমন সময় এলেন গুরু। বাড়ি দেখেই ক্রোধে ফেটে পড়লেন: বললেন—'এমন বাড়ি তোমাকে কে করতে বলেছে? আমি? কখনই তা হতে পারে না। এ তোমার নির্লজ্জ মিথ্যা কথা। আমি তো আর পাগল হইনি যে তোমাকে এই রকম ত্রিকোণাকার বাড়ি করতে বলবো। কে তোমার সাক্ষী আছে যে আমি এমন কথা তোমাকে বলেছি? তুমি কি তোমার যাদুবিদ্যা প্রয়োগ ক'রে এই ঐন্দ্রজালিক ত্রিকোণ বাড়িতে পুরে আমাকে সবংশে নিধন করতে চাও? এই বীভৎস কাণ্ড দেখেই তো স্থানায় দেবদেবীরা এর অধিবাসীদের বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত হয়ে উঠবেন। তোমার পৈত্রিক সম্পত্তির অপহারকের দলে কি আমিও ছিলাম না কি, যে এমনি ক'রে আমার শাস্তিবিধান করতে চাও? শোন, যদি ভাল চাও তো এ বাড়ি এখনই চূর্ণ-বিচূর্ণ ক'রে ফেলে, এর সমস্ত পাথর মাটি যথাযথ স্থানে পুনস্থাপিত করো। আর যদি

আমার এ-আদেশ তোমার মনঃপূত না হয়—বিশাল বিশ্বের যেখানে খুশি তুমি বিদায় হও।'

গুরু বিষম ক্রোধে, এই রকমের নানা কথা বলে, থরথর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে চলে গেলেন। মিলা বিমূঢ়ের মত সেই সমাপ্তপ্রায় হর্ম্যের সম্মুখে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে বালকের মত কাঁদতে লাগলেন। কবে হবে এই গড়া ও ভাঙার পরম পরিসমাপ্তি? এই অর্থহীন শ্রমের আর অবসাদের? পাথর বয়ে বয়ে তাঁর স্কন্ধে দগ্‌দগে এক ঘা হয়ে গেছে: সমস্ত পিঠ ও কোমর রক্তাক্ত হয়ে গেছে। সাহস ক'রে কোনদিন গুরুকে এসব ব্যক্তিগত সামান্য কথা বলেন নি, প্রবৃত্তিও হয়নি। গুরুর দিকে পিছন ক'রে একটি দিনের জন্যও তো জীবনে কখনো দাঁড়ান নি, যে এই সমস্ত বিবরণ তাঁর চোখে পড়বে। কিন্তু তাঁর নিজের শরীর বা মন যখন কিছুই তাঁর নিজের নয়, তখন এই নিরর্থক চিন্তার প্রয়োজন কি? কয়েকদিন কেটে গেল গড়া-বাড়ি ভাঙতে; তার পরে একদিন সুযোগ বুঝে, গুরুমার কাছে মিলা তাঁর দুঃখ নিবেদন ক'রে তাঁর সাহায্য ভিক্ষা করলেন। কিন্তু নিজের শারীরিক পীড়ার কথা তিনি সযত্নে তাঁর কাছ থেকেও গোপন ক'রে রাখলেন। তিনি মনে মনে বিচার ক'রে দেখলেন যে নিজের শারীরিক পীড়ার কথা প্রকাশ করলে হয়ত তার এই অর্থ ই দাঁড়াবে—'দেখো তোমাদের জন্য আমার কত কষ্ট।' সে সহানুভূতি তাঁর প্রার্থনা নয়; তিনি যা চান তার অতিরিক্ত আর কিছুই চান না।

গুরুমার আদ্যন্ত কোন কথাই অবিদিত ছিল না। ভিন্‌দেশের এই তপস্বী ছেলেটির জন্য তাঁর মাতৃহৃদয়ে স্নেহ ও সহানুভূতির অতল সমুদ্র জমে ছিল—কিন্তু স্বামীর কোন কথায় প্রতিবাদ করার মত মনোভাব তাঁর ছিল না। তা ছাড়া তাঁর স্বামীর সহস্রবিধ পরস্পর বিরোধী কার্যকলাপের মধ্যেও যে একটা কোন সুগভীর উদ্দেশ্য নিহিত থাকে, এ সত্যটি তাঁর অপরিজ্ঞাত ছিল না। মাঝে মাঝে তাঁর মনে হত যে

এই প্রিয়দর্শন মধুরভাষী বালক তপস্বীর উপরে নিগ্রহের কিছুটা বাড়াবাড়ি হয়ে যাচ্ছে ; কিন্তু এই চিন্তার মাঝখানেও তার প্রতীতি ছিল যে বাহ্যিক দৃষ্টিতে বিসদৃশ দেখালেও মহর্ষি মার্পার কোন কর্মই একেবারে নিরর্থক হতে পারে না। সচরাচর তিনি তাই গুরুশিষ্যের কোনরকম ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করতে চাইতেন না, কিন্তু এবারে তিনিও আর স্থির থাকতে পারলেন না। স্বামীর কাছে গিয়ে, মিলারেপার হয়ে নিজেই তাঁর আনুকূল্য ভিক্ষা করলেন। মার্পা স্থির হয়ে স্ত্রীর কথা শুনলেন। হেসে বললেন—'শেষ পর্যন্ত তোমাকে বুঝি সে উকিল ক'রে পাঠিয়েছে ? আচ্ছা বেশ, ভালোরকম রান্না-বান্না ক'রে, তাকে আমার কাছে পাঠিয়ে দিও।'

গুরু সেদিন মিলাকে নিজের কাছে বসিয়ে উত্তম ভোজ্যে আপ্যায়িত করলেন। আহারান্তে বললেন, 'মিথ্যা তুমি আমাকে সেদিন কতকগুলি অহেতুক অপবাদ দিয়েছো, কিন্তু সেজন্য যে আমি তোমার প্রতি বিরূপ হই নি, তার প্রমাণস্বরূপ তোমাকে আমি এখনই সাধনার প্রথম সোপান দান করছি। কিন্তু মনে রেখো, আধ্যাত্মিক শিক্ষার পাঠ এ নয়। ব্রহ্মবিদ্যা পেতে হলে তার অন্যবিধ মূল্য দিতে হয় : সে মূল্য দেবার মত সামর্থ্য তোমার এখনও হয় নি। কেমন ক'রে সে মূল্য দিতে হয় তার দৃষ্টান্ত মূর্ত হয়ে আছে আমার গুরু নারোপার আলোকসামান্য জীবনে। সে কাহিনীও তোমাকে শোনাবো। তুমি এখনকার মত এই নিয়েই সন্তুষ্ট থাকো।'

এতখানি অন্তরঙ্গ ভাবে গুরু ইতিপূর্বে আর কখনো মিলার সঙ্গে আলাপ করেন নি। আনন্দে মিলার দু-চোখ দিয়ে জল পড়তে লাগলো। এতদিন পরে গুরুর যে তাঁর উপরে দৃষ্টি পড়েছে এতেই তিনি ধন্য। তাঁর মনে হল যেন পৌঁছানো আর চলা নিমেষের মধ্যে এক হয়ে গেছে। শারীরিক পীড়া, মানসিক নিগ্রহ এর সহস্রগুণ হলেই বা কি ? কৃপার বিন্দুর কাছে দুঃখের সিন্ধুও যে পরাভূত হয়ে

যায়। নাই বা হল পরাবিদ্যার পাঠ। সত্যিই তো—বামন হয়ে চাঁদের পানে হাত বাড়ালে চলবে কেন? কৃপা ক'রে গুরু যতটুকু দিয়েছেন তাই আমার সাত রাজার ধন, এক মাণিক। এর পরে জীবনে আমার কোন্ অমৃতের শুভাগমন হবে, আমার জীবনের শীর্ণখাতে কোন ফল্গু সর্বব্যাপী, দিগন্তপ্লাবী, অনন্তগ্রাসী প্রবাহ নিয়ে আবির্ভূত হবে—সে চিন্তা গুরুর, আমার নয়। মহাগুরু নারোপার দেবদুর্লভ জীবনের কথা তিনি আগেও শুনেছিলেন। এখন সেই পরমপুরুষের অসম্ভাব্য তপশ্চর্যার বিবরণ গুরুর মুখে শুনে তিনি একেবারে বিহ্বল হয়ে গেলেন। শ্রীগুরুর পাদপদ্মে মাথা রেখে তিনি আর একবার নিজেকে চিরতরে উৎসর্গ ক'রে দিলেন।

কয়েকদিন পরে গুরু মিলাকে সঙ্গে নিয়ে আর এক মুক্ত ভূখণ্ডে একটি স্থান নির্দেশ ক'রে বললেন—আমার পাড়াপড়শী আত্মীয় স্বজনের মধ্যে সবাইকার আপত্তি সত্ত্বেও আমি এইখানে বাড়ি করা মনস্থ করেছি। অতএব এ ভার তোমাকেই নিতে হয়। বাড়িখানি হবে সাধারণ চতুষ্কোন—এবং দশতলা। এই বাড়ি শেষ হলেই আমি তোমাকে সাধনার চরম সম্পদ দান করবো। পূর্ব অভিজ্ঞতায় এই গৃহনির্মাণের ভবিষ্যৎ অনুমান ক'রে মিলা ভয়ে ভয়ে বললেন—'আমার নিবেদন, আমি এ প্রস্তাবে গুরুমাকেও সাক্ষী রাখি।' পরম উদার-ভাবে গুরু বললেন—'বেশ, তাঁকেও ডাক; এখন আমি যা বলছি, সুস্থ মস্তিকেই বলছি: অতএব সাক্ষ্যপ্রমাণে আমার ভয় কি?' গুরু-মাকে সাক্ষী রেখে মিলা এবারকার এই নতুন আদেশকে পাকা ক'রে নেবার জন্য তাঁর সমক্ষে পূর্ব অভিজ্ঞতা একে একে বর্ণনা করলেন। আনুপূর্বিক শ্রবণ ক'রে গুরুমা বললেন—'হ্যাঁ বাবা, সাক্ষী আমি রইলাম। কিন্তু তোমার গুরুকে তো আমি ভাল ক'রেই চিনি। কার্যকালে আমার সাক্ষ্যপ্রমাণে তোমার যে কিছুমাত্র সুবিধা হবে না, তা আমি যেমন জানি, তুমিও তেমনি ক'রে জেনে রাখো। যখন যা ওঁর মাথায়

চাপে সে কর্ম থেকে ওঁকে নিবৃত্ত করবার সাধ্য মানুষের নেই : আমি তো কোন ছার। তুমি যা কিছু বললে, সে সবই আমি জানি ; কতবার এই সব কথা নিয়ে ওঁর সঙ্গে আমার কথা-কাটাকাটি হয়ে গেছে ; এই বাড়ি গড়ানো আর ভাঙানো—এ যে ওঁর কি এক খেলা, সে আমার বুদ্ধিতে আসে না। তা ছাড়া, এখন যে জমিতে বাড়ি করার আদেশ দিচ্ছেন সে জমি ওঁর নিজেরও নয়। ওখানে গৃহনির্মাণে প্রবল আপত্তি হবে—তা থেকে নানা রকমের অশান্তির সৃষ্টি হবে তা জেনেও উনি যে কেন এমন আদেশ দিচ্ছেন—তা একমাত্র উনিই জানেন।'

মার্পা এতক্ষণ হাসিমুখে শুনছিলেন ; এবার বললেন, 'ও সব অবান্তর বিষয় আমি বুঝবো। তোমাকে সাক্ষী রাখা হয়েছে মাত্র, পরামর্শ দিতে ডাকা হয়নি।'

যথারীতি ভিত্তিস্থাপন ক'রে মিলা গৃহনির্মাণ-পর্ব শুরু করলেন'। এই ইতিহাসের পূর্ব পূর্ব অধ্যায় যাঁরা প্রত্যক্ষ করেছিলেন তাঁরা অসাক্ষাতে আর-এক প্রস্থ হেসে নিলেন, কারণ এতদিনে সবাইকারই ধারণা জন্মে গিয়েছিল যে গৃহনির্মাণের অর্থ মিলার ধৈর্য পরীক্ষা ছাড়া আর কিছুই নয়—গড়ানো ভাঙানোর খেলায় এক উন্মাদের উন্মত্ততা মাত্র। বিনা প্রতিবাদে আরব্ধ গৃহ দোতলা পর্যন্ত যখন অগ্রসর হয়েছে, তখনই অকস্মাৎ বিপর্যয়ের সূত্রপাত হল। প্রবেশদ্বারের ঠিক পাশেই একখানি সুবিশাল প্রস্তরখণ্ডের প্রতি লক্ষ্য ক'রে গুরু জিজ্ঞাসা করলেন, 'এ পাথর তুমি কোথা থেকে এনেছো ?' মিলা ভয়ে ভয়ে বললেন, 'এই একখানি পাথরই আমার নিজের আনা নয় : এখানি আমার গুরুভ্রাতারা খেলার ছলে একদিন এখানে গড়িয়ে এনেছিলেন, আমি এখানে স্থাপন করেছি।' গুরু ক্রোধান্বিত হয়ে বললেন, 'ওদের আনা পাথর দিয়ে তুমি তোমার বাড়ি গড়তে চাও কোন্ সাহসে ? হোক একখানা পাথর, এ পাথর এখানে রাখা চলবে না।

৩

যেমন ক'রে হোক এ পাথর এখান থেকে বহিষ্কৃত ক'রে দেওয়া চাই : সে জন্য যদি বাড়ি ভাঙতে হয়, তাও স্বীকার।' মিলা আতঙ্কিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু মাকে সাক্ষী রেখে আপনি যে বলেছিলেন এবারের শ্রম বৃথা যাবে না ?' গুরু বললেন, 'সে কথা এখনও আছে ; কেবল এই পাথরখানি চলবে না। তার জন্য যদি আগাগোড়া বাড়ি ভাঙতে হয়, সে দোষ তোমার, আমার নয়। কারণ অন্যের আনা পাথর ব্যবহারের অনুমতি আমি তোমাকে দিই নি।'

অবশ্যম্ভাবীকে নতমস্তকে মেনে নিয়ে মিলারেপা আবার সেই ভাঙার কাজে লেগে গেলেন। নিরুদ্বেগ, নিরুত্তাপ নির্মম ঔদাসীন্যের কোনখানে যেন মানবীয় দুর্বলতার আমেজমাত্র নেই। তাঁর চারি-পাশে, দিনের পর দিন ধরে, নির্লিপ্ততার গাঢ় মেঘ পুঞ্জীভূত হয়ে যেমন নিজের কাছে তেমনি বাইরের সকলের কাছে মানবসন্তান মিলারেপাকে সমভাবে দুর্নিরীক্ষ ক'রে তুলেছিল। যেন কিছুই হয় নি ঠিক এমনি ভাবে সমগ্র দ্বিতলগৃহের পরিপূর্ণ একটি দিক চূর্ণবিচূর্ণ ক'রে, ভিত্তি-প্রস্তর-লগ্ন পাথরখানি স্থানচ্যুত ক'রে পূর্বস্থানে রেখে ফিরে এলেন। এই আয়াসসাধ্য দুরূহ কর্ম সমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গুরু এলেন ; প্রসন্ন হাস্যে বললেন, পাথরখানি আগে যেখানে ছিল ঠিক সেইখানেই তাকে রেখে এসেছো তো ? বেশ হয়েছে, এইবারে আবার যাও, সেখানি ফিরিয়ে এনে যথাস্থানে সন্নিবিষ্ট করো।' যন্ত্রচালিতের মত মিলা আবার সেই দশজনের বোঝা একা বয়ে নিয়ে এলেন এবং নিজের হাতে ভাঙা বাড়ি আবার নতুন ক'রে গড়তে শুরু করলেন।

আত্মীয় প্রতিবেশীরা বিরুদ্ধ মন নিয়েও এই ভাঙাগড়ার কৌতুকাবহ বৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করছিলেন। মহাশক্তিধর মার্পাকে তাঁরা অনন্যসাধারণ রূপে কোনদিন কল্পনা পর্যন্ত করেন নি। সাধারণ মস্তিষ্কে কতখানি গোলযোগ থাকলে মানুষ বৎসরের পর বৎসর ধরে এমনি ক'রে অর্থহীন ভাঙাগড়ার কাজে আনন্দ পেতে পারে—এই বিষয়ে জল্পনা-

কল্পনা ক'রে তাঁরা তাঁদের প্রাত্যহিক হাস্যের খোরাক সংগ্রহ করছিলেন। মস্ত বড় একখানি প্রস্তরখণ্ড গাঁথা হ'ল, ভাঙা হ'ল, আবার ফিরিয়ে এনে পূর্বস্থানে প্রতিস্থাপিত হল—এই সবই তাঁরা লক্ষ্য করলেন এবং তৎক্ষণাৎ বুঝে নিলেন যে এই হ'ল সেই চিরন্তন উন্মত্ততার প্রথম ধাপ। অতঃপর তাঁরা প্রথম ধাপের পরে অবশ্যম্ভাবী দ্বিতীয় ধাপের জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা ক'রে রইলেন। কিন্তু চোখের উপর দিয়ে এক দুই তিন ক'রে গৃহ ক্রমে সাততলা পর্যন্ত গড়ে উঠলো। ঠিক এমনটি হবার যেন কথা ছিল না। মার্পার মতিগতি কি হঠাৎ বদলে গেল? জরুরি বৈঠক বসলো; বহু তর্কবিতর্কের পরে স্থির হ'ল যে আর অধিক প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না। পাগলের মস্তিষ্কে সুস্থতার লক্ষণ দেখে তাঁরা আতঙ্কিত হয়ে উঠলেন: মস্ত এক দল গড়ে তাঁরা এই অন্যায় সংগঠনের প্রতিবিধানে উদ্যত হয়ে উঠলেন। অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত আক্রমণকারীর দল অন্ধকার রাত্রে বাড়ির কাছাকাছি এসে দেখলেন, আর অগ্রসর হবার উপায় নেই; বাড়ির ভিতরে বাইরে অসংখ্য সৈনিক নিঃশব্দ প্রহরায় নিযুক্ত: সেই দুর্ভেদ্য ব্যূহ ভেদ করা কোন মানুষের সাধ্য নয়। কে এরা? এই জনহীন প্রান্তরে কোন্ মায়াবীর সৃষ্টি এই অতিমানবীয় সৈন্যদল? নিরাপদ দূরত্ব বজায় রেখে বিরুদ্ধ জনতা যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথেই—একটি দুটি ক'রে নিঃশব্দ ছায়ার মত মিলিয়ে গেল। দলের মাতব্বর যারা, সবাই একে একে অন্যের অজ্ঞাতসারে এসে মার্পার শরণ নিল। মিলার নিজের হাতে গড়া সাততলা বাড়ি সগৌরবে স্বস্থানে মাথা উঁচু ক'রে খাড়া রইলো।

এই সময়ে মার্পার নিকটে দীক্ষাপ্রার্থী বহুজনের সমাগম হ'ল। গুরুমার মনে হ'ল এতদিনে মিলার বহুপ্রার্থিত শুভক্ষণ বুঝি সমাগত হয়েছে। গোপনে মিলাকে ডেকে তিনি উদ্যোগী হবার পরামর্শ দিলেন। হৃষ্টমনে মিলাও গিয়ে দীক্ষাপ্রার্থীদের পাশে গিয়ে বসলেন।

অনাহুত মিলাকে সভাস্থলে আসতে দেখে মার্পা বললেন, 'তুমি এখানে কি মনে করে? যারা দীক্ষাপ্রার্থী তারা সবাই উপযুক্ত দক্ষিণা নিয়ে এসেছে ঃ তোমার দক্ষিণা কই? বুঝেছি; তুমি ভেবেছো, গুরুর জন্য কয়েকখানি কাদামাটির বাড়ি গড়েই তুমি দক্ষিণার মূল্য শোধ করেছো! মূর্খের স্পর্ধা গগনস্পর্শী হয় তা জানি—কিন্তু কেবল সেই স্পর্ধার মূল্যে পরম ধন লাভ করা যায় না। উপযুক্ত দক্ষিণা দেবার সামর্থ্য যার নেই, তার স্থান এখানে নয়। দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে, তোমার মুখ দেখলেও মহাপাতক হয়।' বলতে বলতে উত্তেজিত হয়ে, গুরু, অতিথি অভ্যাগতের সহস্র দৃষ্টির সামক্ষে ভীত সন্ত্রস্ত শিষ্যকে পদতাড়না ক'রে বহিস্কৃত ক'রে দিলেন।

রোরুদ্যমান স্নেহাস্পদকে সান্ত্বনা দিতে এসে গুরুমা নিজেও কেঁদে ফেললেন। বললেন, 'তোমার গুরুকে এতদিন দেখেও আমি চিনলাম না। তিনিই বলেন, ভারতভূমি থেকে যে মহাজ্ঞান আহরণ ক'রে এনেছি তা দিয়ে সবাইকার চেতনার মোড় ফিরিয়ে দেব ঃ মানুষ থেকে সামান্য পশু পর্যন্ত সকলের অধিকার সেই চিরন্তন শাশ্বত সত্যে। অথচ তোমার বেলায় সেই করুণার সমুদ্র কেন যে এমন শুকিয়ে যায় তা বুঝতে পারি না। তথাপি আমি বলছি তুমি বিশ্বাস হারিও না। মূর্খ নারী আমি, তবু আমার মন বলছে তোমার সময় হয়ে এসেছে। দুঃখ রজনীর প্রভাত হবে, তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে অপেক্ষা করে থাকো।'

কাঁদতে কাঁদতে মিলা ঘুমিয়ে পড়লেন। ভোর হতেই গুরু তাঁর ঘরে এসে দেখা দিলেন; প্রসন্ন সৌম্য মূর্তি ঃ কে বলবে এই একই ব্যক্তি পূর্বাহ্লে অমন উগ্র মূর্তি ধারন করেছিলেন। মিলার হাতে আর একটি বৃহত্তর বাড়ির নক্সা দিয়ে বললেন, 'শোনো হে যাদুকর, ও বাড়ির যতদূর হয়েছে ঐ পর্যন্তই থাক। এবার তুমি আর একটি বাড়ির কাজে লেগে যাও। বারোটি মোটা মোটা থাম থাকবে সামনে, মধ্যে থাকবে

বিরাট সভাঘর আর মন্দির, আর এক পাশে থাকবে সারি সারি বাস-কক্ষ। এই কর্ম সমাপ্ত হলেই তুমি যা চাও তাই পাবে।'

আদেশও নতুন নয়, প্রতিশ্রুতিও নতুন নয়। মন নামক বিচারশীল বস্তুটি যার থাকে সে এই পুনরাবৃত্তিতে কি সান্ত্বনা পায় কে জানে! কিন্তু সে বালাই মিলার ছিল না। বিনা-বিতর্কে মিলা আদেশ শিরোধার্য করে নিলেন। প্রশ্ন করার প্রয়োজনই তাঁর মনে হ'ল না। বেদনার মাঝে মাঝেই—হয়তো বেদনার মাধ্যমেই, তিনি কেমন করে যেন নিজের ভাগ্যলিপি নিজের অজ্ঞাতসারে পড়ে নিয়েছিলেন। তাই সে মনে হতাশার বিক্ষেপ বা নৈরাশ্যের আক্ষেপ ছিল না। কর্ম আছে আর তার নৈর্ব্যক্তিক ফল আছে: এও যেমন অমোঘ, ও-ও তেমনি অমোঘ: মাঝখানে যে 'আমি', সে কেবল অবোধের মত, নিঃসম্পর্কীয় ঘটনাস্রোতের অগ্রপশ্চাতের সংঘটনদ্বয়ের মধ্যে অর্থহীন যোগসূত্র সৃষ্টি করছে, আর নিজের গতিবেগে অকারণ বেদনাবোধের ফেণায় নিজেই উদ্বেল হয়ে উঠছে। নিরবচ্ছিন্ন কর্মযজ্ঞের পাকে পাকে জড়িয়ে গিয়ে হয়তো বা তাঁর জীবন্ত মন, মৃতের মত অসাড় হয়ে গিয়ে, নিজের সত্তাই একান্ত ভাবে হারিয়ে ফেলেছিল। নইলে এতখানি বিড়ম্বনা এমন অবলীলাক্রমে মেনে নেওয়ার শক্তিই বা তিনি কোথা থেকে পেলেন? তিনি ভাবলেন—সইতে যদি না পারি, তবে সহন-শক্তি আসবে কেমন ক'রে? ক্ষুদ্র দেহের ক্ষুদ্র মনের ছোটখাটো বেদনায় যদি ভেঙে পড়ি, তবে বৃহতের বেদনাকে ধারন করবো কোন্ প্রাণে। তাঁর মনে হ'ল—গুরুর যেন করুণার অন্ত নেই, কঠিনের কাঠিন্যে যেন মমতার প্রস্রবণ। সমস্ত মনপ্রাণ দিয়ে তিনি গুরুর আদেশকে মুক্তির একমাত্র পন্থারূপে আঁকড়ে ধরলেন। আবার দীর্ঘদিনের পরিশ্রমে প্রস্তর কর্দমের সুপ্রশস্ত হর্ম্য খাড়া হল; দীক্ষার অঙ্গনে, গুরুমায়ের পরামর্শে মিলা দীক্ষাপ্রার্থী হয়ে উপস্থিত হলেন এবং লাঞ্ছিত হয়ে, দেহমনে দুঃসহ বেদনা নিয়ে ফিরে এলেন। কিন্তু এবারেও এমনতর প্রতিজ্ঞা করতে

পারলেন না যে,এই শেষ—এ নিষ্ফল ভাগ্যপরীক্ষার আর আমার প্রয়োজন নেই।

অবশ্য এ কথাও ঠিক যে, মিলা যদি বহুবারের বহু লাঞ্ছনার উত্তরে শেষ পর্যন্ত, জোর গলায়, 'প্রয়োজন নেই' বলে এড়িয়ে যেতে চাইতেন, তা হলেও তাঁর প্রত্যাবর্তনের পথটি খোলা পেতেন না। কারণ এই এতটুকু বয়সের যে অবোধ বালকটি একদিন মাতৃআজ্ঞায় নিরুদ্দেশের সন্ধানে ঘর ছেড়ে এসেছিলেন—এতদিনের এই দীর্ঘ ব্যবধানে, তাকেই তো আর খুঁজে পাবার উপায় ছিল না। তা ছাড়া বিশাল বিশ্বে তাঁর ফিরে যাবার স্থানই বা ছিল কোথায়? বহুদূরের এক স্বপ্নময় প্রতিধ্বনির মত যদি বা কখনো বিদ্যুৎ-চকিত শৈশবের স্মৃতির সঙ্গে, মায়ের স্নেহাঞ্চলের কথা একটুখানি মনে পড়েছে—জলের আল্‌পনার মত সঙ্গে সঙ্গে তা চকিতের মত মিলিয়ে গেছে। অতএব পূর্ব পূর্ব বারের মত এবারেও যখন গুরু তাঁকে পুনরায় গৃহনির্মাণে উৎসাহিত করলেন, তিনিও তাঁর সমগ্র পিঠজোড়া দগ্‌দগে ঘা নিয়ে তখনই কাজে লেগে গেলেন। পুরাতন ক্ষতের উপরে ধুলা বালি পাথরের বোঝার ঘর্ষণ লেগে লেগে রক্তের স্রোত বইছে—কিন্তু সেদিকেও তাঁর কিছুমাত্র লক্ষ্য নেই! গুরু তো আদেশ দিয়েই খালাস: তাঁর মনের ভাব কেউ জানে না, কারণ ত্রিভুবনে যিনি দোসরহীন একক, তাঁর ইচ্ছা অনিচ্ছার অংশীদার কে হবে?

কিন্তু এবারে আর মিলা গুরুমার চোখ এড়াতে পারলেন না। সহধর্মিনী ক্ষিপ্রপদে স্বামীর কাছে গেলেন; বললেন, 'ছেলেটাকে যদি মেরে ফেলতেই চাও, সে কাজ একেবারে করলেই তো আপদ চুকে যায়। এমন দগ্ধে দগ্ধে মানুষকে মানুষ মারতে পারে এ স্বচক্ষে দেখেও কি আমাকে চুপ ক'রে থাকতে বলো? মিলার হাত-পা ছড়ে রক্ত পড়ছে, পিঠের উপরে দগ্‌দগে তিনটে ঘা দিয়ে অনবরত রক্ত পুঁজ পড়ছে—এ সব কি তোমার চোখে পড়ে না? তুমি না লামা, তুমি

না ধর্মগুরু—তোমার এই নিষ্ঠুরতা! গরু মহিষের পিঠের উপরে বোঝা বয়ে বয়ে ঘা হতে দেখেছিলাম, তোমার কল্যাণে এবার এই প্রথম মানুষেরও সেই দশা দেখলাম। তোমার ধর্ম তোমার কাছে—আমি আর কি বলবো? কিন্তু নিজের মুখে তুমি বলেছো বাড়ি তৈরি শেষ হলেই তোমাকে দীক্ষা দেবো। এ কথা আমি স্বকর্ণে শুনেছি। তোমার সে অঙ্গীকারেরও কোন মূল্য নেই?'

অপ্রতিভ হওয়া দূরে থাক, স্ত্রীর এই সমস্ত ক্রুদ্ধ অভিযোগেও মার্পা হাসতে লাগলেন। বললেন, 'বাড়ি শেষ হ'ল কোথায়? দশতলা সমাপ্ত হ'লে তবে তো দীক্ষার কথা ছিল। মোটে তো সাততলা হয়েছে—এর মধ্যে সে-কথা ওঠে কেন?'

গুরুমা লড়াইয়ের জন্য প্রস্তুত হয়েই এসেছিলেন; বললেন, 'কেন সে-কথা ওঠে সে তুমিও জানো আমিও জানি। সাততলার পরে দশতলা কবেই তো হয়ে যেতো, তুমিই চালাকি ক'রে সে কর্ম সমাপ্ত হতে দাও নি। কোন কথাই আমি বলিনি, এখনও বলতাম না। কিন্তু ছেলেটার মা এখানে নেই, আমিই ওর মায়ের মত: তোমার এই নিষ্ঠুরতা আমি আর চোখ মেলে দেখতে পারি না।' তাঁর দু-চোখ দিয়ে ঝরঝর ক'রে কয়েক বিন্দু অশ্রু গড়িয়ে পড়লো।

বিব্রত হয়ে মার্পা বললেন, 'দেখতে না পারো নাই বা দেখলে! আমি বলেছি দশতলা সমাপ্ত হয়ে গেলে দীক্ষা দেব—তার আর নড়চড় হবে না। আর, মিলার পিঠের ঘাটা কি সত্যিসত্যিই সাংঘাতিক হয়ে উঠেছে, না এও তোমার মেয়েলি কল্পনা?'

দলিতা ফণিনীর মত গুরুমা খাড়া হয়ে দাঁড়িয়ে উঠলেন—'কল্পনা বলবে বই কি! নিজের অত্যাচারের খেলায় অন্ধ হয়ে না থাকলে নিজের ওই দুটো চোখ দিয়েই দেখতে পেতে যে মিলার পিঠে ঘা হয়েছে বললে কিছুই বলা হয় না: তার সারা পিঠ বলতে ঘা ছাড়া আর

কিছু নেই। কিন্তু তোমার সঙ্গে এ আলোচনায় আমার প্রবৃত্তি নেই, আমার আরও কাজ আছে।' বসনাঞ্চলে মুখ আবৃত ক'রে সবেগে নিষ্ক্রান্ত হয়ে গেলেন। তাঁর গমনপথের দিকে তাকিয়ে গুরু বললেন, 'মিলাকে একবার আমার কাছে এখনই পাঠিয়ে দিও।'

মিলা আসতেই গুরু বললেন, 'পিছন ফেরো, দেখি তোমার পিঠে কেমন ঘা হয়েছে।' অনেকক্ষণ ধরে ক্ষতস্থান নিরীক্ষণ ক'রে বললেন, 'যা ভেবেছিলাম ঠিক তাই! যতো সব মেয়েলি কথা! এ আর কি এমন ঘা? আমার গুরু মহর্ষি নারোপাকে সত্যের জন্য যা সইতে হয়েছিল এ তার কাছে কিছুই নয়। তাঁর দেহের উপর দিয়ে যে চব্বিশটি পীড়ন হয়ে গেছে, তার যে কোন একটির সঙ্গেও তোমার এই ক্ষতের তুলনা করা চলে না। আমার নিজেকেও বড় কম সইতে হয় নি। সত্যিই যদি তুমি সত্যসন্ধানী হও, ধীর স্থির ভাবে আদিষ্ট কর্ম ক'রে যাও। ঘায়ের উপরে মোটা ক'রে কাপড় ঢেকে রাখলে আর ধুলো-বালি-ময়লা প্রবেশ করবে না। এই সমস্ত বাজে ছুতোয় গৃহ-নির্মাণের কর্মে যেন ত্রুটি না হয়।'

গুরুর আদেশ শিরোধার্য ক'রে মিলা আরব্ধ কর্ম সমান তালে চালিয়ে যেতে লাগলেন। পিঠের উপরে কাপড় বাঁধলে কি হবে, পাথরের বোঝার চাপ লেগে পৃষ্ঠক্ষত ক্রমেই বিষাক্ত হয়ে উঠলো। মিলা সোজা হয়ে দাঁড়াতেও পারেন না দেখে গুরুমা আবার স্বামী সকাশে কেঁদে গিয়ে পড়লেন। গুরু বললেন: 'তা হোক—কাজ ছাড়া চলতেই পারে না। বিশ্রামে আমার সম্মতি নেই। বেশি পাথর বইতে না পারে—যা পারে তাই বইবে; তাতে দশতলায় পৌঁছাতে বিলম্ব হবে এই মাত্র।'

গুরুমা মর্মাহত হয়ে মিলার কাছে ফিরে এলেন। আরক্ত মুখে বললেন, 'ও পাষাণকে বলে যে কিছু হবে না তা আমি জানতাম। শোনো মিলা, এবার আমাদের বাঁকা পথ ধরতে হবে। তোমার পুঁথি-

পত্র নিয়ে একটা পুঁটলি বাঁধো, তার সঙ্গে তোমার জামা-কাপড়েরও আর একটা বোঝা মাথায় ক'রে নিয়ে পথের মোড়ের দিকে চলে যাও ; আমিও তোমার পিছনে পিছনে গিয়ে তোমাকে ফিরিয়ে আনবার জন্য অনুনয় বিনয় করবো, আর তুমিও জোর গলায় বলবে, 'না মা, আমাকে ফেরাবেন না : আমাকে চলে যেতে দিন !' ঠিকমত অভিনয় করতে পারলে হয়তো বা তোমার উদ্দেশ্য সিদ্ধ হবে।'

গুরুমার নির্দেশ মত মিলা মোট-পুঁটুলি বেঁধে পথের ধারে নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে দাঁড়ালেন। গুরুমাও পিছনে পিছনে গিয়ে তাঁর অংশ যথাযথ ভাবে সম্পাদন করলেন। ফলও আপাততঃ ঠিকই হল। নিজের আসন থেকে দুজনের উত্তর প্রত্যুত্তর শুনে মার্পা স্ত্রীকে ডেকে বললেন, 'অভিনয় ভালই হয়েছে ; কিন্তু ব্যাপারটা কি বলো তো ? রুষ্ট স্বরে গুরুমা বললেন, 'শুনতেই তো পাচ্ছো, মিলা চলে যেতে চাইছে। ওকে দোষ দিতে পারি না। সত্যিই তো ঘরবাড়ি ছেড়ে এখানে এসে কতকাল পড়ে আছে : পেয়েছে কেবল লাঞ্ছনা আর গঞ্জনা। মানুষের পরমায়ুর কথা কে বলতে পারে ? তাই ও যদি সত্যের সন্ধানে অন্যত্র যেতে চায় ওর অপরাধ কি ?'

গুরু বললেন, 'বটে !' আসন ছেড়ে উঠে এসে মিলাকে আপাদ-মস্তক প্রহারে জর্জরিত ক'রে গুরু বললেন : 'তোর এ দেহ না তুই আমাকে দিয়েছিলি ? আজ যে যেতে চাস্, সে অধিকার কে তোকে দিয়েছে ? আমার দেহ আমি যদি কেটে টুকরো টুকরো ক'রে ফেলি তাতে বাধা দেবে কার সাধ্য ? আমার পায়ে দেহমনবাক্যে নিজেকে সমর্পণ ক'রে আজ তুই কোথায় যেতে চাস্, নির্লজ্জ ?

গুরুমার চোখের সামনেই এ সমস্ত ঘটে গেল। তিনি বজ্রাহতের মত সমস্ত ঘটনাটি দাঁড়িয়ে দেখলেন ; কিন্তু মিলাকে নির্যাতন থেকে বাঁচাতে পারলেন না।

যেখানকার মিলা সেখানেই রয়ে গেলেন : যাওয়া আর হ'ল না।

কিন্তু এই ব্যর্থ অভিনয়ের পূর্বে এবং পরে মিলার অন্তরে চিরদিনের সেই একটি মাত্র বেদনাই বাজতে লাগলো যে, মিথ্যার এই আবরণ খুলতে হবে; নিজের মধ্যে যা কিছু, কুঁড়ির আবরণে গন্ধের মত, মেঘের আড়ালে সূর্যের মত আবৃত হয়ে রইলো, রক্ত-মাংস-অস্থি-মজ্জায় লুকিয়ে আত্মগোপন ক'রে রইলো—তার ভার ক্রমেই দুঃসহ হয়ে উঠছে। যে আলোক আছে, যে আকর্ষণ অন্তরীক্ষে ক্রন্দসীর রূপে অহর্নিশি তৃণে তৃণে স্পন্দিত হচ্ছে—আমার জীবনে তার পরিণাম নেই কেন? কোথায় আমার সেই অনন্ত অনুপম পরিপূর্ণতা—যা আপনাতে আপনি অনুপম হয়ে ফুটে উঠবে?

তাই এত কাণ্ডের পরেও যখন গুরুমা তাঁকে সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'তুমি হতাশ হোয়ো না, আমি বলছি তোমার ধন তোমাকে পেতেই হবে। আপাততঃ আমার যতটুকু সাধ্য ততটুকু সাধনা আমি তোমাকে দান করবো' মিলা কৃতজ্ঞচিত্তে দু-হাত পেতে সেই সাধনা গ্রহণ করলেন। তৃষ্ণা মিটলো না বটে, কিন্তু তাঁর মনে হ'ল যেন এতদিনে তাঁর জীবনে একটুখানি সার্থকতার পূর্বাভাষ এলো। কিন্তু নিজেকে একান্ত ভাবে ক্ষয় ক'রে দিয়ে অক্ষয়কে পাওয়া হল কই? বন্ধ ঘরের জানালা দিয়ে বহুদূরের রহস্যময় আকাশের দিকে সতৃষ্ণনয়নে তাকিয়ে থাকার বিরাম হবে কবে? আপনার সমস্তকে দিতে দিতে যে অন্তহীন পাওয়া—তার শেষ সঙ্কেতটি যে এখনো পাওয়া হয়নি, তার উপায় কি হবে? পাহাড়ের পরে পাহাড়, শৃঙ্গের পরে শৃঙ্গ উন্নত হয়ে আছে দিগন্তের পটভূমিকায়। তাই সমগ্র আকাশটাকে এক নিশ্বাসে আয়ত্তের মধ্যে আনা যাচ্ছে না। যতদিন তা না যাচ্ছে, ততদিন কি এই ক্ষুদ্র সত্তার অত্যাচার সহ্য করতে হবে? তার চেয়ে সত্যি সত্যিই বেরিয়ে পড়লে কেমন হয়? কিন্তু একমাত্র মার্পা ছাড়া ত্রিসংসারে সমগ্র সত্যের অধিকারী আর কে কোথায় আছে? কি দিয়ে তাঁকে প্রসন্ন করা যাবে? তাঁকে দক্ষিণা দেবার মত কিছুই যে আমার নেই—অন্তর্যামী পুরুষ কি সে কথা জানেন না?

এমনি সমস্ত এলোমেলো চিন্তার মধ্যেই গুরুমা একদিন তাঁকে ডেকে বললেন, 'তোমার দক্ষিণার ব্যবস্থা করেছি ; আমার পিতৃদত্ত বহুমূল্য রত্ন আমি এই তোমাকে দিলাম। এ ধন তোমার গুরুর নয়, অতএব দস্তা-পহরণের প্রশ্ন এখানে উঠতে পারে না। আগামী দীক্ষার দিনে তুমি দক্ষিণা-স্বরূপ এই মহার্ঘ রত্নের বিনিময়ে তোমার নিজের প্রাপ্য চেয়ে নিয়ো।'

শিশুর মত আনন্দে মিলা উচ্ছ্বসিত হয়ে উঠলেন ; তাঁর মনে হল, এইবার এই রত্নের মূল্যেই তিনি দুর্লভ রত্নের অধিকারী হবেন। আভূমি প্রণত হয়ে তিনি মাতৃস্বরূপিণীর আশীর্বাদ গ্রহণ করলেন।

বাৎসরিক দীক্ষার দিনটিতে এবারে মিলার আর আশঙ্কার কিছু নেই, কারণ গুরুমার স্নেহের দান গুরুদক্ষিণার আবশ্যিক মূল্যস্বরূপ গুরুর পদপ্রান্তে স্থাপন করবার অধিকার তো তাঁর হাতেই আছে। সভাগৃহে গুরু প্রবেশ করবার অনেক আগে থেকেই দূর-দূরান্তরের দীক্ষাপ্রার্থীর দল সমাগত হয়েছেন ; বিভিন্ন বয়সের নরনারী নিঃশব্দচারী মধুমক্ষিকার মত অধ্যাত্ম-সৌরভের মাদকতায় আকৃষ্ট হয়ে পারমার্থিক লাভের প্রত্যাশায়, কত পথ অতিক্রম ক'রে নির্দিষ্ট দিনটিতে দাতার দ্বারপ্রান্তে এসে পৌঁছেছেন। প্রত্যাশায় সমুজ্জ্বল বিভিন্ন বয়সের মুখের পানে তাকিয়ে তাকিয়ে মিলার যেন চোখে পলক পড়ে না। তাঁর গুরুর দ্বারে এই অগণিত প্রার্থীর ভিড় ; গণ্ডুষে গণ্ডুষে কে কত পান করবে করুক না—সমুদ্রের আয়ব্যয় নেই। অজস্র যাঁর সম্পদ, তিনি মুষ্টি-ভিক্ষায় কাতর হবেন কেন ? গর্বে আনন্দে মিলারেপা ভুলে গেলেন তাঁর আজীবন-সঞ্চিত পর্বতপ্রমাণ গ্লানি, দৈনন্দিন আশার অন্তে অতল-স্পর্শ নৈরাশ্য। তাঁর মনে হ'ল—ভাগ্যে এতদিন ধরে এতখানি বিড়ম্বনা সঞ্চিত হয়েছিল, নইলে এই অনুপম শুভদিনটিকে বরণ ক'রে নিতাম আমি কি দিয়ে ? দুঃখ যদি রিক্ততার দীনবেশে পূজাবেদীর সম্মুখে গিয়ে নিরাভরণ শূণ্যতায় নিরাবয়বের আরতি না করে, তা হলে যে মহাপূজা ব্যর্থ হয়ে যায়।

সমবেত জনতার মধ্যে অস্পষ্ট গুঞ্জন চঞ্চল হয়ে উঠলো : মার্পা এসে সভায় প্রবেশ করলেন। কারুর দিকে দৃষ্টিপাত মাত্র না ক'রে গুরু সোজা চলে এলেন যেখানে মিলা সকলের পিছনে নিজের মনে স্বপ্নজাল বুনছিলেন। পরুষ কণ্ঠে গুরু বললেন, 'মিলা, দক্ষিণা না নিয়ে আবার তুমি এই সভাঘরে এসে হাজির হয়েছো ?'

নতশিরে নিঃশব্দে মিলা হস্তধৃত নীলাভ রত্নটি গুরুপদে অর্পণ ক'রে প্রণাম করলেন। গম্ভীর মুখে সেই বহুমূল্য রত্নখণ্ড গুরু ঘুরিয়ে ফিরিয়ে দেখলেন। পর্যবেক্ষণান্তে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কোথায় পেলে এই রত্ন ?' শুষ্কমুখে মিলা বললেন, 'গুরুমা আমাকে দিয়েছেন।' মৃদু হাস্যে গুরু বললেন : 'বুঝেছি, আর বলতে হবে না। কোথায় দামেমা, ডাকো তাকে।'

দামেমাকে ডাকবার দরকার ছিল না, কারণ অত্যন্ত সজাগ হয়ে তিনি নিকটেই ছিলেন। মহর্ষি'র সমক্ষে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হয়ে তিনি বললেন, 'প্রভু, এ রত্ন আমাদের বিবাহের যৌতুক নয় বা আমাদের যৌথ অধিকারভুক্ত বস্তুও নয়। আমাদের বিবাহের পরে আমার পিতা আপনার রুষ্ট স্বভাব দেখে আমার ভবিষ্যতের কথা ভেবে আতঙ্কিত হয়ে উঠেছিলেন। তাঁর মনে ভয় হয়েছিল হয়তো বা অদূর ভবিষ্যতে এমন একটি দিন আসতে পারে যেদিন অন্নাভাবে আমাকে পথে পথে ভিক্ষা ক'রে বেড়াতে হবে। সেই ভয়ে তিনি একান্ত গোপনে এই বহুমূল্য মণিখণ্ড আমাকে আমার নিজের ভবিষ্যৎ সংস্থানের জন্য স্ত্রীধন হিসাবে দান করেছিলেন। তাই এতদিন পর্যন্ত এটিকে আমি গোপন ক'রেই রেখেছিলাম। কিন্তু মিলার ব্যথাহত মুখের পানে তাকিয়ে আমি আর নিজের ভবিষ্যৎটাকে বড় ক'রে দেখতে পারলাম না। কেবলমাত্র সামান্য দক্ষিণার অভাবে ও যে বারংবার প্রবঞ্চিত ও অপমানে প্রত্যাখ্যাত হয়েছে তা আমি স্বচক্ষে দেখেছি। আমি মা, আমার বুকে ওর বেদনা বেজেছে বলেই স্বেচ্ছায় এই দক্ষিণার মূল্য আমি মিলার হাতে

তুলে দিয়েছি। আমার মিনতি, এইবার দক্ষিণার মূল্যে আপনি ওকে ওর প্রার্থিত দীক্ষা দান করুন। এই সভাগৃহে আমার পুত্রোপম দীক্ষিত শিষ্যমণ্ডলীর কাছেও আমার নিবেদন যে তাঁরা যেন একবাক্যে আমার এই মিনতির সমর্থন করেন।'

দামেমা (মার্পার ধর্মপত্নী) এতগুলি কথা এক সঙ্গে মহর্ষি মার্পার সমক্ষে আর হয়তো কখনোই বলেন নি। এইবার তিনি চুপ করলেন। সামান্য একটু ক্ষীণ সমর্থনের মত এক-আধটুকু গুঞ্জরণ সভার এপাশ-ওপাশ থেকে শোনা যে গেল না, তাও নয়। কিন্তু মার্পার সর্বজন-বিদিত উগ্র স্বভাবকে সকলেই ভয় করতেন, অতএব পুত্রোপম শিষ্য-মণ্ডলীর কাছে আবেদন প্রায় অরণ্যে রোদনের মতই নিষ্ফল হ'ল।

গুরু ধীরে সুস্থে দুর্লভ মণিখণ্ডটিকে নিজের গলার হারে সংযুক্ত করলেন। স্মিত মুখে বললেন, 'দেখো দামেমা, তোমার নির্বুদ্ধির ফলে এই মহামূল্য মণিটি প্রায় যেতে বসেছিল। ধর্মপত্নীরূপে তুমি আমারই সম্পত্তি: অতএব তোমার যা কিছু সে সবই আমার। অতএব তোমার নিজস্ব বলে কিছু থাকা সম্ভব নয়। আর, শোনো যাদুকর, তোমার নিজস্ব যদি কিছু দক্ষিণা দেবার থাকে, আমি তার বিনিময়ে তোমাকে দীক্ষাদানে সম্মত। কিন্তু এ মণি আমার: এর বিনিময়ে তুমি দীক্ষার প্রার্থনা করতে পারো না।'

গুরুর বাক্যে ক্রোধের আভাষ না দেখে এবং দামেমা তখনও নতজানু হয়ে রয়েছেন দেখে, মিলা নিজের আসন ছেড়ে উঠে যেতে ইতস্ততঃ করছিলেন। আশার ক্ষীণ সূত্রটুকু আঁকড়ে ধরে তিনি বসে রইলেন। এত লোকের চোখের সামনে দিয়ে উঠে যেতেও তাঁর মন সরছিলো না। বিদ্যুৎগর্ভ মেঘ থেকে বজ্রাগ্নি ফেটে পড়লো, সভাস্থ সকলে সচকিত হয়ে উঠলেন। মার্পা ক্রুদ্ধ স্বরে হাঁকলেন, 'এখনো বসে আছো, বেয়াদব? দূর হয়ে যাও আমার সামনে থেকে।' নিজের হাতে মিলার চুলের ঝুঁটি ধরে মাটিতে উপুড় ক'রে ফেলে দিয়ে

পদাঘাত করতে লাগলেন এবং তাতেও সন্তুষ্ট না হয়ে মস্তবড় একখানি লগুড় দিয়ে মিলাকে আক্রমণ করলেন। বিষম ত্রাসে মিলা সেই দ্বিতল কক্ষের খোলা জানালা দিয়ে লাফ দিয়ে নিষ্ক্রান্ত হলেন। এই আকস্মিক বিপদপাতে আতঙ্কিত হয়ে সবাই চিত্রার্পিতের মত স্তব্ধ হয়ে রইলেন। কিন্তু কেউই সাহস ক'রে একটু নড়ে বসতেও পারলেন না। কেবল দামেমা বিদ্যুৎগতিতে দাঁড়িয়ে উঠে, স্বামীর মুখের পানে একটি মুহূর্তের জন্য ক্ষুব্ধ বিহ্বল দৃষ্টি হেনে, ঝড়ের মত সামনের সিঁড়ি দিয়ে নেমে গেলেন। পলকের জন্য মনে হ'ল যেন একটি অতি করুণ কোমল স্নেহার্দ্র দৃষ্টির সজল আভাষ মহর্ষির মুখের উপরে খেলে গেল ; কিন্তু পরক্ষণেই সেই অভ্যস্ত নির্বিকারত্বের মুখোসটি মুখের উপরে এঁটে মহর্ষি মার্পা দীক্ষাপ্রার্থীদের প্রার্থনা পূরণে ব্রতী হলেন। নিস্তরঙ্গ মহামনের এতটুকু চাঞ্চল্যও তাঁর শান্ত মুখভাবে প্রতিফলিত হল না।

আশ্চর্যের বিষয় যে অতখানি উঁচু থেকে পড়েও মিলার দেহ প্রায় অক্ষতই রয়ে গেল। রোরুদ্যমানা গুরুমাতা পরম যত্নে তাঁকে মাটি থেকে তুলে ঘরে নিয়ে গেলেন এবং নানাভাবে প্রবোধ দিয়ে বোঝাতে লাগলেন। মিলার অশ্রুর সঙ্গে সঙ্গে তাঁর নিজের চোখ দিয়েও জল ঝরতে লাগলো। মিলা বললেন, 'মা, এ দেহ আমি আর রাখবো না। কেবল তুমি অনুমতি দিলেই আমি নিশ্চিন্ত হয়ে মরতে পারি।' পরম স্নেহাস্পদকে এভাবে কাঁদতে দেখে মা চোখের জল মুছে বললেন, 'ও-কথা ভুলে যাও। দেহ গেলে তো এ জন্মের মত সব আশাই চলে গেল। আমার নিজের যে পুত্র—সত্য বলছি, সেও আমার কাছে তোমায় চেয়ে প্রিয় নয়। যদি এই গুরু তোমাকে কিছু না দেন—অন্য গুরুর সন্ধান করতে হবে। দক্ষিণা বা অন্যান্য যা কিছু প্রয়োজন হবে, সে ব্যবস্থার জন্য আমি, তোমার মা রয়েছি। তুমি নিশ্চিন্ত হয়ে নিদ্রা যাও।'

কাঁদতে কাঁদতে শ্রান্ত দেহে সন্ধ্যার পরে মিলা ঘুমিয়ে পড়লেন।

সুষুপ্ত শিষ্যের শয়ন শিয়রে দামেমা একদৃষ্টে, অন্ধকার রাত্রির পানে, বহুদূরে নক্ষত্রলোকের পানে, দিগন্তবিস্তৃত কৈলাশশৃঙ্গের পানে তাকিয়ে রইলেন। প্রহরের পর প্রহর কেটে গেল : বহুজন-মুখরিত কর্মব্যস্ত সংসারের চাকা কর্ণধারবিহীন অবস্থাতেই নিঃশব্দে ঘুরে চললো। পরিচারিকারা বহুবার তাঁকে আহ্বান করতে এসে দ্বারপ্রান্ত হতে লঘুপদে ফিরে চলে গেল। মহর্ষি কি আহার করলেন, কখন আহার করলেন, কখন শয্যাগ্রহণ করলেন, দামেমা আজ আর সেসব কিছুই দেখলেন না। পাছে মিলা কোন ফাঁকে ঘুম ভেঙে উঠে নিদারুণ মনস্তাপে আত্মঘাতি হয় এই ভয়ে স্নেহশঙ্কাতুরা মাতা সারারাত্রি জেগে বসে রইলেন।

সকালেই এল মহর্ষি'র আহ্বান। মিলা ভয়ে ভয়ে সামনে গিয়ে হাজির হলেন। গুরুর মুখ দেখে তাঁর মনের ভাব অনুমান করার উপায় ছিল না। গুরু বললেন, 'কেমন যাদুকর, গুরুর প্রতি আর আস্থা আছে, না বিশ্বাসের মূল শিথিল হয়ে তার স্থানে গুরুর প্রতি বিদ্বেষ জন্মেছে ?' কাঁদতে কাঁদতে মিলা বললেন, 'বিশ্বাস আমার অটুট আছে। স্বকৃত অপরাধের বোঝাই যে আমার অন্তরায় তা আমি জানি : সেই আগুনেই আমি দগ্ধ হয়ে যাচ্ছি।' বলতে বলতেই প্রবল বাষ্পোচ্ছ্বাসে তাঁর কণ্ঠ রুদ্ধ হয়ে গেল। তাঁর এই ক্রন্দনে বিচলিত বা বিরক্ত হয়ে গুরু বললেন, 'এতই যদি বোঝো, তবে আমার সামনে এমন ক'রে কেঁদে আমাকে দোষারোপ করার অর্থ কি ? কাঁদতে হয় বাইরে গিয়ে যত খুশি কাঁদো।'

গুরুর সামনে থেকে সরে গিয়ে মিলা আকাশ-পাতাল কত কি চিন্তা করলেন। আদি-অন্ত-হীন অনর্থক সে চিন্তার ভাষা নেই। তাঁর পায়ের তলায় যে মাটি ছিল তা সরে গেছে। জীবনের সামগ্রিক রূপটিই গেছে বদলে। দক্ষিণার টাকা নইলে দীক্ষা সুদূরপরাহত। কিন্তু কোথায় পাবেন তিনি সে অর্থ? কেমন ক'রে, কোথায় গিয়ে

অর্জন করবেন সেই পরম পথের অমূল্য পাথেয় ? দেহপাত ক'রেও যদি সে ধন আয়ত্ব করা যেতো তাতেও মিলার আপত্তি নেই। কিন্তু কে দেবে সেই পথের সন্ধান ? মায়ের কাছে ফিরে যাবার উপায় নেই, কারণ সেখানে ঘরে ঘরে তাঁর শত্রু। কোন্ মুখে কার কাছে গিয়ে তিনি দাঁড়াবেন ? ভৃত্যরূপেই বা কে তাঁকে বিশ্বাস ক'রে গৃহে স্থান দেবে। এত বড় বিশাল বিশ্বে কে তাঁকে আশ্রয় দেবে ? আশাহত হয়ে এখানে থাকা মানে স্নেহময়ী গুরুমাকে বিপর্যস্ত করা। এ যাবৎ মিলার জন্য তাঁকে কম পীড়ন সহ্য করতে হয় নি : এর উপরেও তাঁকে নিজের অপরাধের জালে জড়িয়ে অধিকতর বিপন্ন করলে কি আর ধর্মে সইবে ? অতএব এভাবে নিশ্চেষ্ট হয়ে থাকা চলে না : গুরুগৃহে অবস্থান করাও চলে না। মা যেতে দেবেন না তা জানা কথা। অতএব, কিছু না বলে নিঃশব্দে চলে যাওয়াই ভাল। তারপরে পাওয়া না পাওয়া, বাঁচা মরা সব ভবিষ্যতের হাতে : সম্মুখে রইলো অনন্ত পথ—সুদূর বিসর্পী সীমাহীন, পাকে পাকে জড়ানো বন্ধুর পথ, আর সেই পথের কোন অজ্ঞাত সীমান্তে মিলার বিধিনির্দিষ্ট পরিণতি। একটি পাথর গড়িয়ে পড়ে পর্বতের চূড়া থেকে ; গড়াতে গড়াতে সবার অলক্ষ্যে সে পড়ে এক পার্বত্য স্রোতস্বিনীর গতিপথে। তারপরে সে কোথায় গিয়ে স্থান পায়, কিংবা স্রোতের সংঘর্ষে, গতিবেগের সংঘাতে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে হারাতে হারাতে নিশ্চিহ্ন যায়—পরবর্তী কাল সে সংবাদ আর রাখে না। এমন কোন অকল্পনীয় পরিণতি যদি তাঁরও ঘটে, তাতেই বা আপত্তি করবার কি আছে ? নিজেকে নিজের শিরে বওয়ার শেষ হোক : চাওয়া পাওয়ার দ্বন্দ্বে ক্ষতবিক্ষত হওয়ার পরিসমাপ্তি হোক : মিথ্যা আশা ও ততোধিক মিথ্যা সর্তে নিজেকে ভোলানোর এই অসঙ্গত প্রবৃত্তির ক্ষয় হোক।

নিজের সম্বল বই ক'খানি নিয়ে রিক্ত হস্তে মিলা গুরুগৃহ ত্যাগ করলেন। উঁচু নীচু পথ দিয়ে তিন-চার ক্রোশ পথ অতিক্রম করার

পরে তাঁর মনে হ'ল—আর যাই হোক, গুরুমায়ের কাছ থেকে বিদায় না নিয়ে এভাবে পালানো তাঁর ঠিক হয় নি। নিজেকে অত্যন্ত অকৃতজ্ঞ বলে তাঁর মনে হতে লাগলো। ক্ষুধা-তৃষ্ণা-অনুতাপে অবসন্ন হয়ে তিনি এক গৃহস্থের দ্বারে ভিক্ষাপ্রার্থী হয়ে দাঁড়ালেন। সামান্য যা জুটলো তাই দিয়েই কোনমতে ক্ষুন্নিবৃত্তি হ'ল। খাদ্য মুখে তুলতে তুলতে তাঁর মনে হতে লাগলো গুরুমার প্রতিদিনের অজস্র স্নেহের দানের কথা ঃ যে সুগভীব প্রীতিকে তিনি অবজ্ঞা ক'রে চলে এসেছেন, তার কথা। জামার হাতায় উদ্গত অশ্রু মার্জনা ক'রে তিনি আহার্য ফেলে উঠে পড়লেন। তাঁর এই ভাবান্তর লক্ষ্য ক'রে গৃহস্বামী প্রবীন ব্যক্তিটি কি যেন একটা নিজের মনে বুঝে নিয়ে বললেন, 'তুমি কর্মক্ষম যুবক হয়ে ভিক্ষাবৃত্তি গ্রহণ করেছো কেন? তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে লেখাপড়া জানো। যদি তাই হয়, আমার কাছেই থাকো। প্রত্যহ শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ ক'রে আমাকে শোনাবে এবং তার বিনিময়ে আমি তোমাকে উপযুক্ত পারিশ্রমিক দেবো।'

মিলা সেইখানেই রয়ে গেলেন। তাঁর কাজ হল প্রজ্ঞাপারমিতা পাঠ ক'রে শোনানো। কয়েকদিন এই ভাবেই কাটলো। কিন্তু মনের মধ্যে বসে অন্তর্যামী নিজের খেলাই খেলতে লাগলেন। সেই খেলাটিই লীলায়িত হয়ে উঠতে লাগলো প্রত্যহের পঠিত শাস্ত্রগ্রন্থের ছত্রে ছত্রে। ত্যক্তঙ্গ নামে এক তপস্বীর বিবরণে পড়লেন যে তিনি দক্ষিণার মূল্য সংগ্রহের জন্য নিজ দেহের মাংস খণ্ড খণ্ড ক'রে বিক্রয় করেছিলেন। এই প্রসঙ্গ পড়তে পড়তে তাঁর উত্তেজিত মন নিজের সমস্যায় ব্যাকুল হয়ে উঠলো। সেদিনকার পাঠ কোনমতে সমাপ্ত ক'রে তিনি উঠে পড়লেন। তাঁর মন এই অবস্থায় তাঁর এই দুর্বলতার সুযোগ নিয়ে চোখ রাঙিয়ে বলতে লাগলো, 'এর পাশে নিজেকে একবার কল্পনা ক'রে দেখো। পরম বস্তুকে পেতে হলে এমনি ক'রেই পেতে হয়। গুরুর আদেশে সামান্য কয়েকটা কাদা-মাটির ঘর গড়তেই তোমার

ধারণা হয়েছিল বুঝি বড় তপস্যাই করেছো। কথায় কথায় গুরুর কাছে গিয়ে দাবি করেছো তার বিনিময়ে অমূল্য ধন। গুরুমার অজস্র দানেও তোমার মন ভরে নি। কাঙালের ক্ষুধা মেটাবে কে? ওরে মূঢ়, ওরে দীনহীন, ওরে পাপী—তোর নিজের অপরাধের কথা তুই মূঢ় বলেই এমন ক'রে ভুলে যাস্। কতলোকের কত সর্বনাশ তুই অম্লান-বদনে করেছিস তার হিসাব তুই ভুলে যাস বলেই কি সেসব মিথ্যা হয়ে যাবে? যাদের হত্যা করেছিস তাদের প্রাণকে তো কই ফিরিয়ে দিতে পারিস নি, যাদের সর্বস্বান্ত করেছিস তাদের ক্ষুধা তোকে সইতে হবে না? যে আগুন তুই জ্বালিয়েছিস তার কতটুকু আঁচ তোর গায়ে লেগেছে? গুরুর একটু আঘাত বা স্নেহের তাড়না তোর অঙ্গে এমন ক'রেই কি বেজেছে যে তাতেই চক্ষে অন্ধকার দেখছিস? আর এই যে একটা দৃষ্টান্ত তুই পড়লি। ত্যক্তঙ্গ নিজের দেহের মাংস নিজের হাতে কেটে বিক্রয় করলেন যে মহাবস্তুর মূল্য দিতে, তুই পামর কি তা পারবি? নিজের অহঙ্কারে নিজে মত্ত হয়ে আছিস বলেই যেটুকু লাগে বড় কঠিন হয়েই লাগে; যেটুকু করেছিস, তাই সহস্রগুণ বড় হয়ে তোকে অহঙ্কারী ক'রে তুলেছে। তুই কিসের যোগ্য সে কথা ভুলে যাস বলেই সর্বগ্রাসী স্বার্থের দুঃসাহসে তুই বামন হয়ে চাঁদে হাত বাড়াস। এই দৃষ্টান্ত থেকে নিজেকে চিনতে শেখ। ওরে হতভাগ্য, ফিরে যাঃ এ পথ তোর মত অপদার্থের জন্য নয়। দেহমনবাক্যে গুরুকে স্বীকার করেছিলিঃ এই বুঝি তার যোগ্য পরিণতি? গুরু না হয় কিছুই না দিলেন—কিন্তু গুরুমা,—তাঁর কাছেও কি তুই কিছুই পাস নি? অন্যায় দিয়ে একবার যাত্রা শুরু করলি; তাতেও হ'ল না, এবার অকৃতজ্ঞতা দিয়ে আর এক অধ্যায় আরম্ভ করতে চলেছিস। ওরে মূর্খ, ওরে আত্মম্ভরী,—যে পথে নিজেকে ভুলতে হয়, নিজেকে বিসর্জন দিতে হয়, সেপথ কি এইভাবেই চলতে হয়? তুই যে কল্যাণের পথ চাস, সে আরামের পথঃ ওরে ভণ্ড তপস্বী, এ পথ তোর জন্য নয়, নয়, নয়।'

মিলার গুরুগৃহ ত্যাগের পরদিন প্রত্যূষে গুরুমা তাঁর ঘরে এসে দেখলেন শয্যা শূন্য ; যেখানে যা ছিল তার সমস্তই আছে, কেবল যেখানে মিলার নিজস্ব পুঁথিকয়খানি ছিল—সেই স্থানটিই খালি পড়ে আছে। মাতৃহৃদয়ের অপরিমিত স্নেহের পাশাপাশি এ আশঙ্কা অনেক দিন থেকেই তাঁর অন্তরে ধূমায়িত হচ্ছিল, কাজেই মিলা যে নিজের ব্যর্থতার বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে সরে গেছে, এ কথা বুঝতে তাঁর বিলম্ব হ'ল না। মিলার এ যাওয়া যে আনন্দের যাত্রা নয়, সে কথা তিনি জানতেন বলেই এ আঘাত তিনি নিঃশব্দে মেনে নিলেন। মিলার জন্য আনীত প্রাতরাশ তিনি জানালা দিয়ে ছুঁড়ে ফেলে দিলেন এবং বস্ত্রাঞ্চলে দুই চক্ষু ভাল ক'রে মার্জনা ক'রে স্বামীর কক্ষে গিয়ে উপস্থিত হলেন। মহর্ষি নিবিষ্ট মনে কি একখানি পুঁথির পাতা ওলটাচ্ছিলেন। অসময়ে তাঁর ঘরে দামেমাকে প্রবেশ করতে দেখে মুখ তুলে চাইলেন। দামেমা তাঁর মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, 'সুসংবাদ এনেছি। আপনার পরম শত্রু বিদায় হয়েছে ; এবার তো আপনার খুশি হবার কথা।' মার্পা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কার কথা বলেছো ?' ম্লান হাস্যে দামেমা বললেন, 'কার কথা, সে তো আপনার অজানা নেই। মিলার মত এত বড় শত্রু আর আপনার কে ছিল ?'

দামেমা বিস্মিত হয়ে দেখলেন মার্পার দু'চক্ষু সজল হয়ে উঠেছে। দামেমার অনুযোগের কোন উত্তর না দিয়ে তিনি আত্মগতভাবে বললেন, 'এমন হতেই পারে না। হে অন্তরীক্ষচারী দৈবশক্তি, হে দেবতারা, আমার অধিকারী শিষ্যকে তোমরা ফিরিয়ে এনে দাও। আমাকে ছেড়ে সে কোথা যাবে ?' এই কথা বলেই, গায়ের কাপড়ে নিজের মাথা ঢেকে নিশ্চল, নিস্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন। প্রহেলিকার কোন রকম সমাধান না পেয়ে দামেমা চিন্তিত ভাবে সে কক্ষ ত্যাগ ক'রে কর্মান্তরে চলে গেলেন। স্বামীর মনের ভাব পূর্বেও যেমন তিনি বুঝতে পারেন নি, এখনও তেমনি বুঝতে পারলেন না। মিলা যতদিন ছিল,

তার লাঞ্ছনার শেষ ছিল না। দিনের পর দিন এই অকারণ, অহেতুক নিগ্রহ তাঁর মাতৃহৃদয়কে ব্যথিত করেছে। মিলার যে কোথায় ত্রুটি, তা তিনি বহু প্রয়াসেও কোনদিন বুঝতে পারেন নি, বরং প্রতি মুহূর্তে তাঁর মনে হয়েছে গুরু তাঁকে মিথ্যা স্তোকবাক্যে প্রতারিত করছেন: যেন গুরুর মধ্যে কোথাও একটা তীব্র বৈরীভাব প্রচ্ছন্ন রয়েছে। আবার আজ যখন সেই বহুদিনের প্রবঞ্চিত নিজের দুঃখময় জীবনের বিড়ম্বনার বোঝা নিয়ে নিঃশব্দে বিদায় হ'ল, তখনই বা গুরুর এই আকস্মিক ভাবান্তরের হেতু কি? সারাদিনের মধ্যে নানা কর্মের ফাঁকে ফাঁকে দামেমা স্বামীর কক্ষে এসে দ্বারের আড়াল থেকে উঁকি মেরে দেখে গেলেন। প্রত্যেকবারই দেখলেন মহর্ষি মস্তক আবৃত ক'রে স্থাণুর মত বসে আছেন। দামেমার মনে হ'ল, যেন তাঁর হিসাবে কোথাও না কোথাও মস্ত একটা ভুল হয়ে গেছে। অথচ কোথায় যে সে ভুল তাও সহজ বুদ্ধিতে বোধগম্য নয়। অধিকারী শিষ্য কাকে বলে? মিলা যদি অধিকারীই হয়, তবে পদে পদে তার এত নিগ্রহই বা কেন? অনর্থক বারংবার বাড়ি গড়ানো ভাঙানোরই বা অর্থ কি? পরের ছেলে বলে তাকে এমন অমানুষিক ভাবে পীড়ন করারই বা কি অর্থ হয়! মজুরি করবার জন্য যে আসেনি, তাকে দিয়ে কি না-করানো হয়েছে? ধর্ম-শিক্ষার এ কোন্‌দেশী পদ্ধতি? পিঠজোড়া ক্ষত দেখেও এতটুকু করুণা এলো না—বললেন, 'কাজ ছাড়া চলবে না।' অথচ কাজ মানে তো সেই অর্থহীন গড়া আর নিরর্থক ভাঙা। আবার এখন দেখছি আর এক ভাব; মনে হচ্ছে যেন মিলার বিরহে একেবারে ভেঙে পড়েছেন। চোখে যা দেখেছি তাও কোনদিন বুঝতে পারিনি, এখন যা দেখছি তাও আমার বুদ্ধির অতীত। কিন্তু আমন্ত্রণে বা বিসর্জনে যিনি চিরদিনই বীতরাগ, তাঁর চোখে যে আজ মিলার শোকে অশ্রু ঝরেছে, এ তো আর মিথ্যা নয়। মিলাকে যে উনি অধিকারী পুরুষ বলে উল্লেখ করলেন, সেও যে ওঁর অন্তরের কথা, তাতে ভুল নেই। অতএব আমার সামান্য

বুদ্ধিতে কি মেলে আর কি মেলে না তা নিয়ে মিছে কেন উদ্বিগ্ন হই ? মিলা ফিরে আসবে, মিলা তার প্রার্থিত বস্তু লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হবে : আলোছায়া—অনিশ্চয়তার পরপারে তার তপস্যার নিশ্চিন্ত ভূমি সে লাভ করবে।

কয়েকদিনের মধ্যেই দামেমার এই প্রত্যাশা পূর্ণ হ'ল : মিলা ফিরে এলেন। দামেমা পুলকিত হয়ে বললেন, 'আমি জানতাম তোমাকে ফিরে আসতেই হবে, কারণ তোমার গুরুর কথায় আমি বুঝেছি যে তোমার সুসময় সমাগত। তিনি নিজের মুখে স্বীকার করেছেন যে তুমি তাঁর অধিকারী শিষ্য।'

এমন কথা স্বকর্ণে শুনেও মিলার মনের দ্বিধা ঘুচলো না। গুরুর এতদিনের প্রত্যেকটি ব্যবহারের সঙ্গে মিলিয়ে তিনি এই কথার সঙ্গতি খুঁজে পেলেন না, কারণ তাঁর ধারণা হ'ল এর মধ্যে কোথাও না কোথাও একটা গলদ আছে। গুরুর কৃপায় ক্ষুধার অন্ন তাঁর জুটেছে এ কথা তিনি অস্বীকার করতে পারেন না ; কিন্তু তার অতিরিক্ত যে কিছুই আর পাননি, সে কথা সর্বজ্ঞ পুরুষ ভাল ক'রেই জানেন। সমস্ত জেনেও তিনি এতদিন পর্যন্ত আসল বিষয়ে একটি কথাও বলেন নি। ত্যক্তঙ্গের দৃষ্টান্তে তাঁর মনে যে ধিক্কার জেগেছিল, তারই প্রেরণায় তাঁর মনের চিন্তাধারা যেন নৈরাশ্যের মোড় ফিরেই অকস্মাৎ স্পর্ধিত হয়ে উঠলো। তাঁর মনে হ'ল, পরম প্রাপ্তির চরম মূল্য ত্যক্তঙ্গের মত ক'রে তিনিই বা দিতে পারবেন না কেন ? ত্যক্তঙ্গের দৃষ্টান্ত আর এমন একটা কি অসম্ভব দৃষ্টান্ত ! নিষ্ফল দেহের এই অতিরিক্ত মেদমাংসে তাঁরই বা কি এমন প্রয়োজন আছে যে তাকে তিনি সন্তর্পণে বাঁচিয়ে রাখতে চাইবেন ? এই অস্পৃশ্য, অপবিত্র দেহটার যে কোন অংশ গুরু যদি দীক্ষার দক্ষিণাস্বরূপ গ্রহণ করেন, তিনি কি তা সানন্দে দিতে পারেন না ? আমি তো নিজের সমগ্র সত্ত্বাটিকেই দু-হাতে ভরে অঞ্জলি দিতে চেয়েছি, এখনো সেই পূর্ণাহুতির নিবেদন ঊর্ধ্বের পানে উৎসর্গ

করাই আছে। কিন্তু কই, গুরু তো সেদিকে দৃষ্টিপাত করলেন না; তাই অনাদরে অবহেলায় নৈবেদ্যের ফুলগুলি আজ বিবর্ণ হয়ে গেছে। শীঘ্রই হয়তো এমন একটা দিন আসবে যেদিন এই মাটির দান মাটির হাতে ফিরিয়ে দিয়ে রিক্ত হাতে ফিরে যেতে হবে।

গুরুমার মুখে মিলার প্রত্যাবর্ত্তনের সংবাদ পেয়ে বিরসবদনে গুরু বললেন, 'মিলা ফিরে এসেছে—সে কি মনে করো আমাদের মুখ চেয়ে? যে আসে, সে নিজের স্বার্থেই আসে। তথাপি সে যদি আমাকে প্রণাম করতে চায়, তাতে আমার কোন বাধণ নেই; স্বচ্ছন্দে সে আসতে পারে।' মিলা আসতে, তাঁকে বললেন, 'ক্ষমা চাইবার প্রয়োজন নেই। সত্যকে যদি চাও তাহলে উদ্দেশ্যকে এভাবে দ্বিধাবিভক্ত হতে দিও না। বেশ ক'রে নিজের মন বিচার ক'রে দেখো; যদি এই ত্যাগের মূল্যে সাফল্য অর্জন করতে প্রবৃত্তি হয়, তাহলে এখনই বাকি তিনতলা সমাপ্ত করতে লেগে যাও। আরব্ধ কর্ম সমাপ্ত হলেই তোমার প্রার্থিত বস্তু পাবে—তার আগে নয়। আর, যদি আমার কথায় আস্থা রাখতে না পারো, তাহলে আর এই মিথ্যা বিড়ম্বনায় কাজ নেই। এ ভাবে অন্ন ধ্বংস না ক'রে তুমি স্বেচ্ছায় নিজের পথ বেছে নিতে পারো।'

মিলার মনের ব্যথার স্থানটি বহুদিন থেকে অসাড় হয়ে ছিল বলেই এই বিরস বচনে তিনি ব্যথা পেলেন না। তিনি নতুন ক'রে আর একবার বুঝে নিলেন যে গুরুর কাছে তাঁর আর কিছু প্রাপ্তির আশা নেই। দেওয়া না দেওয়ার অধিকার যেখানে দাতার হাতে, সেখানে দীনহীন কাঙালের কথা শুনবে কে? বহুদিনের অব্যক্ত বেদনার সঙ্গে যে এতখানি সুগভীর ক্লান্তি ওতপ্রোত হয়েছিল—সে কথা এতদিন পর্যন্ত এমন ক'রে তিনি কোনদিনই টের পান নি। গুরুমায়ের টানে পথের মাঝখান থেকে ফিরে এসে অকস্মাৎ তাঁর মনে হ'ল আর এক চিরদুঃখিনী মায়ের কথা। মনে হ'ল—এই নিষ্ফল অনুসন্ধানে আর কাজ নেই, মায়ের কাছেই ফিরে যাই।

শ্রান্ত দেহে, শুষ্ক মুখে তিনি গুরুমায়ের কাছে গিয়ে দাঁড়ালেন। বললেন, 'বৃথা চেষ্টা। গুরু আমার প্রতি অনুকূল নন। আপনার কথায়, কিছুমাত্র আশা না নিয়েই—আমি গুরুর কাছে গিয়েছিলাম। বুঝলাম যে কিছুতেই কিছু হবার নয়। আরব্ধ গৃহ সম্পূর্ণ করলেই বা কি হবে? এখনকার এই প্রতিশ্রুতি তখন আর গুরুদেবের মনে থাকবে না: সেই পুরানো কথাটাই আবার নতুন ক'রে শুনবো। তাই ভাবছি, আপনার অনুমতি পেলে আমি বাড়ি ফিরে যাই। কত বৎসর হয়ে গেল মায়ের কোন সংবাদই আমি রাখি না। আমার ছোট বোন পেতা, আমার বাগ্‌দত্তা বধূ জেসে—তাদের যে কি হ'ল, তাও জানি না। যে আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলাম সে সবই আকাশ-কুসুমে পরিণত হয়েছে। আমার দুর্ভাগ্যের ইতিহাস আপনার মত ক'রে আর কে জানে? তাই আপনার চরণে আমার নিবেদন, আপনি আমাকে বাড়ি ফিরে যাবার অনুমতি দিন।'

দামেমা কোন কথারই প্রতিবাদ করলেন না, কারণ নিজের অন্তরে তিনি মিলার এই হতাশার প্রতিধ্বনি শুনতে পেলেন। তিনি বললেন, 'তোমার কথা সবই ঠিক। আমি তোমাকে প্রতিশ্রুতি দিয়েছিলাম যে প্রয়োজন হ'লে তোমাকে অন্য গুরু জুটিয়ে দেবো। নোংডুন তোমার গুরুরই একজন প্রাপ্তকাম শিষ্য: তার কাছে দীক্ষা পেলে এক হিসাবে তোমার গুরুর শিক্ষাই পাওয়া হবে, কারণ তোমার গুরুনির্দিষ্ট পন্থাই তাঁর পন্থা। তিনি যাতে তোমাকে সাদরে দীক্ষা দেন, সে ব্যবস্থার ভার আমি নিলাম। তুমি নিশ্চিন্ত মনে যেমন কাজ করছো তেমনি ক'রে যাও: ইতিমধ্যে কয়েকদিনের মধ্যেই আমি আমার করণীয় সমাপ্ত করবো।'

গুরুমার কথায় আশ্বস্ত হয়ে মিলারেপা আবার আগের মত গৃহ-নির্মাণের কাজে নিযুক্ত হলেন। কিন্তু এবারকার কর্মের ধারাটি যেন সাফল্যের অদূর সম্ভাবনায় আর এক রূপ ধারন করলো। তাঁর

আজীবনের স্বপ্ন যে সফল হতে চলেছে, এই আনন্দের ছোঁয়া লাগলো তাঁর প্রতি পদক্ষেপে। এবার আর মরীচিকা নয়—সত্যিকারের তৃষ্ণার জল ; অনিশ্চিত ভবিষ্যৎ নয়, সুনিশ্চিত পরিণতি তাঁর সামনে।

মার্পার গুরু মহর্ষি নারোপার জীবনকালে প্রতি মাসের দশম দিবসে বিশেষ একটি ধর্মানুষ্ঠান করতেন। গুরু নির্দিষ্ট এই দিনটির উৎসব মার্পার আবাসেও পূর্ববৎ আড়ম্বরে অনুষ্ঠিত হত। দামেমা এই দিনটিরই অপেক্ষায় ছিলেন। এই উৎসবের জন্য তিনি পূর্বাহ্নে প্রচুর পরিমাণে ছাং, তিনটি বিশাল কলসে ভরে তৈরি ক'রে রেখে দিলেন। তাঁর ব্যবস্থায় মহর্ষির পানপাত্র যাতে কোন সময়েই শূন্য না থাকে, সেদিকে এমন ক'রেই দৃষ্টি রাখা হ'ল যে অতিরিক্ত ছাং-পানের ফলে মহর্ষি নিদ্রাভিভূত হয়ে পড়লেন। এই সুযোগে দামেমা মহর্ষির কক্ষের গুপ্তস্থান থেকে মহর্ষি নারোপার স্মৃতিপূত যপের রত্নমালা ও সযত্ন-রক্ষিত পবিত্র অর্ঘ ইত্যাদি হস্তগত ক'রে একখানি লেফাপায় পুরলেন, এবং তৎসঙ্গে মহর্ষি মার্পার নামাঙ্কিত অঙ্গুরীয়কের ছাপ দিয়ে একখানি পত্রে শিষ্য নোংডুনকে মহর্ষির আদেশ-জ্ঞাপক নির্দেশ দিলেন যেন পত্রপাঠ মিলারেপাকে তিনি আনুষ্ঠানিকভাবে দীক্ষা প্রদান করেন। এইভাবে তাঁর সঙ্কল্পিত ব্যবস্থা সম্পূর্ণ ক'রে দামেমা এই পত্রাধারখানি মূল্যবান বস্ত্রখণ্ডে আবৃত ক'রে মিলার হাতে তুলে দিলেন ; বললেন, 'তোমার এবারকার যাত্রা জয়যুক্ত হোক ; মহর্ষির নামাঙ্কিত এই আদেশপত্র কখনোই ব্যর্থ হবে না ; আমার আশীর্বাদে তোমার সাধনার পথ সাফল্যমণ্ডিত হোক।'

সেইদিনই মিলা নিঃশব্দে গুরুগৃহ ত্যাগ ক'রে আবার সেই নিরুদ্দেশ যাত্রায় বেরিয়ে পড়লেন। দীর্ঘ পথ পরিভ্রমণ ক'রে তাঁকে মধ্য তিব্বতে নোংডুনের ধর্মসংঘে উপনীত হতে হবে ; কিন্তু সে জন্য দুশ্চিন্তার কিছু নেই, কারণ গুরুমা তাঁর পাথেয় প্রচুর ভাবেই তাঁর সঙ্গে দিয়ে দিয়েছিলেন। তাঁর যাত্রার দু'দিন পরে মহর্ষি মিলার খোঁজ করলেন।

কিন্তু মিলার খবর কেউ বলতে পারলো না। দামেমা বললেন, 'কোথায় সে তা কেমন ক'রে বলবো ? কোথায় কোন পথে বর্তমানে সে আছে সে সংবাদ আমি কি ক'রে জানবো। আমি এই পর্যন্ত জানি যে সে একেবারে ভেঙে পড়েছিল : আমার কাছে দুঃখ ক'রে বলেছিল, 'গুরুদেব আমাকে কিছু দিতেই রাজী নন—এতগুলি বছর ধরে কেবল বাড়ি-গড়া, বাড়ি-ভাঙার কাজেই আমার কাটলো : কবে মৃত্যুর ডাক আসবে কে জানে! সেইজন্য আমি ভাবছি নিরুদ্দেশের পথে বেরিয়ে পড়ে অন্য কোন গুরুর সন্ধান করবো।' এ সব কথায় আর কি বলতে পারি, কারণ আমি তো জানি তার খেদ অযৌক্তিক নয়। একবার ভাবলাম—সব কথা আর একবার আপনাকে এসে বলি; কিন্তু শেষে ভেবে দেখলাম—তাতে আর কি হবে ? মাঝখান থেকে আমার জন্য আবার সেই অভাগা বেচারি আপনার কাছ থেকে আরও খানিকটা প্রহার বা ভর্ৎসনা লাভ করবে—এই মাত্র। অতএব চুপ ক'রেই রইলাম। তবে হ্যাঁ, তাকে নিবৃত্ত করবার চেষ্টায় আমি ত্রুটি করিনি; কিন্তু যে যাবেই, তাকে ধরে রাখবে কে ? আমার কথা সে অনেকবার রেখেছে; কিন্তু সব জিনিশেরই তো একটা সীমা আছে—মিলাও তো রক্তমাংসের মানুষই!'

মহর্ষির ভ্রূকুটি-কুটিল মুখমণ্ডলে ঝড়ের পূর্বাভাস আশঙ্কা ক'রে দামেমা সত্বর সে স্থান ত্যাগ করাই সমীচীন মনে করলেন। মার্পা জিজ্ঞাসা করলেন, 'কবে সে গেছে ?' অম্লানবদনে দামেমা বললেন, 'গতকাল'। মহর্ষি বললেন, 'তবে আর কতদূরই বা সে গেছে!' এর পরেই সব চুপ। দামেমা এই নিস্তব্ধতার সুযোগ নিয়ে তাড়াতাড়ি সরে পড়লেন।

ওদিকে বহু পথ অতিক্রম ক'রে মিলারেপা মধ্য তিব্বতের রিওকুংডিং প্রদেশে নোংডুনের ধর্মসংঘে এসে উপনীত হলেন। সুবৃহৎ কক্ষের একপ্রান্তে ধর্মমণ্ডলির কেন্দ্রে উপবেশন ক'রে নোংডুন তখন

উদাত্ত স্বরে শাস্ত্রবাক্য ব্যাখ্যা ক'রে শোনাচ্ছিলেন : আমিই সত্যের উদ্‌গাতা, আমিই সত্য ; আমিই শ্রোতা, আমিই বিশ্বের গুরু ; আবার আমিই শিষ্য, জাগতিক অস্তিত্বের সর্ব-স্তর অতিক্রান্ত তথাগত আমি : আমিই অনন্ত শান্তির অধিকারী !

এরই মাঝখানে ধর্মমণ্ডলির বাইরে থেকে মিলারেপা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত ক'রে নোংড়ুনকে অভিবাদন করলেন। পাঠ থামিয়ে, শিরোবাস উন্মোচন ক'রে নোংড়ুন প্রত্যাভিবাদন করলেন। মিলার বেশভূষা দেখেই তাঁর ধারণা হ'ল যে মিলা মহর্ষি মার্পার কাছ থেকে আসছেন। তিনি তৎক্ষণাৎ একজন ভক্তকে মিলারেপার পরিচয় নেবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে সেইখানেই বসে বললেন, 'এই লোকটি ক্ষুদ্র অধিকারী নয় ; ক্ষুদ্র ভাগ্যে কখনোই সে এই সর্বোচ্চ তত্ত্বের ব্যাখ্যাকালে এসে উপস্থিত হতে পারতো না। তোমরা দেখে নিও একদিন না একদিন এই আগন্তুক সমগ্র ধর্মতত্ত্বের অধিকার লাভ করবে।'

গুরু-নামাঙ্কিত পত্র ও মহাগুরু নারোপার স্মৃতি-পূত মাঙ্গলিকের বাহক মিলার অভ্যর্থনায় রীতিমত রাজ-সমারোহ শুরু হয়ে গেল। মঠবাসী সাধুরা ও নোংড়ুনের শিষ্যেরা উৎসবের পতাকা, রাজছত্র, বহুবিধ সাজসরঞ্জাম ইত্যাদি সংগ্রহ ক'রে আনলেন। নিস্তব্ধ পার্বত্য প্রদেশ বিচিত্র বাদ্যভাণ্ডের ঐকতানে মুখরিত হয়ে উঠলো। এই গগনপ্লাবী জয়ধ্বনি ও স্বস্তিবাচনের কেন্দ্রস্থলে দাঁড়িয়ে, সহস্র জনের শ্রদ্ধাবিগলিত দৃষ্টির সমক্ষে উপস্থাপিত হয়ে মিলা যেমন একদিকে লজ্জায় সঙ্কোচে ম্রিয়মান হলেন, তেমনি আবার এই ভেবে আনন্দিত হলেন যে তাঁর বহুদিনের স্বপ্ন এবার সার্থক হতে চলেছে।

ভগবান নারোপার যপমালা মস্তকে ধারণ ক'রে নোংড়ুন বিহ্বল হয়ে কাঁদতে লাগলেন। তারপরে যথারীতি অভিষেকাদি সম্পন্ন ক'রে সেই সব পবিত্র বস্তুকে পূজাবেদীর উচ্চতম স্থানে সংরক্ষিত ক'রে,

নোংড়ুন গুরু-চিহ্নাঙ্কিত পত্রখানি পড়লেন, তাতে লেখা ছিল : 'সম্প্রতি আমি কিছুদিনের জন্য নিভৃতবাসের সঙ্কল্প করেছি। কিন্তু আমার এই যাত্ন-কর আধ্যাত্মিক উন্নতির জন্য অতিমাত্র চঞ্চল হ'য়ে ওঠায়, তাকে তোমার কাছে শিক্ষাদীক্ষার জন্য পাঠিয়ে দিলাম। আমার আদেশ তুমি তাকে দীক্ষা দিও ও আনুষঙ্গিক সাধনাও দিও। এই সঙ্গে, আমার এই সম্মতির অভিজ্ঞান-স্বরূপ নারোপার যপমালা ও অনান্য পরিত্র অর্ঘও পাঠালাম।'

গুরুর আদেশলিপি পাঠ ক'রে নোংড়ুন বললেন, 'গুরুর আদেশ মাথা পেতে নিলাম; শিক্ষা দীক্ষা সবই তুমি পাবে। তুমি যে পবিত্র বস্তু বহন ক'রে এনেছো তাতে আমার এই দীনালয় ধন্য হয়ে গেছে। কিন্তু, তোমার দীক্ষার পূর্বে আমার একটি সামান্য অনুরোধ তোমাকে পালন করতে হবে। বহু দূরবর্তী পার্বত্য অঞ্চল থেকে, আমার জন্য সাধ্যমত উপহার নিয়ে আমার ভক্ত ও শিষ্যরা আসে। পথের মাঝে ইয়েপো, ইয়েমো দোল ইত্যাদি অসভ্য জাতির বাসস্থান। সেই সব স্থানে আমার শিষ্যরা প্রায়ই এদের দ্বারা আক্রান্ত হয়। তোমাকে এর একটি প্রতিকার করতে হবে। তোমার শক্তি প্রয়োগ ক'রে করকাপাত, ইত্যাদির দ্বারা তাদের সমুচিত শিক্ষা দাও এই আমার একান্ত অনুরোধ।'

আবার সেই পূর্ব-ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি : আবার সেই মারণযজ্ঞের বিড়ম্বনা। দুষ্কৃতির পাকে পাকে, কাঁটায় কাঁটায় জীবন এমন ক'রেই জড়িয়ে গেছে যে একটা দিক ছাড়াতে গেলে আর একটা দিক আবদ্ধ হয়ে পড়ে; দোটানার আর যেন শেষ নেই। অথচ গুরুর প্রত্যক্ষ আদেশ অমান্য করাও যায় না। দ্বিধাকম্পিতচিত্তে মিলাকে সম্মত হতেই হ'ল। যে দুর্ভোগকে এড়াবার পথ নেই, তাকে স্বীকার না ক'রেই বা উপায় কি? কর্মরহস্য কিছুই না জেনে করে যে এক প্রথম শৈশবে নিজের হাতে কর্মের জাল বুনেছিলেন, আজ পর্যন্ত এই

জীবন-মধ্যাহ্নেও সেই দুর্ভেদ্য বিড়ম্বনা দুটি-পায়ে নিগড়ের মত জড়িয়ে রইলো। এক স্থান পরিত্যাগ ক'রে আর এক স্থানে গেলেই বা নিষ্কৃতি কোথায়? এক গুরুর আশ্রয় ছেড়ে আর এক গুরুর শরণ নিলেই বা কি হবে? নিজের দেহের ছায়াকে যেমন দেহ থেকে বিচ্ছিন্ন করা যায় না—কর্মও যদি তেমনি হয়, তবে আর মুক্তির আশা কোথায়? এড়াতে চাইলেই যে এড়ানো যায় না—সে সত্য নিজের জীবনেই বারংবার অবিসংবাদিত সত্যের রূপে সপ্রমাণিত হয়ে গেছে। তবে মানুষের করনীয় কি? একটি চাকার পিছনে আর একটি চাকা, তার পিছনে আর একটি: এর যেন সীমা-সংখ্যা কোথাও নেই। কোথায় এই নিষ্পেষণের শেষ? এই একটানা স্রোতের বাইরে গিয়ে মুহূর্তের জন্য স্থির হয়ে দাঁড়াবার স্থানটুকুও যদি পাওয়া যেত, তবে একবার নিজেকে নতুন ক'রে চেনবার হয়তো সুযোগ মিলতো। কিন্তু স্রোত যে সর্বগ্রাসী: তার বাইরে স্থান কোথায়?

একান্ত নিরুপায় হয়ে নির্জীবের মত দেহটাকে টেনে নিয়ে গিয়ে মিলা উপদ্রুত অঞ্চলে মারণচক্রের ক্রিয়ায় উদ্যোগী হলেন। ছদ্মবেশী পথিকের মত এক বৃদ্ধার কুটিরে সাময়িকভাবে আশ্রয় পেয়ে সেখান থেকেই বিভৎস যজ্ঞের অনুষ্ঠান করলেন। দেখতে দেখতে নির্মেঘ নভস্থল যেন প্রলয়ের কালো মেঘে সমাচ্ছন্ন হয়ে গেল; ঘন ঘন বিদ্যুদ্দীপ্তি ক্রুদ্ধ নাগিনীর বিষাক্ত ছোবলের মত আকাশের গায়ে অত্যাসন্ন বিপর্যয়ের অগ্নিজ্বালা সৃষ্টি করলো; অন্তরীক্ষ ভেদ ক'রে, সমস্ত আকাশখানাকে সবলে বিদীর্ণ ক'রে গর্জন ক'রে উঠলো এক প্রলয়ঙ্কর বজ্রধ্বনি; মনে হ'ল যেন এই একটি আঘাতেই সসাগরা ধরিত্রী এককালে চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে অণু-পরমাণুর সাথে মহাশূন্যে বিলীয়-মান হয়ে যাবে। পায়ের তলার মাটি কাঁপতে লাগলো। পর্বত-শিখরের চূড়া যেন অকিঞ্চিৎকর মাটির ঢেলার মত উৎক্ষিপ্ত হয়ে প্রচণ্ড শব্দে নিম্নের উপত্যকায় ভেঙে পড়লো। সঙ্গে সঙ্গে পশ্চিম দিগন্তের

পটভূমিকা সবেগে উত্তোলন ক'রে তীব্র বেগে ছুটে এলো এক উন্মাদ ঝঞ্ঝা, এবং পরক্ষণেই পর্বতে অরণ্যে শুরু হয়ে গেল এক সামুদ্রিক আলোড়ন। আনুষঙ্গিক উপদ্রবরূপে বৃহৎ শিলাখণ্ডের মত করকাপাত মহাশূন্যের অদৃশ্য উৎসপথে বৃষ্টিধারার মত বর্ষিত হতে লাগলো।

কুটির-সংলগ্ন অঙ্গনে দাঁড়িয়ে মিলা নিজের এই দানবীয় কৃতিত্ব স্তম্ভিত হয়ে দেখছিলেন। যুক্তি দিয়ে বোঝবার কিংবা বুদ্ধি দিয়ে বিচার করবার সামর্থ তাঁর ছিল না। কেবল ভাবছিলেন—এই মহা-শক্তির তাণ্ডবলীলা কার প্রয়োজনে? আমার মত কীটানুকীটের হাতে কি এই মহাপ্রলয়ের চাবিকাঠি? শিশু যেমন ক'রে বিস্ফারিত নেত্রে নিজের হাতে জ্বালানো অগ্নিকাণ্ডের লেলিহান শিখার পানে ভীতিবিহ্বল হয়ে চেয়ে থাকে, মিলাও ঠিক তেমনি ভাবে ভয়ে বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে ভাবছিলেন—এর মধ্যে আমার মত তুচ্ছ নিমিত্তের স্থান কোথায়? এ তো আমি কামনা করিনি, এর মধ্যে তো আমার অহংয়ের স্ফূর্তি নেইঃ তথাপি এরই মধ্যে নিয়তি আমাকে বারংবার জড়িয়ে এমন পৈশাচিক খেলা খেলে কেন? যে কর্মে আমার বিন্দুমাত্র সম্মতি, উৎসাহ বা স্বাধীনতা নেই, সেই কর্মের বোঝাও যে আমাকেই বইতে হবে—এর মধ্যে ন্যায় নেই, সত্য নেই, সুবিচার নেই, ভালো মন্দ কোনরকমের যুক্তিও নেই। আমার নিজের মনে কারুর প্রতি অপ্রেম নেই, বিদ্বেষ নেই, মমতা নেই।

অকস্মাৎ এই চিন্তার সূত্রজালকে বিধ্বস্ত ক'রে দিল একটি তীক্ষ্ণ নারীকণ্ঠের আর্তনাদঃ মিলার আশ্রয়দাত্রী বৃদ্ধার হাহাকারের ধ্বনি। উদ্ধত শিলাবৃষ্টির প্রকোপে বৃদ্ধার কুটির-সংলগ্ন সামান্য ভূমিখণ্ডের শস্য বিনষ্ট হতে দেখে পাশের ঘরে বৃদ্ধা বক্ষে করাঘাত ক'রে বিলাপ করছিলেন। মিলা আর স্থির থাকতে পারলেন না। এমন অবস্থায় স্বাভাবিক পরিণতিকে ঠেকাতে গেলে যে নিজের সর্বনাশ ডেকে আনা হয়, একথা জেনেও তিনি বৃদ্ধার এই সামান্য জমিখণ্ডকে রক্ষার জন্য

তৎপর হয়ে উঠলেন। নির্মম বলে যিনি কিছুপূর্বেই নিজের বড়াই করছিলেন, কার্যকালে দেখা গেল, তিনি সর্বস্ব পণ ক'রে সামান্য এক বৃদ্ধার ক্ষুদ্র এতটুকু জমির শস্যকে বাঁচাবার জন্য দৈবরোষকেও উপেক্ষা করলেন। অবশ্য তাঁর এই প্রয়াস যে ব্যর্থ হয়নি শিলাবৃষ্টির অবসানে তার প্রমাণ পাওয়া গেল। বৃদ্ধা এই শিলাবৃষ্টির ইতিকথা কিছুই জানতেন না, কেবল এইটুকুই বুঝলেন এই অজ্ঞাতকুলশীল অতিথির অনুগ্রহেই তাঁর ভূমিসম্পদটুকু দৈবক্রমে রক্ষা পেয়েছে।

আরব্ধ কর্ম সম্পন্ন ক'রে মিলা যখন গ্রামাঞ্চল পরিদর্শনে গেলেন তখন দেখলেন, যতদূর দৃষ্টি যায় শস্যক্ষেত্র বিধ্বস্ত হয়ে গেছে, এবং পথের পাশে পাশে অসংখ্য পাখি ও ইঁদুরের মৃতদেহ স্তূপাকার হয়ে জমে আছে। দুঃখভারাক্রান্তচিত্তে গ্রামের মধ্যে প্রবেশ ক'রে তিনি গ্রামবাসীদের বুঝিয়ে দিলেন যে সাধু নোংডুনের পথচারী শিষ্যদের উপরে অত্যাচারের ফলেই এই শিলাবৃষ্টি ঘটেছে এবং ভবিষ্যতে যদি তারা এ বিষয়ে সাবধান না হয়, তা হ'লে আরও গুরুতর শাস্তির আশঙ্কা আছে। হাজার অশিক্ষিত বা অসভ্য হ'লেও প্রত্যক্ষ শিলাবৃষ্টির জোরালো যুক্তিকে কেউ অস্বীকার করতে পারে না; অতএব মিলার দৌত্য নিষ্ফল হ'ল না বটে, কিন্তু তাঁর অন্তরাত্মা চারিদিকের ধ্বংসের রূপ দেখে আত্মগ্লানিতে দগ্ধ হতে লাগলো। দু'চারটি কথায় সংক্ষেপে বক্তব্য সেরে, মিলা উন্মুক্ত আকাশের আশ্রয়ে গিয়ে নিজের বিক্ষুব্ধ চিন্তাগুলিকে নিজের আয়ত্বে ফিরিয়ে আনবার প্রয়াসী হলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা; যেদিকেই দৃষ্টিপাত করেন সেদিকেই ধ্বংসের করাল ছায়া —তাঁর নিজেরই সাফল্যের মর্মান্তিক নিদর্শনগুলি তাঁকে ব্যঙ্গ করতে লাগলো। 'মিলা, তুমি না হিংসা দ্বেষের নিষ্ঠুরতাকে অতিক্রম ক'রে তথাগতের পথ অনুসরণ করবার প্রয়াসী? তুমি না সিদ্ধার্থের মত দীপ্তকণ্ঠে ঘোষণা করতে চেয়েছিলে—"ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং, ত্বগস্থি মাংসং প্রলয়ং মে যাতু!" নিজের ব্যথাক্ষুব্ধ অন্তরে তিনি

'মারে'র ধিক্কার শুনতে লাগলেন—'কি সো ত্বমসি ত্থব্বল্লো, সন্তিকে মরণং তব, সহস্‌স্ ভাগো মরণস্‌স্, একয়ো তব জীবিতং।' মৃত পশু পক্ষী কীট পতঙ্গের বোঝা বুকে নিয়ে বিশাল বিমর্ষ প্রান্তর নির্জীবের মত পড়ে আছে: শস্যক্ষেত্রগুলিতে সবুজের চিহ্ন মাত্র নেই। দিগন্তবিধৃত এই মহাশ্মশানের মধ্যে মিলা যেন এক ত্রুষ্ট প্রেতাত্মার মত একা একা অশান্ত প্রাণে ঘুরে বেড়ালেন। মৃত্যুর সমুদ্রে মুষ্টিমেয় এতটুকু জীবনের দ্বীপ—সেই বৃদ্ধার রক্ষা-পাওয়া ক্ষেতটুকু চোখে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলা নিজের মনে হু হু ক'রে একবার কেঁদে উঠলেন। কত অসংখ্য প্রাণশিখা আকাশ-চাওয়া আঁখি মেলে অন্তরের পানে চেয়ে ছিল; কত আশা, কত আনন্দ, পরিণতির প্রাণবন্যা মৃত্যুর হিমশীতল স্পর্শে পাষাণ হয়ে গেছে। সবুজ যবের মঞ্জরীগুলিকে মিলা ব্যথাহত প্রাণে বুকে জড়িয়ে ধরলেন; অনেকক্ষণ পর্যন্ত মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে যখন তিনি উঠে বসলেন তখন বেলা অনেক হয়ে গেছে। বৃদ্ধার কৃতজ্ঞতার উচ্ছ্বাস দাঁতে দাঁত চেপে কোনরকমে সহ্য ক'রে তিনি ফেরার পথে পা বাড়ালেন। পথের দুধার থেকে যতগুলি পারলেন মৃত ইঁদুর পাখি ও কীট পতঙ্গ নিজের উত্তরীয় প্রান্তে বেঁধে নিয়ে ভগ্ন-হৃদয়ে গুরু নোংড়ুনের সন্নিধানে উপনীত হলেন; তিক্তস্বরে বললেন, 'আপনার আদেশ পালন করেছি, কতকগুলি প্রমাণও সঙ্গে এনেছি।'

হাতের বোঝা খুলে নোংড়ুনের পদপ্রান্তে সেই মৃতের স্তূপ ঢেলে দিয়ে নিজের মুখ ঢেকে মিলা উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগ সংবরণ করবার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা করতে লাগলেন। নোংড়ুন স্মিতহাস্যে ভাবী শিষ্যের ভাবোচ্ছ্বাস লক্ষ্য করছিলেন, এবার বললেন, 'এই সামান্য কারণে ধৈর্য হারাতে নেই। তোমার হাতে যারা মরেছে তারা সবাই সদ্‌গতি লাভ ক'রে পরবর্তী কালে তোমার শরণ নেবে। আমার এ কথায় তোমার যদি বিশ্বাস না হয়, তাহলে এই দেখো তোমার সামনেই

আমার কথার প্রমাণ আমি দিচ্ছি।' এই কথা বলেই নোংড়ুন সামান্য একটি অঙ্গুলির হেলনে প্রাণহীন দেহগুলিতে মুহূর্তের মধ্যে প্রাণসঞ্চার কর:লেন ; সঙ্গে সঙ্গে পশুপাখি কীটপতঙ্গগুলি জীবন লাভ ক'রে স্ব স্ব স্থানে উড়ে চলে গেল। মিলার মন থেকেও দুষ্কৃতির গুরুভার অপসৃত হয়ে গেল।

শীঘ্রই একদিন মিলারেপার প্রাথমিক মন্ত্রদীক্ষা হয়ে গেল। গুরু নোংড়ুনের নির্দেশক্রমে মিলা নিকটের একটি পার্ব্বত্য গুহায় তন্ত্রোক্ত সাধন-পদ্ধতি অনুসারে নিজের সাধনপীঠ প্রতিস্থাপিত ক'রে, সেই গুহার মুক্ত দ্বার নিজের হাতে প্রাচার গেঁথে ভিতর থেকে নিজেকে অবরুদ্ধ করলেন—কেবল সামান্য একটু গবাক্ষ খোলা রইলো খাদ্য-পানীয় ইত্যাদির জন্য। ধ্যানের প্রণালী, সাধনার যাবতীয় আনুষঙ্গিক পদ্ধতি গুরুর কাছে পেয়েও প্রাণপণ চেষ্টায় মিলা সাধনমার্গে কিছুমাত্র উন্নতি করতে পারলেন না। সমগ্র জীবনের মূল্যে কেনা সাধনায় সর্বশক্তি নিয়োগ করেও তাঁর মনে হতে লাগলো যেন ব্যর্থতার বোঝা ক্রমেই ভারি হয়ে উঠছে। নিজের অন্তরের সঙ্গে ক্রমাগত লড়াই ক'রে ক'রে তিনি ক্ষতবিক্ষত হয়ে উঠতে লাগলেন। সাধন রাজ্যের অভিজ্ঞতা জিজ্ঞাসা করতে এসে গুরু যে উত্তর পেলেন তাও তাঁর কাছে বিশেষ সন্তোষজনক বলে মনে হ'ল না। অপ্রসন্ন মুখে তিনি বললেন, 'এমন তো হবার কথা নয়; বিশেষ কোন একটা প্রতিবন্ধক না থাকলে এ পথে তো কখনো কারো উন্নতি বিলম্বিত হতে শুনিনি। তা ছাড়া এ ক্ষেত্রে স্বয়ং মহর্ষি মার্পা নিজের অভিজ্ঞান ও আশীর্বাদ পাঠিয়ে দীক্ষাদানের আদেশ জানিয়েছিলেন। সেই সর্বজ্ঞ মহাপুরুষের তো এমন ভুল হবার সম্ভাবনা নেই।'

বেশ বোঝা গেল যেন গুরু নোংড়ুন বেশ একটু দুশ্চিন্তাগ্রস্ত ও বিব্রত বোধ করছেন। তাঁর মুখের ভাব দেখে মিলার মনও চঞ্চল হয়ে উঠলো, কারণ মহর্ষির লিপি-রহস্য আগাগোড়া কিছুই তাঁর অজানা

ছিল না, এবং এই শেষ অধ্যায়টি যে মূলতঃ প্রতারণার ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত, এই জ্ঞানটি মনের মর্মমূলে প্রচ্ছন্ন থেকে নিরন্তর তাঁকে পীড়িত করছিল। কতবারই মনে হয়েছে, সমস্ত কথা খুলে বলে এ অভিনয়ের সমাপ্তি করি; সঙ্গে সঙ্গে স্বার্থচিন্তা এসে প্রবল ভাবে বাধা না দিলেও, ভয় হয়েছে সত্যের অন্তরায়।

এমনিতর দ্বিধাদ্বন্দ্বের মাঝখানে এলো মহর্ষি মার্পার লিপি। চিঠিখানির মুখ্য উদ্দেশ্য হ'ল—গৃহনির্মাণ কল্পে কয়েক বোঝা কাঠের প্রয়োজন, নোংড়ুন যেন প্রয়োজনীয় কাষ্ঠ সংগ্রহ ক'রে সত্বর পাঠিয়ে দেন। পত্রের শেষাংশে ছিল মিলার উল্লেখ: মহর্ষি মার্পা মিলার গতিবিধি লোকমুখে অবগত হয়ে আদেশ জানিয়েছেন যে নোংড়ুন স্বয়ং যেন মিলাকে সঙ্গে নিয়ে কাঠের বোঝার সঙ্গে মহর্ষির দরবারে সত্বর হাজির হন। মিলা যে অতি দুষ্ট প্রকৃতির লোক এবং তাকে যে কোনক্রমেই প্রশ্রয় দেওয়া চলে না, এ পত্রে মহর্ষি সে কথাও স্পষ্টভাবে উল্লেখ করেছেন দেখে নোংড়ুন তৎক্ষণাৎ মিলার কাছে গিয়ে তাঁর এই ইচ্ছাকৃত অপরাধের কৈফিয়ৎ দাবি করলেন। বাধ্য হয়ে মিলাকে আগাগোড়া সমস্ত ব্যাপারটিই বিবৃত করতে হ'ল। নোংড়ুন ধীরভাবে সমস্ত কথা শুনলেন। মিলার প্রতি তাঁর স্নেহ ছিল, তাছাড়া এ ক্ষেত্রে স্বয়ং গুরুপত্নী জড়িত আছেন জেনে তিনি এ বিষয়ে আর কোন মন্তব্যই করলেন না; কেবল বললেন, 'এতক্ষণে বোঝা গেল কেন তোমার সাধন-প্রচেষ্টা ভস্মে ঘি ঢালার মত নিরর্থক হচ্ছিল। মহর্ষির আদেশক্রমে তোমাকেও আমার সঙ্গে যেতে হবে: তুমি যাত্রার জন্য প্রস্তুত হও।'

মহর্ষি মার্পার ক্রোধবহ্নির মুখোমুখি দাঁড়াতে মিলার মনে যে আতঙ্ক ছিল না, তা নয়। কিন্তু গুরুর প্রত্যক্ষ আদেশকে তিনি কেমন ক'রে অস্বীকার করবেন? তাছাড়া, এমনি

একটা আহ্বানের জন্য যেন বহুদিন থেকেই তাঁর অন্তর তৃষাতুর হয়ে প্রতীক্ষা করছিল। সাধনার প্রথম স্তরে অপ্রত্যাশিত ব্যর্থতাকে বরণ ক'রে তিনি এই সত্যটিই আর একবার সুস্পষ্টভাবে হৃদয়ঙ্গম করলেন যে সত্যকে পেতে হ'লে কোনরকম ফাঁকির পথেই তাকে পাওয়া চলবে না ঃ পর্যাপ্ত দুঃখের যথার্থ মূল্যেই তাকে পেতে হবে। মার্পার অজ্ঞাতসারে তাঁরই লিপি-বাহকের হাতে দামেমাও কৌশলক্রমে মিলাকে আশ্বাসবাণী পাঠিয়েছিলেন যে তাঁর পরমপ্রাপ্তির পথ আর সুদূরপরাহত নয়। এ আশ্বাসের মূল্য কতখানি, মিলা তার বিচারে প্রবৃত্ত হলেন না, কারণ স্নেহময়ী গুরুমার যে শীঘ্র দেখা পাবেন এই আনন্দই তাঁর মনের মধ্যে আপাততঃ রক্ষাকবচের মত হয়ে রইলো।

যাত্রার দিন যখন ক্রমে সমাগত হ'ল, তখন দেখা গেল যে কেবল কতকগুলি কাঠের বোঝাই নয়, নোংডুনের যাবতীয় ধনসম্পদ, তৈজস-পত্র, স্বর্ণ-রৌপ্য, বস্ত্র-অলঙ্কারাদি থেকে আরম্ভ ক'রে গবাদি পশু, গ্রন্থ-রাজি পর্যন্ত সমস্তই চলেছে তাঁর সঙ্গে। নিজের বলতে যা যেখানে ছিল, স্থাবর অস্থাবর প্রায় সমস্ত কিছুই নোংডুন গুরুর চরণে অর্পণ করবার জন্য সঙ্গে নিয়ে চলেছেন। তাঁর বিশাল পশুপালের মধ্যে পিছনে পড়ে রইলো কেবল খঞ্জ একটি ছাগী, তাও কেবল একমাত্র এই কারণেই যে এতখানি পথ অতিক্রম করা তার সাধ্যে কুলাবে না। মিলার নিজের প্রণামী হিসাবে দেবার মত কিছুই নেই দেখে, নোংডুন তাঁকেও বহুমূল্য বস্ত্রখণ্ড এবং দামেমাকে দেবার জন্য সর্বোৎকৃষ্ট মাখমচূর্ণ দিলেন। সস্ত্রীক নোংডুন সর্বস্ব নিয়ে চললেন গুরু-সাক্ষাৎকারে। পার্বত্য পথে পাড়ি দিল বিশাল মিছিল।

বহুপথ পরিভ্রমণ ক'রে লামা নোংডুনের বিরাট মিছিল মহর্ষি মার্পার ধর্মাশ্রমের কাছাকাছি এসে পৌঁছালো। পাহাড়ের উপরে দোত্তলুং ধর্মাশ্রমের পতাকা দেখা যায়। অভিযাত্রীদলকে ক্ষুৎপিপাসায়

অবসন্ন দেখে নোংড়ুন মিলাকে অগ্রদূত হয়ে দলের আগমন সংবাদ জ্ঞাপন করবার জন্য পাঠিয়ে দিলেন। মিলাও বোধ হয় এই সুযোগের প্রার্থনা করছিলেন; গুরুমার দর্শনলাভের জন্য তাঁর অন্তর উৎকণ্ঠিত হয়েছিল। দীর্ঘ সোপানশ্রেণী অতিক্রম ক'রে মার্পা গুরুর অঙ্গনে পদার্পণ ক'রেই সর্বাগ্রে দামেমার চরণ-চন্দনা করলেন। গুরুমা বললেন, 'পথশ্রান্ত অতিথিদের সম্বর্ধনার জন্য আমি খাদ্যপানীয় পাঠাবার ব্যবস্থা করছি: তুমি নিশ্চিন্তমনে গুরুকে প্রণাম ক'রে এসো।'

সুবৃহৎ নূতন প্রাসাদের কোন্ তলায় গুরুর আসন কিছুই জানা নেই। সর্বোচ্চ তলায় গিয়ে মিলা অবশেষে তাঁকে ধ্যানাসনে উপবিষ্ট দেখলেন। অনেকক্ষণ পর্যন্ত মিলা একদৃষ্টে তাঁর প্রশান্ত মুখের পানে তাকিয়ে রইলেন। সেই বহুদিন পূর্বেকার প্রথম দর্শনের স্মৃতি তাঁর মনে জেগে উঠলো; প্রশস্ত ললাটে যেন মহিমার রাজটীকা দেদীপ্যমান; এতটুকু গ্লানি, এতটুকু মালিন্য কোথাও নেই। ক্রোধ নেই, হিংসা নেই, লোভ নেই—মানুষের মুখে যা কিছু থাকে তার কিছুই সেই মুখে নেই। নিষ্পলক-নেত্রে এই নিস্পন্দ মূর্তির পানে চেয়ে থাকতে থাকতে মিলার দু-চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগলো। ধীরে ধীরে নিঃশব্দে তিনি কাছে এগিয়ে গেলেন, পূর্বদিকে মুখ ক'রে গুরু যেখানে বসেছিলেন, সেইখানে গিয়ে তাঁর পদপ্রান্তে প্রণামী বস্ত্রখণ্ড রেখে মিলা সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরু পশ্চিম দিকে মুখ ফিরিয়ে বসলেন। মিলা পুনরায় পশ্চিম দিকে গিয়ে দ্বিতীয় বার প্রণিপাত করলেন। মুখ তুলে দেখলেন, আবার গুরু দক্ষিণ দিকে মুখ ক'রে বসে আছেন। মিলা বুঝলেন, অন্তর্যামী গুরু তাঁর প্রণাম গ্রহণ করতে চান না। মিলা বললেন, 'গুরুদেব, আমি অপরাধী বলে আপনি আমার প্রণাম নিতে চান না তা আমি বুঝেছি। সস্ত্রীক লামা নোংড়ুন তাঁর যথাসর্বস্ব ধনসম্পদ নিয়ে দ্বারপ্রান্তে উপনীত হয়েছেন। তাঁর যথাযোগ্য সম্বর্ধনার আদেশপ্রার্থী হয়ে আমি এসেছি।'

রুষ্টস্বরে মহর্ষি বললেন, 'সম্বর্ধনা কিসের? যার ইচ্ছা হবে আসবে, যার ইচ্ছা হবে আসবে না। সে যদি সম্বর্ধনার প্রয়াসী হয়ে এসে থাকে, যেখান থেকে এসেছে সেখানেই স্বচ্ছন্দে ফিরে যেতে পারে। আমি যাবো তার ধনদৌলত ঐশ্বর্যকে সম্বর্ধনা জানাতে? কি অসহ্য স্পর্ধা! কে আমাকে সম্বর্ধনা করেছিল যখন আমি বারংবার পুঁথির বোঝা বহন ক'রে ভারতবর্ষ থেকে ফিরেছি? বৌদ্ধধর্মের মণিমাণিক্য আহরণ ক'রে কাঙালের বেশে যখন তিব্বতের পথে পথে পদব্রজে আমি ঘুরেছি, তখন কে আমাকে পাদ্য অর্ঘ্য দিয়ে অভ্যর্থনা জানিয়েছে? তোমার সম্বর্ধনার প্রার্থীকে বলো গে যাও—তার সে আশা পূর্ণ হবে না।'

মিলা ভগ্নোদ্যম হয়ে গুরুমার কাছে ফিরে গিয়ে আনুপূর্বিক নিবেদন করলেন। তিনি বললেন, 'বদ্‌রাগী মানুষ উনি, চিরদিন ওই রকমই ওঁর স্বভাব। বারণ করেছেন যখন তখন তো আর কোন উপায় নেই। যথোপযুক্ত খাদ্যপানীয় নিয়ে তুমিই গিয়ে ওঁদের অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে এসো।' পরক্ষণেই কি ভেবে বললেন, 'সে হয় না; ওঁদের অভ্যর্থনা ক'রে আনা আমারও কর্তব্য।' পরিচারকদের হাতে প্রচুর খাদ্যপানীয় সঙ্গে নিয়ে দামেমাও নোংডুনের দলকে স্বাগত সম্ভাষণ জানাবার জন্য এগিয়ে গেলেন।

অতিথিরা এসে দেখলেন উৎসবের আয়োজন সম্পূর্ণ হয়ে গেছে এবং স্বয়ং মহর্ষি মার্পা স্বস্তিপাঠ করছেন। মহর্ষির পুত্র ধর্ম-দোদের নামে নবনির্মিত হর্ম্য উৎসর্গ করা হ'ল। উৎসব-প্রাঙ্গন লোকে লোকারণ্য। এরই মাঝখানে শিষ্য নোংডুন তাঁর আনীত দ্রব্যসম্ভার থরে থরে সাজিয়ে মহর্ষির পদপ্রান্তে স্থাপন ক'রে বললেন, 'গুরুদেব, আমি ও আমার যাবতীয় সম্পদ সমস্তই আপনার। আজ এই শুভক্ষণে আমার যথাসর্বস্ব নিয়ে আপনার চরণপ্রান্তে আমি উপস্থিত হয়েছি। কেবল একটা খোঁড়া ছাগীকে সঙ্গে আনা সম্ভব হয় নি বলে সেটাই

পিছনে পড়ে আছে। আমার প্রার্থনা, এই সমস্ত দক্ষিণার বিনিময়ে আপনি এই শুভদিনে আমাকে দীক্ষার শেষ-মন্ত্র সমন্বিত পুঁথিখানি প্রদান করুন এবং সঙ্গে সঙ্গে তার অধিকারও আমাকে দিন।'

নোংভুন এই কথা বলে সাষ্টাঙ্গে প্রণত হলেন।

শিষ্যের বিনয়বচনে সন্তুষ্ট হয়ে মার্পা বললেন, 'তোমার প্রার্থিত-বস্তু যে সামান্য নয় সে কথা তুমি জানো। পৃথিবীতে এই পরাবিদ্যার তুলনা নেই, কারণ এ বিদ্যা অধিগত হ'লে নির্বাণের জন্য জন্ম-জন্মান্তর ধরে অপেক্ষা করতে হয় না : এক জন্মেই নির্বাণ করতলগত হয়। সেই জন্যই এই পরম ধন লাভ করতে হ'লে সর্বস্বদানের যজ্ঞ করতে হয়। তুমি যা কিছু এনেছো তা সর্বস্বের কাছাকাছি হ'লেও একেবারে সর্বস্ব নয়, কারণ তোমার খঞ্জ ছাগীটি এখনও তোমার নিজস্ব ধন রয়ে গেছে। ধর্মের অনুশাসন বড়ই সূক্ষ্ম ; অতএব প্রার্থিত বস্তু পেতে হ'লে এখন তোমাকে নিজে গিয়ে সেই অক্ষম পশুটিকে নিয়ে আসতে হবে। এ' যদি পারো, তবেই তোমাকে এই শেষ বিদ্যা দেওয়া যায়।'

নোংভুন গুরুর আদেশে তখনই একবস্ত্রে বেরিয়ে পড়লেন এবং দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে নিজের স্কন্ধে সেই চলৎশক্তিহীন ছাগীটিকে বহন ক'রে গুরুর সন্নিধানে প্রত্যাবর্তন করলেন। এবার গুরু খুশি হয়ে বললেন, 'আমি সন্তুষ্ট হয়েছি। এই রকমই হওয়া চাই, নইলে শাস্ত্রমর্যাদা রক্ষা হয় না। তোমার দ্রব্যসম্ভারে বা এই খোঁড়া ছাগীতে আমার কোন প্রয়োজনই নেই ; কিন্তু নিজস্ব বলে যতক্ষণ সামান্য কিছুও থাকবে, ততক্ষণ এই নিগূঢ় তত্ত্ব আয়ত্বে আসতে পারে না। সব যার আছে কিছুই তার নেই, আবার পক্ষান্তরে কিছুই যার নেই সব তার আছে।'

উৎসবের প্রথম দিকে নানাবিধ কর্মব্যস্ততার ফাঁকে মিলা গুরুকে যতদূর সম্ভব এড়িয়ে এড়িয়ে বেড়াচ্ছিলেন, গুরুও এমন ভাবে চলছিলেন যেন তিনি পুরানো কথা একরকম ভুলেই গেছেন। কিন্তু সহসা

একদিন চাকা ঘুরলো। যাই-যাই ক'রে তখনও দূরাগত ভক্তরা ফিরে যান নি; অতএব উৎসব বহুদিন পর্যন্ত সমভাবেই চলেছে: উদয়াস্ত লোকের ভিড়ে মহর্ষির প্রাসাদোপম হর্ম্য সমানে মুখরিত হয়ে আছে। নোংড়ুন গুরুর দরবারে উপবিষ্ট, এমন সময়ে অকস্মাৎ রোষকষায়িত দৃষ্টিতে মহর্ষি মার্পা তাঁকে উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'নোংড়ুন, তুমি এ পর্যন্ত আমার কাছে সে কৈফিয়ৎ দাও নি, কেন তুমি এই পাষণ্ডকে দীক্ষা ও শিক্ষা প্রদান করেছিলে। সেই কথাই এখন আমি শুনতে চাই।'

গুরুর রুদ্র মূর্তি, হাতের কাছে লগুড় ইত্যাদি সত্রাসে লক্ষ্য ক'রে নোংড়ুন আতঙ্কগ্রস্ত হলেন; কম্পিত স্বরে বললেন, 'এ বিষয়ে আমার কোনই অপরাধ নেই, কারণ আপনার নামাঙ্কিত আদেশলিপি অনুসারেই আমি মিলাকে দীক্ষা দিয়েছি। সেই লিপির সঙ্গে মহর্ষি নারোপার পবিত্র জপমালা ও অর্ঘ্য পেয়ে আমি আপনার আদেশ শিরোধার্য করেছি মাত্র। আমি যে কোন অন্যায় করেছি তা আমার মনে হয় না।'

মার্পা তখন এমন তীব্র দৃষ্টিতে মিলার দিকে চাইলেন যে তাঁর অন্তরাত্মা কেঁপে উঠলো। উদ্যত তর্জনি মিলার দিকে ফিরিয়ে গুরু ক্রুদ্ধ স্বরে জিজ্ঞাসা করলেন, 'তুই এসব কোথায় পেলি।'

ভীতি-লজ্জা-সঙ্কোচ-বিজড়িত কণ্ঠে মিলা গুরুমার নাম উচ্চারণ করার সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি মার্পা লগুড় হস্তে আসন ত্যাগ ক'রে লাফিয়ে উঠে দামেমার দিকে ধাবিত হলেন। অবস্থার গুরুত্ব চকিতে উপলব্ধি ক'রে দামেমা ইতিপূর্বেই সভার একপ্রান্ত ঘেঁসে দাঁড়িয়ে ছিলেন, এখন আর কালবিলম্ব না ক'রে ত্বরিৎপদে নিকটবর্তী প্রার্থনা ঘরে প্রবেশ করে ভিতর থেকে দরজায় খিল এঁটে দিয়ে ভয়ে কাঁপতে লাগলেন। স্বামীর আকস্মিক ক্রোধের মর্ম তিনি ভাল ক'রেই জানতেন: আগুনের মত জ্বলে উঠে এবং পরক্ষণেই জল হয়ে নিভে যায় যে বস্তু—তার প্রথম

চোটটা সামলাতে পারলে যে আর ভাবনার কিছু নেই, এ কথাও তাঁর জানা ছিল। ক্রুদ্ধ মার্পা দু-চারবার দ্বারের বাইরে থেকে হাঁক-ডাক ক'রে হুঙ্কার ঝেড়ে যেন ইতিকর্তব্য সম্পাদন ক'রে প্রশান্ত মুখে নিজের আসনে ফিরে গেলেন। রুদ্ধদ্বারের ওপারে দামেমা আপন মনে নিশ্চিন্তে একটু হেসে নিয়ে দ্বারের ফাঁক দিয়ে স্বামীকে নিরীক্ষণ ক'রে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচলেন। বুঝলেন ফাঁড়া কেটে গেছে, আর ভয় নেই।

মিলাকে গুরু কিছুই বললেন না, কিন্তু তাতেও তাঁর আশঙ্কা অপনীত হ'ল না। তিনি একঘর লোকের সামনে দাঁড়িয়ে বলির পশুর মত কাঁপতে লাগলেন। নিজের জন্য যত না হোক, গুরুমার এই অপমান তাঁর বুকে শেলের মত বিঁধেছিল। এখানে এই অবস্থায়, এতবড় সভার মাঝখানে দাঁড়িয়ে, নিজের অপরাধের বোঝা স্নেহমমতাময়ী গুরুমার স্কন্ধে চাপিয়ে দেওয়ার গ্লানি যেন দুঃসহ বিশ্বাসঘাতকতার মত তাঁর অন্তরে চাবুকের পরে চাবুক মারতে লাগলো। এর চেয়ে গুরু যদি সমস্ত অপরাধ তাঁর নিজের উপরে চাপিয়ে জীবন্ত তুষানলে দগ্ধ করার আদেশ দিতেন, সেও হয়তো তিনি সানন্দে বরণ ক'রে নিতেন। কিন্তু গুরু তাঁর দিকে দৃক্‌পাতমাত্র না ক'রে নোংডুনকে বললেন, 'তোমার অপরাধ না থাকতে পারে, কিন্তু তথাপি তুমি যা করেছো তার পিছনে আমার আদেশ ছিল না। অতএব এখনই গিয়ে নারোপার জপমালা ও পবিত্র অর্ঘ্য ফিরিয়ে এনে দাও।'

দ্বিরুক্তি না ক'রে নোংডুন তৎক্ষণাৎ আদেশ পালনে উদ্যত হয়ে গৃহের বাইরে বেরিয়ে পড়লেন। এইবারে তাঁর নিজের পালা অনুমান ক'রে মিলাও যেন যন্ত্র-চালিতের মত নোংডুনের পিছনে পিছনে চলে এলেন; সাশ্রুনেত্রে বললেন, 'আমাকেও আপনি সঙ্গে নিয়ে চলুন।' সন্ত্রস্ত হয়ে নোংডুন বললেন, 'বিনা আদেশে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে গেলে তোমার বা আমার কারুরই রক্ষা নেই। আমি বলি তুমি

আপাততঃ এখানেই থাকো। যদি শেষ পর্যন্ত গুরু তোমাকে কৃপা না করেন, আমার যথাসাধ্য আমি তোমার জন্য করবো।'

মিলা বললেন, 'না, আমি বুঝে নিয়েছি যে আমি কোন মানুষের সাহায্যের অতীত। আমার আশা-আকাঙ্খার শেষ হয়েছে। নিজে দুঃখ পাবো এবং নিজের দুঃখের জালে অন্য সবাইকে জড়াবো এই আমার বিধিলিপি। আমার এ জীবন বিফলে গেল। মৃত্যু ছাড়া আমার আর গত্যন্তর নেই, কারণ যতদিন বাঁচবো আমি নিজের পাপে অপর সবাইকে ভারাক্রান্ত ক'রে তুলবো। পাপের বোঝা আর বাড়াতে চাই না। কেবল আপনার কাছে আমার এই ভিক্ষা যেন পরজন্মে মৃত্যু-প্রায়শ্চিত্তের ফলে আমার সঙ্গতি লাভ হয় এবং তখন যেন আমি সত্য-সাধনার পরিপূর্ণ সুযোগ লাভ করি।'

মিলার কান্না দেখে নোংড্‌নও বিচলিত হয়ে অশ্রুমোচন করতে লাগলেন। তিনি মিলাকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে বললেন, 'না মিলা, তুমি সাহসী বীর, নিজেকে এভাবে দুর্বল ক'রে তুলো না। আমাদের ধর্মের সার কথা তুমি জানো। দেহের যাবতীয় কর্ম ঐশ্বরীয় বিকাশ, তাতে সন্দেহ মাত্র কোরো না। দেহ তোমার নয়ঃ দেহাতীত আত্মার লীলাস্থল। স্বেচ্ছায় দেহপাত ঘটানো মহাপাপ, কারণ তার দ্বারা দেহাতীতের উচ্ছেদ সাধন করা হয়, এই দেহের মধ্যে যে বিদেহ বাস করেন, তাঁকে আঘাত করা হয়। সে অপরাধের তুলনা নেইঃ এর চেয়ে বড় পাপ আর নেই। তুমি আত্মহত্যার বাসনা ত্যাগ করো, কারণ নিজেকে যদি সংহার করো তাহ'লে আশ্রয়ভূমি আর কোথায় পাবে? আমি বলছি তুমি ধৈর্য ধারন করো। কে বলতে পারে সর্বশক্তিমান গুরু কি উদ্দেশে কি লীলা করেন? তিনিই হয়তো স্বেচ্ছায় সানন্দে তোমাকে তোমার প্রার্থিত বস্তু দান করবেন। তা যদি নাও হয়, তোমার জীবনে যে দাতা হয়ে আর কেউ আসবেন না তাই বা কে বলতে পারে?'

মিলার উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তকে সান্ত্বনা দেবার জন্য নোংডুন যথাবিহিত চেষ্টা করলেন। একজন-দুজন ক'রে তাঁর গুরুভ্রাতারাও ক্রমে ক্রমে এসে সমবেদনার স্বরে তাঁকে প্রবোধ দিতে লাগলেন। কিন্তু কোন সান্ত্বনাই মিলার মনকে স্পর্শ করতে পারলো না। তাঁর মনে হতে লাগলো, এই তো গুরুর কত শিষ্যই আছেন—আমার মত বিড়ম্বনা তো কারুর ললাটে লেখা নেই। অপরাধ জীবনে যা কিছু ঘটেছে স্বেচ্ছায় আমি কিছুই করি নি। তবু আমার ভাগ্যে অদৃষ্টের এই নির্মম পরিহাস কেন? যে পথে আমি চলেছি দুগ্র'হ আমার পিছনে পিছনে ছায়ার মত তাড়া ক'রে বেড়ায় কেন? কেন কোনদিকে আমার মুক্তির পথ খোলা নেই? মিথ্যা সান্ত্বনায় বুক বেঁধে কতবারই তো দেখলাম, আশার মরীচিকার পিছনে সারা জীবনই তো পাগলের মত ছুটে বেড়ালাম। তাতে দুষ্কৃতির বোঝা তো কই হাল্‌কা হোলো না। এতদিনের এত দুর্ভোগেও কি আমার শিক্ষা হ'ল না? যে জীবনে সার্থকতার কোন সম্ভাবনাই নেই তাকেই তো বলে ব্যর্থ জীবন। জীবনের বাকি কালটা এ ব্যর্থতার বোঝা বয়ে বেড়ালে তাতে আমার কিসের মঙ্গল? নোংডুন যাই বলুন, আমার প্রতি করুণাবশতঃ বলছেন। এ করুণায় আমার কি লাভ? এ দেহের বোঝা টেনে টেনে আর আমি বেড়াতে পারি না। আমি অসহায়, নিরাশ্রয়, বিশ্বের পরিত্যক্ত, মূর্তিমান পাপ। আমার বাঁচবার কোন অধিকারই নেই।

মিলাকে এই অবস্থায় রেখে দীর্ঘকালের জন্য কোথাও যেতে নোংডুন কিছুতেই মনে জোর পাচ্ছিলেন না। তার মানসিক অবস্থা যে শোচনীয় এবং তার সহ্যশক্তি যে অনেক ঘা খেয়ে আজ একেবারে চরম-সীমান্তে পৌছেছে, এ কথাও তিনি অন্তরে অন্তরে অনুভব করছিলেন। সেখানে আর যাঁরা উপস্থিত ছিলেন, সকলেই মিলার ইতিবৃত্ত জানতেন। সহানুভূতির কারুরই অভাব ছিল না, কিন্তু তাঁর পাথরের মত ভাবলেশ-

হীন মুখের পানে চেয়ে কেউই কিছু বলার মত কথা খুঁজে পাচ্ছিলেন না। শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা প্রধান, তাঁরা মিলার হয়ে কিছু বলবার জন্য বারংবার দূর থেকে মহর্ষি মার্পার মুখভাব লক্ষ্য ক'রে বোঝবার চেষ্টা করছিলেন, এ সময়ে কিছু বলা নিরাপদ কিনা। একে একে তাঁরা ভগ্নদূতের মত ভিতরের খবর বাইরে পৌঁছে দিচ্ছিলেন। দোটানায় পড়ে নোংডুনও হতাশ ভাবে মধ্যপথে আটকে রইলেন। কিন্তু সর্বজ্ঞ গুরুর কিছু অবিদিত ছিল না। ক্রোধের অভিনয় বেশ কিছুক্ষণ চালাবার পরে তাঁর মুখে প্রসন্নতা ফিরে এলো দেখে সভাস্থ সকলে স্বস্তির শ্বাস ফেলে বাঁচলেন।

গুরু বললেন, 'দামেমাকে আসতে বলো।' দামেমা ঝড়ের সঙ্কেত যেমন বুঝতেন, ঝড় থেমে যাওয়ার সঙ্কেতও তেমনি বুঝলেন। ভালো-মানুষটির মত তিনিও সঙ্গে সঙ্গে নিজের স্থানে এসে বসলেন। গুরু এর পরেই নোংডুনের খবর জিজ্ঞাসা করলেন। ভয়ে ভয়ে একজন শিষ্য বললেন, 'নোংডুন আপনার আদেশ প্রতিপালনের জন্য তখনই যাত্রা করেছিলেন; কিন্তু পথের মাঝে ব্যথাহত মিলাকে শান্ত করবার জন্য বিস্মিত চেষ্টা করছেন।' মৃদু হাস্য সহকারে মার্পা জিজ্ঞাসা করলেন, 'যাদুকরের অশান্ত হবার কি কারণ ঘটলো? তাকে তো আমি কিছুই বলিনি। যার শাস্তি পাওয়ার কথা সে বিনা শাস্তিতেই অশান্ত হয় কেন?' তার কথা বলার ভঙ্গিতে সাহস পেয়ে শিষ্য বললেন, 'প্রভু, বিনা দুঃখে কেউ কি কখনো আত্মহত্যায় প্রবৃত্ত হয়?' এই সামান্য একটি কথাতেই মহর্ষি মার্পা গলে জল হয়ে গেলেন। সবাই বিস্মিত হয়ে দেখলো তাঁর দু-চোখে অশ্রু টলমল করছে। তিনি বললেন, 'তার দুঃখ সবই আমি জানি; নোংডুন যে তাকে শান্ত করবার চেষ্টা করছে, তারও আমি সম্পূর্ণ অনুমোদন করি। পথের পথিক যারা তারাই তো এমনি ক'রে পরস্পরের দুঃখ বুঝবে। তোমরা কেউ গিয়ে নোংডুনকে আমার কাছে ডেকে আনো।'

লোকের মুখে গুরুর বার্তা পেয়েও কিন্তু নোংড়ুন মিলাকে এমন অবস্থায় রেখে যেতে পারলেন না। গুরু প্রসন্নমুখে নোংড়ুনকে ডেকে পাঠিয়েছেন, কিন্তু তাঁর মত দুর্ভাগ্যের নামটি পর্যন্ত মুখে আনেন নি। দীর্ঘদিনের উৎসব সমারোহে একান্ত পরের মত মিলা গুরুর সামীপ্য থেকে পালিয়ে বেড়িয়েছেন : সবাই জেনেছে যে সে মিথ্যাচারী ঘৃণ্য অন্তজ ছাড়া আর কিছুই নয়। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মিলা বললেন, 'গুরু ডেকেছেন, আপনি যান। আপনার সৌভাগ্যকে আমি ঈর্ষা করি না, জগতের কোন সৌভাগ্যবান ব্যক্তির প্রতিই আমার হিংসা নেই; কিন্তু এর পরেও আমাকে জোর ক'রে বাঁচিয়ে রেখে আপনারা কেন আমার জীবনের গুরুভার বাড়িয়ে দিতে চান? সবাইকে মহর্ষির প্রয়োজন আছে—কেবল আমাকেই নেই; সবাইকার অধিকার আছে গুরুদর্শনের—কেবল আমারই নেই। বিশ্বের বঞ্চিত আমি, সবাইকার অধম আমি—আমার বেঁচে থেকে কি লাভ?'

যে শিষ্যটি নোংড়ুনকে ডাকতে এসেছিলেন তিনি, সমস্ত দেখে শুনে গুরুর কাছে ফিরে গিয়ে বললেন যে মিলাকে একা রেখে আসা মোটেই নিরাপদ হবে না, গুরু যদি কৃপা ক'রে আদেশ দেন, তাহ'লে মিলাকে সঙ্গে নিয়ে নোংড়ুন ফিরে আসতে পারেন।

মহর্ষি বললেন, 'তোমার প্রস্তাবটি আমি বিবেচনা ক'রে দেখতে পারতাম। কিন্তু এখনকার পরিস্থিতি হয়েছে অন্যরকম, কারণ এখন কৃপা ক'রে আদেশ আমি দেব না, যাদুকরকেই কৃপা ক'রে এই সভায় আসতে হবে। সে-ই আজ হবে প্রধান অতিথি। দামেমা, তুমি নিজে গিয়ে মিলাকে আমন্ত্রণ ক'রে এখানে নিয়ে এসো।'

গুরুর কথায় সভাস্থ সকলেই বিস্মিত হয়ে তাকিয়ে রইলেন। কেউই এই ভাবান্তরের তাৎপর্য ধরতে পারলেন না, অথচ কথাগুলি যে ব্যঙ্গ, বিদ্রূপ বা উপহাস নয় তাতে সন্দেহমাত্র নেই। দামেমা হাসি-মুখে তখনই মিলার সান্নিধ্যে ছুটে গেলেন। বললেন, 'মিলা, আমি

তোমার জন্য সুসংবাদ এনেছি : গুরু প্রসন্ন হয়ে তোমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। তাঁর কথায় আমি বুঝেছি যে আমার প্রতি বা তোমার প্রতি তাঁর আর কিছুমাত্র ক্রোধ নেই। তোমাকে তিনি প্রধান অতিথি-রূপে আমন্ত্রণ জানাতে বলেছেন; তুমি আর কালবিলম্ব না ক'রে আমার সঙ্গে এসো। চোখের জল মুছে ফেলো, কারণ আমার বিশ্বাস তোমার চোখের জল ফেলার দিন ফুরিয়ে এসেছে।'

মিলা দ্বিধাগ্রস্থ চিত্তে ভয়ে ভয়ে জনাকীর্ণ সভাঘরে প্রবেশ করলেন এবং গুরুব পদপ্রান্তে সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করলেন। প্রসন্ন দৃষ্টিতে তাঁকে অভিষিক্ত ক'রে গুরু সমগ্র সভাকে সম্বোধন ক'রে বললেন : মিলার ব্যাপারে তোমাদের সবাইকার মনেই নানারকম প্রশ্ন জেগেছে জেনেও আমি এতদিন পর্যন্ত চুপ ক'রে ছিলাম। আজ সমস্ত কথা বলবার সময় এসেছে। মিলাকে দিয়ে আমি বাড়ির পরে বাড়ি গড়িয়েছি ভাঙিয়েছি। এর মধ্যে আমার নিজের স্বার্থ থাকলে মিষ্টি কথায় তাকে দিয়ে আমি আরও অনেক কাজ করিয়ে নিতে পারতাম। কিন্তু আমার উদ্দেশ্য ছিল মিলার সমগ্র দুষ্কৃতির প্রক্ষালন ক'রে তাকে শুদ্ধ মুক্তি ক'রে নেওয়া। অতএব দোষ আমার নেই। দামেমাকেই বা কি দোষ দেব? মাতৃভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে সে মিলার দুঃখে দুঃখ বোধ করেছে বলেই আমার মিলার প্রতি নিরন্তর কঠোরতায় সে ক্ষুব্ধ হয়েছে। কাজেই আমার নামাঙ্কিত জাল চিঠির সঙ্গে অন্যান্য অভিজ্ঞান পাঠিয়ে নোংডুনের বিশ্বাস উৎপাদন করেছে। অন্যায় কাজ সন্দেহ নেই; কিন্তু নিতান্ত নিরুপায় হয়েই সে বেচারি যা করেছে, তাতে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। সরল বিশ্বাসে নোংডুন যা কবেছে, তার জন্য তাকেও দোষ দেবো কেমন ক'রে? আমি চেয়েছিলাম মিলাকে নৈরাশ্যের শেষ সীমান্তে নিয়ে গিয়ে তাকে পরিপূর্ণভাবে পরিশুদ্ধ ক'রে নিতে। মিলা যে আমার কল্যাণের উদ্দেশ্য বুঝতে পারে নি, এজন্য তাকেও আমি দোষ দিতে পারি না। সত্যের পথ, ধর্মের পথ লাভ

করবার জন্য কোনরূপ প্রচেষ্টাই দোষাবহ নয়; অতএব জাল চিঠির সাহায্যে মিলার দীক্ষালাভের প্রচেষ্টাকেও অপরাধ বলে গণ্য করা চলে না। কিন্তু এর ফলে আমি যা চেয়েছিলাম তা হ'ল না। আমার কর্তব্য ছিল মিলাকে সর্বতোভাবে অসহায় ও নিরাশ্রয় ক'রে তোলা—উপায়হীন অক্ষমতার অতল তলে তলিয়ে দিয়ে তার মনের কালিমা ধুয়ে মুছে তাকে একান্ত ভাবে নিষ্পাপ ক'রে তোলা। আমার সে চেষ্টা যতবার ব্যর্থ হ'বার উপক্রম হয়েছে ততবারই আমার ব্যবহারে ক্রোধাভাস ফুটে উঠেছে। জাগতিক অর্থে বিক্ষুব্ধ-স্বার্থ-জনিত যে ক্রোধ—আধ্যাত্মিক ক্রোধ সে জাতের নয়। আমার মধ্যে যে ক্রোধের প্রকাশ সে আমার ক্রোধ নয়ঃ সে যেন জলের ঢেউ, জল থেকে উঠে জলেই মিলিয়ে গেছেঃ ব্যক্তিকে আঘাত করেনি, আঘাত করেছে ব্যক্তি বিশেষের অহঙ্কারকে, উদ্বুদ্ধ করেছে তার আত্মোন্নতিমুলক অনুতাপকে। তোমরা যদি আমার উদ্দেশ্যকে না বুঝে, আমার মধ্যে ক্রোধের প্রকাশ দেখে, মনে মনে সন্ত্রস্ত হয়ে থাকো, তাহলে আমি তোমাদের মঙ্গলের জন্য স্মরণ করিয়ে দিচ্ছি আমার ক্রোধের তাৎপর্য। নিষ্ঠা, বিশ্বাস, নির্ভরতা হারিও না, কারণ তোমরা আমার আত্মজ—আমার আধ্যাত্মিকতার সন্তান—আমার আত্মার আত্মীয়—সমস্ত সম্পদের উত্তরাধিকারী। আমার যা কিছু সব তোমাদেরই জন্য; কারণ আমার এ দেহের অন্য কোন কাজ আর অবশিষ্ট নেই। মিলা আমার পুত্রাধিক প্রিয়; তাকে অদেয় আমার কিছুই নেই। কিন্তু ইচ্ছা ছিল যে নয়বার চরম নৈরাশ্যের অগ্নিতে দগ্ধ ক'রে তাকে জন্ম-মরণের ঘূর্ণমান চক্র থেকে অব্যাহতি দিয়ে নির্বাণের পরিশুদ্ধ সত্বায় প্রতিষ্ঠিত করবো। বিধিলিপি অন্যরূপ না হ'লে দামেমার মাতৃহৃদয় তার পরিপন্থী হবে কেন? দামেমাকে আমি দোষ দিচ্ছি না—কিন্তু তারই করুণার প্রবাহ অসময়ে এসে আমার উদ্দেশ্যকে আংশিক ভাবে ব্যর্থ ক'রে দিয়েছে। তবে সে জন্যও খুব বেশি ক্ষতি হবে না, কারণ একে একে আটবার

পর্যন্ত আমি যে মিলাকে নৈরাশ্যের বেদনায় অভিষিক্ত করেছি, তাতেই গুরুতর অপরাধের বোঝা হাল্কা হয়ে গেছে : সামান্য যেটুকু অবশিষ্ট আছে, তার জন্য দুশ্চিন্তার আর প্রয়োজন নেই। ছোট ছোট দুঃখের দাহনেই সেটুকু নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে। মিলার পরমতম প্রাপ্তির কাল সমাগত হয়েছে। আমি স্থির করেছি, এবার তাকে আমার প্রাণপ্রিয় দীক্ষার সম্পদ দান করবো। এখন থেকে মিলার জীবিকার ও আধ্যাত্মিকতার সমগ্র দায়িত্ব আমি নিলাম। আমার এই আনন্দের দিনে তোমরাও আনন্দ করো।'

মিলার মনে হচ্ছিল এ যেন এক জাগ্রত স্বপ্ন। ভয় হচ্ছিল পাছে স্বপ্ন-ভঙ্গে আবার সেই চিরন্তন রূঢ় বাস্তব ফিরে আসে। এতটুকু অন্তরে এই আনন্দের সমুদ্র কেমন ক'রে তিনি ধারন করবেন—সেই চিন্তায় তিনি দিশেহারা হয়ে প'ড়েছিলেন। বজ্রাগ্নির মধ্যে এতখানি কুসুম-কোমলতা কেমন ক'রে লুকিয়েছিল! নোংড়ুন—যিনি গুরুকে বহু-ভাবে বহুবার জানবার সুযোগ পেয়েছিলেন, তিনিও কোনদিন মহর্ষি মার্পাকে এভাবে জানবার সুবিধা পান নি। দামেমা—যিনি মহর্ষি'র ধর্মপত্নীরূপে স্বামীর অনেক কথাই অন্তরঙ্গভাবে বিদিত ছিলেন, তিনিও এই প্রত্যক্ষ প্রকাশের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে আজ বুঝলেন যে এতদিন পর্যন্ত এই আলোকসামান্য মহাপুরুষের বাইরের ছদ্মবেশটাকেই সত্য বলে জেনেছেন। সকলেরই মনে হতে লাগলো এ যেন এক অলৌকিক আবির্ভাব—তথাগত বুদ্ধের আর একটি অভিনব স্বরূপোদ্ঘাটন। অসহ্য বিস্ময়ে বিরাট সভাঘর স্তব্ধ হয়ে রইলো।

সেই রাত্রেই, সুসজ্জিত বেদীমূলে, সর্বসমক্ষে মিলার দীক্ষা সমাপ্ত হ'ল। মুণ্ডিত মস্তকে, হরিদ্রাভ গৈরিক বস্ত্রে মিলাকে দেখে মহর্ষি মার্পা বললেন : 'তোমার এই বেশ, গুরু নারোপার কৃপায়, তোমার আগমনের পূর্বেই আমি ধ্যানযোগে প্রত্যক্ষ করেছিলাম।'

তান্ত্রিক সন্ন্যাসের ব্রত নিয়মাদি যথাযথ ভাবে নির্দেশ ক'রে গুরু

স্বয়ং মন্ত্রপূত কারণ-বারি প্রসাদী ক'রে মিলাকে পান করতে দিলেন এবং শাস্ত্র নির্দিষ্ট পন্থায় বাষট্টি দেবদেবীর ধর্মমণ্ডল গঠন ক'রে তান্ত্রিক যন্ত্রসমূহ সন্নিবিষ্ট করলেন। মিলাকে আসনে বসিয়ে দিব্যচক্ষু প্রদান করার সঙ্গে সঙ্গে মিলা গুরুর আদেশে আকাশের দিকে চেয়ে প্রত্যাশা করলেন চব্বিশটি পবিত্র স্থান, বত্রিশটি তীর্থক্ষেত্র এবং আটটি প্রধান শ্মশানভূমি এবং সমস্ত পুণ্যভূমির অধিদেবতা পরিবেষ্টিত দেবাদিদেবের মূর্তি। দেবমণ্ডলী সমস্বরে মিলাকে ঋষিত্বে বরণ করলেন। মন্ত্রায়ণিক তন্ত্রসমূহকে গুরু নিষ্কীলক ক'রে দিয়ে ধ্যানযোগের রহস্য বিবৃত ক'রে মহর্ষি মার্পা শিষ্যের ব্রহ্মতালুর উপরে নিজের পদ্মহস্ত ন্যস্ত ক'রে তাঁকে বললেন, 'হে পুত্র, তোমার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ যে এ-জন্মের নয়, সে সংবাদ আমি তোমার আগমনের পূর্বেই স্বপ্নযোগে জেনেছিলাম। তুমি একদা বৌদ্ধধর্মের স্তম্ভস্বরূপ হবে, তাতে আমার বা দামেমার কোন সন্দেহ নেই, কারণ আমরা উভয়েই যুগপৎ এই অভ্রান্ত স্বপ্নাদেশ পেয়েছিলাম। তুমি আমার গুরুর দান, কুলদেবতার দান বলেই তোমার আগমনের দিনে আমি নিজেই অগ্রবর্তী হয়ে তোমাকে আমন্ত্রণ জানাবার জন্য হলকর্ষণের ছলে মাঠের মধ্যে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলাম। আমার প্রদত্ত পাত্রাবশিষ্ট সমস্ত ছাং পান ক'রে এবং সমগ্র ক্ষেত্রটি কর্ষণ ক'রে তুমি তখনই তোমার ভবিষ্যতের পরিণতিকে সুস্পষ্ট ক'রে তুলেছিলে। তোমার প্রত্যেকটি কার্যকলাপে তোমার অজ্ঞাতসারে তুমি তোমার ভবিষ্যৎকে রূপায়িত করেছো। সবগুলি অগ্নিপরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে তুমি যে অনুপম ধৈর্য ও সহ্যশক্তির প্রমাণ দিয়েছো, সে কাহিনী পৃথিবীতে চিরদিন বেঁচে থাকবে। আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি যে দূরদূরান্তর থেকে দলে দলে মুমুক্ষু মানব তোমার পদপ্রান্তে এসে আশ্রয় নেবে এবং প্রত্যেকে তোমার হাতে তাদের পরমধন লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হবে। তোমার কাছে যারা আশ্রয় পাবে, তারা শাখা-পল্লবে বিস্তৃত হয়ে নিখিল বিশ্বে ব্রহ্মসেতু রচনা করবে।'

মহর্ষি মার্পার এই ভবিষ্যদ্‌বাণী শুনে সমবেত শিষ্য সম্প্রদায় জয়ধ্বনি ক'রে উঠলেন। মিলার মনে হ'ল, কেবল এমনি একটি দিন জীবনে সমাগত হবে, এই আশা নিয়ে জন্ম-জন্মান্তর ধরে তুষানলে দগ্ধ হওয়া যায়; মৃত্যু-সমুদ্র পার হয়ে যদি অমৃতের অধিকার মেলে তার জন্য অনন্তবার মৃত্যুযন্ত্রণা ভোগ করা যায়।

মিলার অত্যাশ্চর্য কঠোর তপস্যার প্রথম অধ্যায়েই একটানা এগারো মাস ধরে তিনি পৃথিবীর আলো-বাতাসের সংস্পর্শ ত্যাগ ক'রে, লোব্রাক-তাক্-নিয়ার অন্ধকার গুহায় ধ্যানযোগে নিমগ্ন হয়ে রইলেন। গুরুপ্রদত্ত খাদ্যপানীয় এককালে সঙ্গে নিয়ে, গুহার মুখ ভিতর থেকে নিজের হাতে গেঁথে বন্ধ ক'রে, প্রজ্বলিত দীপাধার মস্তকে ধারন ক'রে তিনি দীর্ঘকালের জন্য একাসনে তন্ময় হয়ে বসে থাকতেন। পদ্মাসনে ঋজুভাবে উপবেশন ক'রে তিনি নিজের মধ্যে তলিয়ে যেতেন। পৃথিবীতে আর কেউ কোথাও নেই; ক্ষুদ্র গুহার সীমাবদ্ধ জগতের বাইরে রূপ রসের পৃথিবীর বহুবিচিত্র আবেদন ব্যর্থ হয়ে ফিরে যেতো। মাথার উপরে জ্বলন্ত দীপ যখন তৈলাভাবে নির্বাপিত হয়ে যেতো, তখন ক্ষণিকের জন্য তাঁর দেহাত্মবোধ ফিরে আসতো। অত্যল্প কালের মধ্যে স্বল্পাহার গ্রহণ ক'রে, উত্তপ্ত আসন শীতল হবার পূর্বেই তিনি পুনরায় সেই জ্বলন্ত শিখা মাথায় নিয়ে নিজের মধ্যে ডুব দিতেন। এমনি ক'রে কাটলো দিনের পরে দিন, মাসের পরে মাস। দীর্ঘ এগারো মাসের মধ্যে বহির্জগতের সঙ্গে তাঁর কিছুমাত্র আদান-প্রদানের সম্বন্ধ রইলো না। এগারো মাস পরে সস্ত্রীক মহর্ষি প্রচুর খাদ্য-সামগ্রী নিয়ে প্রাচীরের বহির্দেশে উপনীত হয়ে মিলাকে চেতনার জগতে আহ্বান করলেন। বারংবার আহ্বানের পরে মিলার চৈতন্য ফিরে এলো বটে, কিন্তু বহির্জগতের এই আহ্বানকে খুশি মনে গ্রহণ করার মত মন আর ছিল না। তাই গুরুর ডাকে সাড়া দিয়েও তিনি স্থির হয়ে নিজের আসনে বসে রইলেন। নিজের হাতে গড়া প্রাচীর ভেঙে

বাইরের আলোয় ফিরে গিয়ে কি হবে—আমার নিজের জগত ছেড়ে কোথায় যাবো ? এই তো বেশ আছি ; সামান্য যেটুকু কাল নিজেকে নিয়ে আছি—এ আর কতটুকু ! সারা জীবনই তো বাইরে বাইরে কেটেছে : তবে এখন অসময়ে কেন এ আহ্বান ?

দামেমা বাইরে থেকে ডেকে বললেন, 'মিলা, তোমার গুরু তোমার মুখে সব কথা শুনতে চান ; তিনি তোমার জন্য সাগ্রহে অপেক্ষা করছেন ; তুমি আর কালবিলম্ব না ক'রে গুহার বাইরে বেরিয়ে এসো। জানো তো তোমার গুরুর গোপন-স্বভাব। নিজের হাতে যদি প্রাচীর ভাঙতে না পারো, বাইরে থেকে আমি তোমাকে সাহায্য করছি। গুরু যখন ডেকেছেন, তখন তোমার বিলম্ব করা উচিত নয়।'

অগত্যা অনিচ্ছা সত্বেও এগারো মাসের উত্তপ্ত আসন পরিত্যাগ ক'রে বাইরে আসতেই হ'ল। প্রণত শিষ্যকে বক্ষে ধারন ক'রে গুরু বললেন, 'বৎস তোমার আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করো।' দামেমাকে উদ্দেশ ক'রে উত্তম ভোজ্যের ব্যবস্থা করতে বলে গুরু-শিষ্য নিভৃতে গিয়ে বসলেন।

মিলা করজোড়ে তাঁর আধ্যাত্মিক অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন : হে প্রভু, অজ্ঞানের আধার এই দেহভূমিতে আপনি স্বয়ং বুদ্ধরূপে জ্ঞানের আলো জ্বেলেছেন। আপনারই কৃপায় আমার এই সত্যানুভূতি আপনার কাছে আমি নিবেদন করছি। আপনাকে দেবার মত কিছুই আমার নেই : তাই একমাত্র সম্বল, আমার নিজেকেই আমি আপনার চরণে অর্ঘ দিলাম। সর্ব জগতের সকল পুণ্যে আমার আনন্দ : আমার পুণ্যে সমগ্র বিশ্ব পরিতৃপ্ত হোক।

আমি জেনেছি রক্তমাংসে গঠিত এই দেহ অজ্ঞান হতে উদ্ভূত হয়েও চৈতন্যের জ্যোতিতে সমুদ্ভাসিত। নির্বাণের প্রয়াসী যারা, তারা এই মৃণ্ময় পাত্রেই মুক্তি মোক্ষের চিন্ময় সত্বাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারে ; আবার যেসব দুর্ভাগা এই দেহে পাপবৃত্তি রোপন করে, তারা এই

৬

দেহেরই কল্যাণে হীনগতি লাভ করে। এই দেহেরই স্তরে ঊর্ধ্ব, অধঃ দ্বিবিধ গতির সীমারেখা। এখনই এবং এই দেহেই, চিরন্তন কল্যাণ বা অসীম অকল্যাণের গন্তব্য পথ নির্ধারিত ক'রে নিতে হবে। আমি উপলব্ধি করেছি যে ঊর্ধ্ব যাত্রার পথে গুরুই একমাত্র সম্বল : তাঁর কৃপা ভিন্ন কিছুই হবার উপায় নেই। এ পথে যে নিজের ব্যক্তি-গত শান্তি বা সুখের প্রয়াস করে, সে হীনযানের পথিক, আর যে নিজের চিন্তা বিসর্জন দিয়ে গোড়া থেকেই অপরের প্রতি প্রেম ও করুণায় বিকশিত হয়, সেই মহাযানের যাত্রী। আত্মজিজ্ঞাসায় ও আন্তরিক অনুসন্ধানের চরম প্রচেষ্টায় মন যখন কেন্দ্রাভিমুখী হয়, তখনই ধীরে ধীরে অহংয়ের বিলুপ্তি ঘটে ; মন যখন একেবারে নিস্তরঙ্গ হয়ে যায়, তখনই ভাবনা চিন্তা ধারণাদির উচ্ছেদ হয়, এবং তখন কালের বোধ আর একেবারেই থাকে না। তার মধ্যেও যে ক্ষীণ বোধটুকু জেগে থাকে—সেই পরম চৈতন্যের শিখাটুকু অবলম্বন ক'রেই পূর্ণ আনন্দের ও সত্যস্বরূপের মর্মস্থলে প্রবেশ করতে হয়। কিন্তু দিব্য-চৈতন্যের এই স্তরে আর জৈবিক মনের অস্তিত্বটুকুও অবশিষ্ট থাকে না। দিব্যদর্শনের নিজস্ব কোন মূল্য নেই : মন যে ধ্যানে নিবিষ্ট হয়ে আছে—কেবল এইটুকুই সে দেখিয়ে দেয়।

মন শান্ত হ'য়ে যাবার পরেও উৎসাহ, বিশ্লেষণ শক্তি ও আত্ম-জিজ্ঞাসার প্রয়োজন আছে। রূপ বা অরূপ, পূর্ণতা বা শূন্যতা—ধ্যানের বিষয় যাই হোক না কেন—তার পাশাপাশি সকলের মঙ্গল হোক—বিশ্বের কল্যাণ হোক—এই বোধটি জাগিয়ে রাখতে হয়। একান্ত ভাবে সর্বজীবের প্রতি প্রেম ও প্রসন্নতার চিন্তা জাগিয়ে রাখলে তবেই শুদ্ধ চিত্ত চিন্তার অতীত লোকে উঠে গিয়ে শ্রেষ্ঠ গতি লাভ করে। মুহুর্মুহুঃ এই চিন্তাশূন্যতার সমুদ্রে অবগাহন করতে করতে তবেই এ অবস্থাটি স্বাভাবিক হয়ে ওঠে। এই শূন্যতা রিক্ততা নয়, জড়তা নয়, নিষ্ক্রিয়তা নয়। দেহবোধশূন্য, আত্মজ্ঞানবিবর্জিত এই সত্তা শুদ্ধ বুদ্ধ

পরম পবিত্র—অনির্বচনীয়। এই চরম পরিণতিই বজ্রযান। আপনার কৃপায় ও আমার মাতৃসমা গুরুমায়ের কৃপায় আমি এই চরম অবস্থার আস্বাদ পেয়েছি। এ ঋণ পরিশোধ করবার সামর্থ্য আমার নেই; আপনার আশীর্বাদে যেন চিরদিনের জন্য এই সমাধিযোগেই আমি অবস্থান করতে পারি।'

মিলার বিবৃতি শেষ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষি মার্পা তাঁকে সানন্দে বুকে জড়িয়ে ধরে আশীর্বাদ করলেন, দামেমাও আনন্দের অতিশয্যে চোখের জল মুছতে লাগলেন। মহর্ষির অনুমতি পেয়ে মিলা আবার তাঁর নির্জন দুর্গে প্রবেশ ক'রে প্রবেশপথ নিজ হস্তে অবরুদ্ধ করলেন এবং নশ্বর দেহটি যোগাসনে ন্যস্ত ক'রে পূর্বের মতই নিজের অন্তরের গভীর অতলে ডুব দিলেন। এখন আর তাঁর মাথার উপরে প্রজ্জ্বলিত শিখা ধারনের প্রয়োজন ছিল না, কারণ অন্তরের শিখাটি নিজের আলোকে বুঝি নিজেই ভাস্বর হয়ে উঠেছিল। এবার আর অত আয়াস প্রয়াসের আয়োজন ছিল না; লঘুপক্ষ স্বচ্ছন্দগতিতে তিনি আত্মলোকে অবগাহন ক'রে নিজেকে হারিয়ে স্থির হয়ে গেলেন। প্রায়ান্ধকার গুহা উজ্জ্বল হয়ে উঠলো তাঁর দেহের দীপ্তিতে। দিনের পরে দিন কাটতে লাগলো, মাসের পরে মাস। ওদিকে গুরু দৈবাদেশে বহুদিনের জন্য ভারতবর্ষে প্রয়ান করলেন এবং বহু দেশ পর্যটন ক'রে বহু গ্রন্থ আহরণ ক'রে তিব্বতে ফিরে এলেন।

বহির্জগতের কোন খবরই মিলার নিভৃতলোকে প্রবেশ করতে পারতো না, কিন্তু গুরুর প্রত্যাবর্তনের কিছুদিন পরে অকস্মাৎ একদিন রুদ্ধ দ্বার মুক্ত ক'রে মিলা গুরুর দরবারে এসে দেখা দিলেন। তাঁর এই অপ্রত্যাশিত আগমনে উৎকণ্ঠিত হয়ে গুরু বললেন, 'একি! এভাবে আসন ছেড়ে তুমি যে উঠে এলে?'

ধ্যানযোগে মিলা যে অত্যাশ্চর্য দর্শন লাভ করেছিলেন, সে-কথা গুরুর কাছে নিবেদন ক'রে, তার অর্থ জানতে চাইলেন। গুরু বললেন,

'এ অতি দুরূহ গূঢ় তত্ত্ব ; এ সম্বন্ধে আমিও সম্যক অবগত নই। তবে, আমি জানি ভারতবর্ষে গিয়ে অনুসন্ধান করলে এই সমস্যার সমাধান করা যাবে। আমার গুরুদেব নারোপার মুখে আমি এর উল্লেখ শুনেছিলাম। আমার সংগৃহীত পুঁথির মধ্যে হয়তো বা এর খানিকটা সন্ধান পাওয়া যাবে।'

সারাদিন সারারাত্রি ধরে দুজনে সমস্ত পুঁথি অনুসন্ধান ক'রেও সে তত্ত্বের কোন সন্ধান পাওয়া গেল না। কিন্তু সমস্যা যখন উঠেছে তখন তার সমাধান না পাওয়া পর্যন্ত স্থির হয়ে থাকা মহর্ষির স্বভাববিরুদ্ধ ; তাই সুদূর ভারতবর্ষে আবার পাড়ি দিতে হবে। শিষ্যগণ সমস্বরে এর বিরুদ্ধে রায় দিলেন, কারণ মহর্ষি মার্পার দেহ তখন বার্ধক্য-প্রপীড়িত। কিন্তু তত্ত্বদর্শী মহর্ষির কাছে তত্ত্বের চেয়ে বড় আর কিছুই নেই, অতএব সবাইকার প্রতিবাদের বিরুদ্ধেই তিনি সত্যানুসন্ধানের কঠিন পথে যাত্রা করবার সঙ্কল্প ক'রে তাঁর যা কিছু ছিল, সমস্ত নির্বিচারে বিক্রয় ক'রে, যথেষ্ট পরিমাণ স্বর্ণমূল্য আহরণ করলেন এবং এই রাজৈশ্বর্য নিয়ে ভারতবর্ষের পথে নিজের প্রাণ পণ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন।

পূর্ণসিদ্ধ মহাগুরু নারোপার যে মৃত্যু নেই, সে-কথা তাঁর সিদ্ধিপ্রাপ্ত শিষ্যেরা সকলেই জানতেন। জরাগ্রস্ত দেহকে পরিত্যাগ ক'রে তিনি অন্য দেহে প্রবেশ ক'রে অবস্থান করতেন। অতীন্দ্রিয় সূক্ষ্ম সত্তার কাছে কোন অবস্থাই অনধিগম্য ছিল না : সামান্য একটু ইচ্ছার স্ফুরণেই তিনি দেশকাল অতিক্রম ক'রে, যে কোন স্থানে যে কোন ভাবে অবস্থান করতে পারতেন। ভারতবর্ষে পৌঁছে মার্পা এক অরণ্যে প্রবেশ করলেন এবং সেই নির্জন প্রদেশেই গুরুর সাক্ষাৎ পেলেন। শিষ্যের প্রশ্নে বিস্মিত হয়ে মহর্ষি নারোপা জিজ্ঞাসা করলেন : 'এ প্রশ্ন কি তোমার নিজের ?' মার্পা বললেন—'না প্রভু। এ আশ্চর্য দর্শন আমার নিজের নয়। আমারই এক শিষ্য, তার নাম মিলা—এ দিব্য-

দর্শন তারই ঘটেছে। কিন্তু আমি নিজে এর অর্থভেদে অক্ষম; তাই সমস্যা সমাধানের জন্য আপনার কাছে ছুটে এসেছি।'

মিলার নাম শোনার সঙ্গে সঙ্গেই মহর্ষি নারোপা বিহ্বল হয়ে কিছুক্ষণের জন্য চোখ বুজে স্থির হয়ে রইলেন। মধুর স্বরে বললেন, 'আমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, বিকৃত তন্ত্রাচারের ভূমি তিব্বতে নবসূর্যের প্রকাশ হয়েছে: হিমালয়ের শিখরে শিখরে ঝল্‌মল্‌ করছে তার অনুপম জ্যোতি। তোমার সাধনার শাখা এই মিলার দ্বারাই শিষ্য-পরম্পরায় সুরক্ষিত হবে। তোমার নিজের পুত্রের ভরসা কোরো না। মিলাই তোমার আধ্যাত্মিকতার পরিবাহক: সমগ্র তিব্বতে তার প্রভাব ও বাণী পরিব্যাপ্ত হবে। মিলারেপার নাম চিরদিন ধরে সেখানে বিরাজ করবে।'

গুরুশিষ্যে আরও অনেক কথা হ'ল। মিলার উত্থাপিত প্রশ্নের উত্তর সবিস্তারে জেনে নিয়ে, প্রয়োজনীয় পুঁথির বোঝা সংগ্রহ ক'রে মার্পা যথাসময়ে তিব্বতে ফিরে এলেন। এসে দেখলেন ধর্ম দোদে, মহর্ষি মার্পার একমাত্র বংশধর, মৃত্যুশয্যায় শায়িত। সমুদ্রের একটি বুদ্বুদ নিশ্চিহ্ন হ'লে সমুদ্রের যেমন বোধ হয়, তার অতিরিক্ত কোন রকম বোধই হয়তো-বা মহর্ষি মার্পার হ'ল না। সহাসমারোহে ধর্মসভার অধিবেশন শুরু হ'ল। প্রত্যেকবারের মত অনুষ্ঠান হ'ল সর্বাঙ্গসুন্দর। চোখের জল মুছে দামেমাও যন্ত্রের মত উৎসব-পরিচালনায় সর্বতোভাবে সহায়তা করলেন। পিতা মার্পাকে অতিক্রম ক'রে গুরু মার্পাই যে সগৌরবে প্রাধান্য লাভ করেছে—এ সত্য সকলের চোখেই প্রতিভাত হতে লাগলো। ধর্ম দোদে ছিলেন মহর্ষির দক্ষিণ হস্ত স্বরূপ; ধর্ম-সাধনার ক্ষেত্রেও তিনি কৃতিত্ব বড় কম অর্জন করেন নি: অতএব ঋষি পিতার তিরোধান ঘটলে তিনিই যে কার্‌গুৎপ ধর্মশাখার প্রধান রূপে পিতার স্থানে অভিষিক্ত হবেন—সে বিষয়ে কারুর মনে সন্দেহ ছিল না। ধর্ম দোদের অকালমৃত্যুতে এই ধর্মশাখার ভবিষ্যৎ চিন্তায় সকলেই অন্ধ-

বিস্তর উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠেছিলেন। কিন্তু সকলের সব উৎকণ্ঠা ও দুশ্চিন্তার মাঝখানে মহর্ষি মার্পা'র মধ্যে এতটুকু ভাবান্তরও দেখা গেল না। তিনি বললেন, 'আমার পুত্রের আসন্ন মৃত্যুর ইঙ্গিত আমি মহাগুরু নারোপার কাছে ইতিপূর্বেই পেয়েছি। আমার শিষ্যদের মধ্যে কে কোন্ পথে যাবে, সে ব্যবস্থা তিনিই করবেন; সেজন্য কারুর কোন দুর্ভাবনা নেই। তোমরা যে যা স্বপ্ন দেখবে—তার মধ্যেই থাকবে তোমাদের পথের নির্দেশ। তোমাদের স্বপ্ন-বিবরণের বর্ণনা থেকেই সে ইঙ্গিত সকলের কাছে সুস্পষ্ট হয়ে উঠবে।'

কয়েকদিন ধরে চললো স্বপ্নজিজ্ঞাসা। মিলা দেখলেন বিচিত্র এক স্বপ্ন: 'অত্যুঙ্গ এক গগনস্পর্শী পর্বতের চূড়া, তার শিখরের চারি-পাশে প্রদক্ষিণ করছে সূর্য চন্দ্র—জ্যোতি ছড়িয়ে পড়েছে আকাশের গায়ে; অনন্তপ্রসারী সেই গিরিরাজ সমগ্র পৃথিবীর বুক জুড়ে অচলায়তনের মত বিরাজিত। তার চারিদিক থেকে চারটি বিপুল ধারা নেমে এসেছে এবং মহাসমুদ্রে গিয়ে মিশেছে। অগণিত তৃষাতুর নরনারী অঞ্জলি ভরে সেই বারিধারা পান ক'রে পরিতৃপ্ত হয়ে দলে দলে ফিরে চলেছে: মহাসমুদ্রের তীরে তীরে পুঞ্জে পুঞ্জে ফুলের মেলা।'

মিলার মুখে সুদীর্ঘ স্বপ্নবৃত্তান্ত শ্রবণ ক'রে মহর্ষি দামেমাকে ডেকে আর একপ্রস্থ উৎসবের আয়োজন করতে বললেন। সমগ্র শিষ্যমণ্ডলির সমক্ষে এই রহস্যময় স্বপ্নের মর্মকথা ব্যাখ্যা ক'রে মহর্ষি বললেন, 'সারা জীবনের তপস্যার শেষে এই পুণ্যময় পরিণতির অপেক্ষাতেই আমি ছিলাম। আমার কর্ম সফল হয়েছে; আমার ধর্মশাখার সুযোগ্য শিষ্য মিলার হাতেই আমি দিলাম আমার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব। আমার আজীবনের তপস্যা যদি সত্য হয়, তাহলে আমার এই ভবিষ্যদ্বাণী কখনোই মিথ্যা হবে না। আর, আমার যারা শিষ্য তারা সকলেই চরম সম্পদের অধিকারী হয়ে এ জন্মেই নির্বাণের অমৃত পথ লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হবে। এখন থেকে কে কোন্ পথে চলবে সেও আমি নির্দেশ ক'রে দিয়ে

আমার শেষ কর্তব্য সম্পাদন করবো।' সারাজীবন ধরে বহু আয়াসে মাপা যে সমস্ত অমূল্য পুঁথিপত্র সংগ্রহ করেছিলেন, সে সমস্তই তিনি অধিকারী ভেদে সকল শিষ্যের মধ্যে বণ্টন ক'রে দিলেন এবং সেই দিন থেকে দিবারাত্রি ধরে একটানা স্রোতে বহুবিধ দানের পর্বে মহর্ষির আবাসস্থল যেন জ্ঞানবিজ্ঞানের তপোবন হয়ে উঠলো।

গুরুর আদেশে মিলা কাছাকাছি এক গুহায় কয়েক বৎসর পর্যন্ত তপস্যায় ডুবে রইলেন। আহার নিদ্রার প্রয়োজন ছিল না বললেই হয়; কিন্তু গুরু ও গুরুপত্নীর নির্বন্ধাতিশয্যে নিয়মিত ভাবে তাঁকে আহার করতেই হত। একাসনে স্থিরভাবে বসে দিনের পর দিন নির্বিকার ভাবে কেটে যেতো। কখন সূর্য উঠতো এবং দিনের শেষে কখন যে আবার সমগ্র গগনমণ্ডল পরিভ্রমণ ক'রে দিনের সূর্য অস্তাচলে প্রয়ান করতো সে সংবাদও তাঁর মানসলোকের অগোচর রয়ে যেতো। বর্তমান অতীত ভবিষ্যৎ যেন একাকার হয়ে থাকতো। কিন্তু একদিন অকস্মাৎ ঘটলো এক ব্যতিক্রম। ভোরের দিকে আসনে বসেই তিনি ঘুমে অচেতন হয়ে গেলেন; স্বপ্নে দেখলেন বহুদিনের ভুলে-যাওয়া শৈশবের আবেষ্টন যেন মূর্ত হয়ে চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। দেখলেন, পৈত্রিক গৃহখানি চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে আছে, বহুস্মৃতি-বিজড়িত ভূমিখণ্ড আগাছায় পরিপূর্ণ, মায়ের পরলোক প্রাপ্তি হয়েছে, অনাথা বোনটি নিরাশ্রয় হয়ে সংসারের স্রোতে ভেসে ভেসে বেড়াচ্ছে। স্বপ্নের ঘোরেই অতীত জীবনের মর্মন্তুদ স্মৃতিসমুদ্র উদ্বেল হয়ে উঠলো: সুদূর অতীতে অসহায় অবস্থায় মা বোনকে পিছনে ফেলে যেদিন বাধ্য হয়ে ঘর ছেড়ে অনিশ্চিতের সন্ধানে বেরিয়ে এসেছিলেন, সেই অতি দুঃখের দিনটি যেন মূর্ত হয়ে বিভীষিকার মত চোখের সামনে জেগে উঠলো। জেগে উঠে দেখলেন চোখের জলে গাত্রবস্ত্র পর্যন্ত ভিজে উঠেছে। স্বপ্নের কথা মনে হতে তখন আবার ব্যাকুল হয়ে নতুন ক'রে কাঁদতে বসলেন। মনকে বারংবার প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেন, বোঝাবার

চেষ্টা করলেন স্বপ্ন স্বপ্নই—বাস্তব নয়, মা হয়তো জীবিতই আছেন, জীবনের বোঝা বয়ে কায়ক্লেশে কোনরকমে টিকে আছেন, হয়তো এখনো ফিরে গেলে তাঁকে একবার শেষবারের জন্য চোখের দেখা সম্ভব হতেও পারে। মিলা ভুলে গেলেন যে তিনি যোগী, সিদ্ধতপস্বী, তাঁর মনোনাশ হয়ে গেছে। আত্মসংবরণ করতে না পেরে তিনি ক্ষিপ্রকরে সাধনগুহার প্রাকার ভেঙে গুরুসন্নিধানে উপস্থিত হলেন। গিয়ে দেখলেন গুরু তখনো নিদ্রিত। সুপ্ত গুরুর শিয়রে দাঁড়িয়ে তিনি অনুচ্চ কণ্ঠে নিজের বক্তব্য নিবেদন করলেন। সঙ্গে সঙ্গে গুরু চোখ মেলে চেয়ে, মিলাকে তদবস্থায় দেখে তাঁর অসন্তোষ জ্ঞাপন ক'রে বললেন, 'এ কি কাণ্ড? অসময়ে সাধন-গুহা ছেড়ে এসে মোটেই ভাল করনি; এতে সাধনার বিঘ্ন ঘটা কিছু বিচিত্র নয়। এখনই গুহায় ফিরে যাও!'

মিলা বললেন, 'প্রভু, আমার মন বড় চঞ্চল হয়েছে। কতদিন পর্যন্ত আমার মায়ের কোন সংবাদ রাখি না, তিনি বেঁচে আছেন কি না তাও জানি না। এই নিদারুণ কর্তব্যচ্যুতির কথা মনে হয়ে কিছুতেই শান্তি পাচ্ছি না। দুঃস্বপ্নের পীড়নে আমার অন্তর ব্যথিত হয়ে উঠেছে। কেবলই মনে হচ্ছে, নিদারুণ পীড়নের মুখে মাকে ফেলে রেখে পালিয়ে এসেছি। আপনার আদেশ পেলে এতদিন পরে একবার কয়েকটি দিনের জন্য ঘরে ফিরে যাই।'

বলতে বলতেই মিলা লক্ষ্য করলেন শিয়রের জানালার ফাঁক দিয়ে নবারুণের প্রথম আলোর ছটা মহর্ষি মার্পার মহিমান্বিত ললাটের চারিপাশে বিচিত্র জ্যোতির্মণ্ডলের সৃষ্টি ক'রে রেখেছে। সঙ্গে সঙ্গে মহর্ষির প্রাতরাশের আয়োজন হাতে নিয়ে মূর্তিমতী পবিত্রতার মত দামেমাও সেই কক্ষে এসে প্রবেশ করলেন।

স্থিরভাবে মিলার প্রার্থনা আদ্যোপান্ত শুনে মহর্ষি বললেন, 'তোমার মন যখন এতই উতলা হয়েছে, তখন তোমাকে আমি বাধা দিতে চাই না। কিন্তু এতদিন পরে ফিরে গিয়ে তুমি যে তোমার

জননীকে জীবিত দেখতে পাবে, তা আমার মনে হয় না : যাদের জন্য তুমি চিন্তিত হয়েছ, তাদেরও যে সুস্থ অবস্থায় দেখতে পাবে সে আশা করা বৃথা। তোমার হয়তো মনে আছে, যখন প্রথম এখানে এসেছিলে, তখন আমাকে বলেছিলে যে ঘরের টানে তুমি কোনদিনই উতলা হবে না ; কিন্তু কার্যকালে এখন দেখা যাচ্ছে যে ঘরে ফেরবার জন্য তুমি ব্যাকুল হয়েছো। যাবার আগে তোমাকে জানিয়ে দিতে চাই যে তোমায় আমায় এ জীবনে এই শেষ সাক্ষাৎ। তুমি আমার ঘরে এসে আমাকে যে নিদ্রিত দেখেছিলে, তাতেই সূচিত হয়েছে আমার চিরনিদ্রার ইঙ্গিত। তার পরেই যে সূর্যোদয়কে প্রত্যক্ষ করেছো, সে তোমারই যশোরশ্মির দ্যোতক। আর আমার মাথার চারিপাশে দেখেছো যে জ্যোতির্মণ্ডল, তার অর্থ হ'ল এই যে আমার এই ধর্মশাখা দিনে দিনে সমৃদ্ধি লাভ ক'রে বহুদূরপ্রসারী হয়ে সমগ্র তিব্বতে ছড়িয়ে পড়বে। বৎস, তোমার বিদায়ে আমার বক্ষ বিদীর্ণ হচ্ছে ; কিন্তু তা নিয়ে অনর্থক শোক ক'রে লাভ নেই, কারণ নিয়তির শাসন অমোঘ। আমি যে আমার পাত্র উজাড় ক'রে তোমাকে সাধনার ঐশ্বর্য প্রদান করেছি, সে বিষয়ে কোন দ্বিধা মনে স্থান দিও না। তথাপি আরও কয়েকটি দিন যদি অপেক্ষা ক'রে যাও, তা হ'লে আমার শেষ দানও তোমাকে পরিপূর্ণভাবে দিয়ে যেতে পারি।'

যে কয়দিন মিলা গুরুর কাছে রইলেন তারই মধ্যে মহর্ষি মার্পা তাঁকে নিয়মিতভাবে ব্রহ্মবিদ্যার শেষ শিক্ষাগুলি একে একে প্রদান করলেন। গুরুপ্রদত্ত জ্ঞানভাণ্ডার প্রিয়তম শিষ্যকে নিঃশেষে প্রদান ক'রে মহর্ষি মার্পা বললেন, 'আমার যা কিছু ছিল সমস্ত তোমাকে দিয়েছি, কারণ তোমার চেয়ে প্রিয় আমার আর কেউ নেই। এখন যা বলছি সে আমার সমগ্র তত্ত্বের শেষ কথা—তুমি স্মরণে রেখো। বাসনার পরিণতি দুঃখে ; পরিদৃশ্যমান যা কিছু—তাকেই সেই পরমবস্তু বলে কখনো যেন ভুল কোরো না ; বহুবৃক্ষে যে ফল ফলে—তাই

মোক্ষ ফল নয়। জাগতিক জ্ঞানের সমষ্টি সত্য জ্ঞান নয়, অনেক জানলেই সত্যকে জানা হয় না; অনেক বলাতেও কোন লাভ নেই। প্রকৃত সম্পদ যদি চাও—তাহলে কেবল সেই বস্তু সঞ্চয় করো, যাতে হৃদয় সমৃদ্ধ হয়,—যাতে অধোগামী ভাবনিচয় পরমপথের অন্তরায় না হয়। যদি নির্ভয় হতে চাও, তবে এই পথের সন্ধান করো, কারণ বাসনামুক্ত চিত্তই রাজৈশ্বর্যের অধিকারী। পিছনে পড়ে থাক এই দুঃখভারাক্রান্ত অশ্রুসজল সংসার; নির্জন গুহার নিঃসঙ্গতাকে বরণ করো: সেইখানেই গড়ে তোলো তোমার মৌনতার স্বর্গ। নিজের মধ্যে অধিষ্ঠিত হয়ে, নিজের দেহে প্রতিষ্ঠিত কর দেবভূমি।'

মার্পা বললেন, 'আমার সর্বস্ব আমি তোমার হাতে সমর্পণ করেছি। এ বিদ্যা আমার নয়, তোমারও নয়: এ চিরদিনের গুপ্ত-বিদ্যা, অনন্তকালের গচ্ছিত ধন,—গুরুপরম্পরায় প্রবাহিত মহাতত্ত্ব। কোনরূপ স্বার্থবুদ্ধির সংস্পর্শ এর মধ্যে থাকবে না। এ বিদ্যা যোগ্য-পাত্রে হস্তান্তরিত করবার দায়িত্ব তোমার। আমার গুরুদেব নারোপাকে কঠিনতম পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে এই বিদ্যার অধিকার লাভ করতে হয়েছিল, আমাকেও বড় কম পরীক্ষা দিতে হয় নি, তুমি নিজেও তোমার প্রাপ্য সহজে লাভ করো নি। কিন্তু তোমার সম্মুখে যে যুগ, সেখানে আর এই প্রাচীন প্রথা চলবে না। ক্ষীণপ্রাণ যারা তাদের জন্য এ পথ নয়। অতএব এ যুগের শিষ্যের প্রতি পূর্বেকার কঠোরতা প্রয়োগ করা আর সঙ্গত হবে না।'

গুরুর কৃপায় মিলারেপা বহু নিগূঢ় দর্শনের অধিকার লাভ করলেন; মহাগুরু মার্পা তাঁকে স্ব-স্বরূপে দেখা দিলেন, বহুচিহ্ন-সমন্বিত সেই মহাজ্যোতির্ম্ময় অত্যাশ্চর্য মহিমার প্রকাশ প্রত্যক্ষ ক'রে মিলা করজোড়ে গুরুরূপী মহাশক্তির স্তব করলেন। গুরু বললেন, 'তোমার সঙ্গে আর আমার এ জীবনে দেখা হবে না, তাই এই সব অতি অলৌকিক বিভূতি শেষবারের জন্য তোমাকে দেখালাম। তোমার হাতে এই

আমার শেষ দান। আমার হৃদয়ে তুমি রইলে, তোমার হৃদয়েও আমি রইলাম। দেহাতীত অন্তরলোকে আবার আমাদের দেখা হবে। আমি জ্ঞানদৃষ্টিতে দেখতে পাচ্ছি, তোমার সাধনার একটি স্তরে তোমাকে একটি বিষম শঙ্কটে পড়তে হবে। সেই অবস্থার জন্য রইলো আমার এই সংরক্ষিত নির্দেশ। এ-লেখা তুমি সযত্নে রেখে দিও এবং যথা-সময়ে খুলে পোড়ো।'

কথা শেষ ক'রে গুরু দামেমাকে ডেকে বললেন, 'মিলা কাল চলে যাবে, তার উপযুক্ত ব্যবস্থা করো : ওকে ছেড়ে ফিরে আসতে আমার যথেষ্ট কষ্ট হবে—কিন্তু তবু কিছুদূর পর্যন্ত ওর সঙ্গে গিয়ে আমি পথে এগিয়ে দিয়ে আসবো।'

দামেমা উদ্‌গত অশ্রু কোনমতেই গোপন করতে পারলেন না। মিলার বিদায়ের কথা শোনার সঙ্গে সঙ্গেই আর্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠলেন। মহর্ষি সান্ত্বনা দিয়ে বললেন, 'কাঁদছো কেন দামেমা? তোমার পুত্র পরিপূর্ণ সত্য লাভ করেছে এবং তপস্যার জন্য নির্জন-বাস করতে চলেছে। তুমি বহুবার যে আশীর্বাদ ওকে করেছো, এখন সেই আশীর্বাদই সফল হতে চলেছে। তবে তোমার এই শোকোচ্ছ্বাসের হেতু কি? প্রত্যেক মানুষের মধ্যে বুদ্ধ লুকিয়ে আছেন; তথাপি জন্মের পর জন্ম ব্যর্থ হয়ে যায়, বুকের বুদ্ধ বুকেই ঘুমিয়ে থাকেন। এই সব দুর্ভাগা মানুষদের জন্য কাঁদতে চাও—তাতে বাধা দেবার কিছু নেই। কিন্তু এ ক্ষেত্রে তো শোকের কিছুমাত্র হেতু নেই।'

জননী দামেমা কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'তুমি বলছো মহৎ দুঃখের কথা : সে সামর্থ্যই আমার নেই। আমি মা, মিলা আমার পুত্র। একটি পুত্র এই সেদিন আমাকে চিরদিনের জন্য ছেড়ে গেছে : মিলার মুখের পানে চেয়ে আমি সে দুঃখ ভুলেছি। এখন সেই মিলাও চলেছে : আমার মন বলছে এও চলেছে চিরদিনের জন্য। আমি কেমন ক'রে অশ্রু সম্বরণ করবো—তুমি আমাকে বলে দাও।'

দামেমা আর্তস্বরে কেঁদে উঠলেন, মিলাকে দু-হাতে জড়িয়ে ধরে তিনি ব্যাকুল হয়ে রোদন করতে লাগলেন। মহর্ষি আর কিছুই বললেন না; তাঁরও দু-চোখ দিয়ে অশ্রুজল ঝরে পড়তে লাগলো। শেষ রাত্রিটি মিলা মহর্ষি মার্পার শয়ন কক্ষেই অতিবাহিত করলেন; কিন্তু আসন্ন বিদায়ের গভীর মর্মবেদনার মাঝখানে আর কথাবার্তা প্রায় কিছুই হ'ল না।

সূর্যোদয়ের পূর্বেই, প্রত্যূষের অস্পষ্ট আলোকে মহর্ষি মার্পার তপোভূমি পিছনে রেখে, মিলা সন্ন্যাসের অনির্দিষ্ট পথে বেরিয়ে পড়লেন। সশিষ্য মহর্ষিও প্রিয় শিষ্যের সঙ্গে সঙ্গে বহুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। বন্ধুর পথ একটি পর্বতকে বেষ্টন ক'রে যেখানে আর একটি বিশালকায় পর্বতের সানুদেশে বৃহৎ চড়াইয়ের মুখোমুখি এসে থেমে গেছে—যাত্রীদল সেইখানে থেমে গেলেন। এইখান থেকেই শেষ বিদায় নিয়ে মহর্ষি মার্পা নিজের আশ্রমে ফিরে যাবেন; মিলা চলবেন তার আপন একক পথে। অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে মহর্ষি আর একবার মিলার ভূলুণ্ঠিত দেহ বক্ষে ধারন ক'রে বললেন, 'হে পুত্র—আমি আশীর্বাদ করি তুমি বুদ্ধত্বে অধিষ্ঠিত হও: নরদেহে যা কিছু লাভ করা যায় সে সমস্ত লাভ ক'রে কৃতকৃতার্থ হও: বসুন্ধরা তোমার স্পর্শে ধন্য হোক।'

দামেমা বহুকষ্টে আত্মসম্বরণ ক'রে কম্পিত কণ্ঠে পুত্রাধিক প্রিয়তর শিষ্যের হাতে সযত্নে আনীত পাথেয়ের বোঝাটি তুলে দিলেন। কম্পিত স্বরে বললেন, 'মনে রেখো তোমার দুঃখিনী মাকে: আমার আশীর্বাদ যেন তোমার দুর্গম পথযাত্রাকে সুগম করে!'

যতদূর দেখা যায় মিলা চলতে চলতে সতৃষ্ণ-দৃষ্টিতে ফিরে ফিরে দেখতে লাগলেন—মহর্ষি মার্পাকে মাঝে নিয়ে ক্ষুদ্র দলটি পার্বত্য পথ দিয়ে ফিরে চলেছে। বারংবার তাঁর মনে হতে লাগলো—'ফিরে যাই, কি হবে এতকাল পরে ঘরে ফিরে? সেখানে গিয়ে কি দেখবো

কে জানে? ফিরে এসে যদি গুরুকে আর দেখতে না পাই—সে অনুশোচনা আমাকে আমরণ সহ্য করতে হবে।' কিন্তু নিয়তি যেন তাঁকে দুর্বার গতিতে সমুখের পানে টানতে লাগলো। অনেকদূর ওঠার পরে পরিশ্রান্ত হয়ে আর একবার পিছনের দিকে তাকিয়ে দেখলেন প্রত্যাবর্তনকারী দলটি কয়েকটি অস্পষ্ট বিন্দুর মত ঝাপ্‌সা হয়ে গেছে: তাদের মধ্যে গুরুকে বা গুরুমাকে আর আলাদা ক'রে চেনবার উপায় নেই। দূর-দূরান্তের পর্বতশিখরে খণ্ড খণ্ড মেঘের মত কুয়াশার পুঞ্জগুলি বায়ুবেগে চালিত হয়ে ধীরে ধীরে পিছনের পটভূমিকাকে আচ্ছন্ন ক'রে ওদিকের পৃথিবীকে ক্রমেই দুর্নিরীক্ষ্য ক'রে তুলছে। মেঘমলিন বিশাল গগনের দিকে চেয়ে তিনি স্তম্ভিত ভাবে কিছুক্ষণ স্থির হয়ে সেইখানেই দাঁড়িয়ে রইলেন। চোখে জল এলো, জামার হাতায় মুছে ফেললেন। দৃঢ়পদে কয়েক ধাপ এগিয়ে গিয়ে আবার পিছনের দিকে চেয়ে দেখলেন। ততক্ষণে সেই অস্পষ্ট বিন্দুগুলি নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেছে: পিছনের আকাশ ধূসর কুয়াসায় সমাচ্ছন্ন হয়ে একাকার হয়ে গেছে; হারিয়ে গেছে তাঁর এতদিনের অধিকৃত আপন জগৎ। গুরুকে ছেড়ে আসার দুঃখ, গুরুমাকে ফেলে আসার বেদনাও যেন হাল্কা হয়ে কোথায় ভেসে গেছে। হঠাৎ মিলার মনে হ'ল, এও ছিল আর একটি বন্ধন: ঠিক সাংসারিক না হোক্ তবু একেবারে সংসার-সংস্কারের অতীতও বলা চলে না। গুরুর সঙ্গে যদি আর দেখা না হয় তাতেই বা কি? স্নেহময়ী গুরুমার সঙ্গেও যদি জীবনের মত দেখা না হয়—নাই বা হ'ল। এতদিন পরে গর্ভধারিনী জননীকে দেখতে যাওয়ার সার্থকতাই বা কি? কিন্তু গুরুর কাছে যে কথা বলে এসেছি—সে কথা না রাখার যুক্তি নেই। অতএব সামান্য কয়েক দিনের জন্যও সেই বহুদিনের পরিত্যক্ত আবাসে ফিরতেই হবে। তারপরে—বিশাল বিপুল হিমালয়ের গহ্বরে কন্দরে নির্জনবাসের একান্ত অবসর তো পড়েই আছে।

মিলা অকম্পিত দৃঢ়পদে সম্মুখের পানে এগিয়ে চললেন।

দীর্ঘপথ অতিক্রম ক'রে গৃহত্যাগী তরুণ কিশোর জীবনমধ্যাহ্নে স্বগ্রামে পদার্পণ করলেন। এখানে ওখানে কিছু কিছু পরিবর্তন চোখে পড়লো—কিন্তু তথাপি কিছুই চিনতে কষ্ট হ'ল না। তাঁর নিজের আকৃতি এমন বদ্‌লে গিয়েছিল যে তাঁকে দেখে সহসা কারুর চেনবার সম্ভাবনা ছিল না। তথাপি সাবধানের মার নেই, মনে ক'রে, মিলা মেষপালকদের ডেকে ডেকে গ্রামাঞ্চলের বাড়িগুলির তথ্য সংগ্রহ করতে লাগলেন। কথায় কথায় নিজের বিধ্বস্ত গৃহের ধ্বংসাবশেষের পানে তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, 'ও বাড়িতে কে থাকে?' উত্তর পেলেন, 'কে আর থাকবে? ও বাড়ি এখন ভূতপ্রেতের আড্ডা, দিনের বেলাতেও গ্রামের লোকে ও বাড়িতে প্রবেশ করতে সাহস করে না, কারণ ও বাড়ির ইতিহাস বড় সাংঘাতিক। ওই বাড়ির এক ছেলে তান্ত্রিক বিদ্যা লাভ ক'রে অত্যাচারী আত্মীয়-স্বজনদের নিধন করে। এবং সেই থেকে তার সহায়ক দেবশক্তির রোষদৃষ্টির ভয়ে গ্রামবাসীরাও বাড়ির দিকে ভাল ক'রে তাকিয়ে দেখতেও সাহস করে না। ওই বাড়ির গৃহস্বামিনী যিনি, তাঁর মৃতদেহের পর্যন্ত কেউ ভয়ে এযাবৎ সৎকার করেনি। কি থেকে কি হয়ে যাবে—সেই ভয়ে, তিনি মারা গেছেন জেনেও কেউ ও বাড়ির চৌকাঠ মাড়ায় নি। তা ছাড়া ছেলের এই অপকর্মে ভিতরে ভিতরে তাঁর প্রশ্রয় ছিল বলে লোকের বিশ্বাস থাকায়, এ গ্রামের লোকেরা তাঁর জীবিতকালেও তার প্রতি বিশেষ প্রসন্ন ছিল না। মায়ের মৃত্যুর পর —তার যে একটি মাত্র মেয়ে ছিল, সে নিরাশ্রয় হয়ে গ্রামান্তরে চলে গেছে, কারণ এ গ্রামে তার ভিক্ষা মেলাও দায়।'

মিলা নিজের মনোভাব গোপন ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, 'আর সেই সর্ব-অনিষ্টের-মূল ছেলেটা গেল কোথায়?' উত্তর হ'ল—'সে খবর কে রাখে? ও বাড়ির গৃহিনীই মারা গেছেন আজ আট বছর

হয়ে গেল। এতদিন পর্যন্ত যে নিখোঁজ, সে বেঁচে আছে কিনা তাই তো সন্দেহ। আর সেই মড়কের ব্যাপার তো আমাদের শোনা কথা; আমার তখন জন্মই হয় নি। ও বাড়ির ইতিহাস বৃদ্ধদের মুখ থেকে আমরা শুনেছি। আপনি ভিন্‌দেশী লোক, তায় সাধুসন্ন্যাসী মানুষ। পুঁথি পত্তরের বাই থাকলে ও বাড়ির মধ্যে ঢুকে একসময়ে দেখতে পারেন, অবশ্য যদি সাহস থাকে, কারণ ও বাড়ির কর্তার যখন অবস্থা খুব ভাল ছিল, তখন নাকি তাঁর পুঁথিপত্র সংগ্রহের জোরালো বাতিক ছিল।'

অপরিচিতের মুখে নিজের পারিবারিক ইতিহাস শুনে মিলার অন্তর বিষাদ-ভারাক্রান্ত হয়ে উঠলো। মা নেই—তাঁর দেহটা এতদিন পর্যন্ত ওইভাবে পড়ে পড়ে পশুপক্ষীর ভক্ষ্য হয়েছে শুনে তাঁর নিরাসক্ত হৃদয়ও যেন মুহূর্তের জন্য আর্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠলো। ছোট বোনটি মাতৃহীনা হয়ে সংসারের স্রোতে ভেসে গিয়ে কোথায় কিভাবে আছে কে জানে? এই ফাঁকে বাগদত্তা বধূ জেসের কথাটাও একবার মনের মধ্যে চমক মেরে সাড়া দিয়ে গেল। সারাদিন কাটলো বনে জঙ্গলে আত্মগোপন ক'রে। সন্ধ্যার ছায়ায় চোরের মত লুকিয়ে মিলা পোড়ো বাড়ির জঙ্গলাকীর্ণ অঙ্গনে অতি সন্তর্পণে প্রবেশ করলেন। দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়াবার সঙ্গে সঙ্গে বুকের মধ্যে কান্নামেশা একটা হাহাকার একবার ক্ষণিকের জন্য উদ্বেল হয়ে উঠলো। চারিদিকে আগাছায় জঙ্গল হয়ে আছে। পা বাড়াবার জায়গা নেই। সর্‌সর্‌ ক'রে কি একটা সরীসৃপ পায়ের কাছ থেকে সরে গেল, দু'চারটা নিশাচর বাদুড় দ্বারপ্রান্ত হতে নিষ্ক্রান্ত হয়ে পাখার ঝাপটা দিয়ে সশব্দে ছুটে বেরিয়ে গেল। দরজাগুলি হাট করা পড়ে আছে; একটা আধভেজানো পাল্লা মিলার হাতের সামান্য একটু ঠেলা পেয়েই হুড়মুড় ক'রে নিজের জীর্ণ-দেহের ভার সইতে না পেরে ভেঙে পড়লো। চারিদিকে ভাঙা-চোরা আবর্জনা-স্তূপের ফাঁকে ফাঁকে পথ ক'রে অন্ধকারে প্রেতের মত হাতড়ে হাতড়ে মিলা এ-ঘরে ও-ঘরে হোঁচট খেয়ে ফিরতে লাগলেন। মা যে

ঘরে থাকতেন, তার সামনে এসে মিলা সামান্য একটু ক্ষণের জন্য থমকে দাঁড়ালেন। চকমকি পাথর সঙ্গেই ছিল। চর্বি'র একখণ্ড বাতি জ্বালিয়ে মায়ের শয্যার পানে চেয়ে কিছুক্ষণের জন্য বিহ্বল হয়ে স্থাণুর মত দাঁড়িয়ে রইলেন। কাঠের শয্যা পায়া ভেঙে হুমড়ি খেয়ে মাটির উপরে পড়ে আছে আর তার উপরে এক রাশ মাটির ফাঁকে ফাঁকে কোথাও বা এক ফালি কঙ্কাল, কোথাও বা দু-একটা আগাছা, কোথাও বা জীর্ণ বস্ত্রের এক-আধটুকরা ইতস্ততঃ ছড়ানো।

জ্বলন্ত বর্তিকাখণ্ড হাতে নিয়ে মায়ের শেষ শয্যার পাশে গিয়ে মিলা দাঁড়ালেন। দু ফোঁটা তপ্ত অশ্রু নিজের অজ্ঞাতসারে সেই মাটি ঢাকা কঙ্কালের উপরে নিঃশব্দে ঝরে পড়লো। মাতৃহারা শিশুর মত একবার হঠাৎ ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, মা, মা গো! পোড়ো বাড়ির আনাচেকানাচে সেই আকস্মিক উচ্ছ্বাস ছড়িয়ে পড়ে জাগালো প্রতিধ্বনি। কোথায় যেন একটা পাখি পাখার ঝাপটা দিয়ে নড়ে চড়ে বসে উৎকর্ণ হয়ে অনভ্যস্ত মানবীয় ধ্বনি শুনতে লাগলো। কি যেন একটা জন্তু ত্রস্ত হয়ে মিলার গা ঘেঁসে কক্ষান্তরে ছুটে পালিয়ে গেল! কোথাকার একটা দমকা বাতাস পাল্লা-ভাঙা জানালার গায়ে ধাক্কা দিয়ে হু-হু ক'রে ঘরের মধ্যে দিয়ে হিম-শীতল আর্তনাদের মত বয়ে গেল : মৃত্তিকাস্তূপের উপরের তৃণগুলি পর্যন্ত শির্‌শির্ ক'রে কেঁপে উঠলো, এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলার হাতের জ্বলন্ত শিখাটি যেন এক অদৃশ্য ফুৎকারে নিভে গেল। মিলা আর বাতি জ্বালাবার চেষ্টা করলেন না : শান্তভাবে সেই মৃত্তিকাস্তূপের পাশে স্থির হয়ে বসে নিজের অন্তরের অতলে ডুব দিলেন। নিস্তব্ধ গৃহের অভ্যন্তরে আর একটি স্তব্ধতার সৃষ্টি হ'ল।

অনেক রাতে যখন আকাশে চাঁদ উঠলো, ম্লান জ্যোৎস্না মুক্ত বাতায়ন-পথে সেই মাটির ঢিপির উপর দিয়ে মিলার সমাহিত মূর্তির উপরে আলোর প্রলেপ মাখিয়ে দিল। মুক্ত বাতায়ন-পথে দেখা দিল

দুটি জ্বলন্ত চোখ ঃ একটা সাদা-কালো বন্য বিড়াল বহুদিনের অভ্যস্ত আশ্রয়ের সন্ধানে এসে কিছুক্ষণ জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে মিলার সমাধিস্থ মূর্তি'র পানে তাকিয়ে থেকে, শেষ পর্যন্ত মনস্থির ক'রে, পরম নিশ্চিন্ত ভাবে তাঁর গা ঘেঁসে শুয়ে ঘুমিয়ে পড়লো। রাত বেড়ে চললো; আকাশের চাঁদ ক্রমে আর এক দিকে হেলে পড়লে; দিনের আলোর সঙ্কেত ফুটলো রাত্রিশেষের গগনগাত্রে। মিলা কিছুই জানলেন না। এমনি একভাবে কাটলো দীর্ঘ সাত দিন সাত রাত। এই দীর্ঘ সমাধির মাঝখানেই গুরু-নির্দিষ্ট পন্থায় মাতাপিতার পারলৌকিক গতিমুক্তির ব্যবস্থা ক'রে তিনি যখন উঠলেন, তখন তাঁর মন আকাশের মত স্বচ্ছ হয়ে গেছে; বেদনা নেই, গ্লানি নেই, শোক নেই, অশান্তি নেই। যা হয়নি তার জন্য দুঃখ নেই, যা হাতে পারতো তার জন্য অনুশোচনা নেই। এ সংসারে যাবতীয় কর্তব্য তাঁর সমাপ্ত হয়েছে, সাংসারিক জীবনের শেষ পরিণতিও তার দেখা হয়ে গেছে; করণীয় কিছু নেই, দুর্ভাবনার কিছু নেই। চিতাভস্মের বদলে আছে জননীর দেহাবশেষ মৃত্তিকার স্তূপ। এইগুলির একটা ব্যবস্থা করতে পারলেই তাঁর ছুটি—আমরণ, যতদিন বাঁচবেন, তার জন্য অনন্ত অবকাশ। সেইখানে বসেই তিনি নিজের সমগ্র ভবিষ্যৎ জীবনটিকে একটিমাত্র উদ্দেশ্যে উৎসর্গ করে দিলেন; আশা আকাঙ্ক্ষার বীজগুলি একে একে উন্মুলিত ক'রে ধ্যান সমাধির নিস্তরঙ্গ উদার পটভূমিকায় নিজের জীবনকে বিস্তৃত ক'রে দিলেন। সেইখানে বসেই সঙ্কল্প করলেন যে চাওয়া পাওয়ার কিছুই আর থাকবে না, পিছনের দিকে তাকাবার ইচ্ছাও আর আসবে না, দুরূহ তপস্যার পথে—কঠিন দুঃখাবরণের ব্রত নিয়ে ক্ষুরধার ধর্মে হবে তাঁর দুর্বার গতি ঃ সহজ ভক্তির পথে নয়; কঠিন ত্যাগের, নিঃশেষ আত্মবিলোপের উদ্দেশে হবে তাঁর জয়যাত্রা ঃ আত্মবস্তুকে হত্যা করার আগে যেন আমি এই দেহের বোঝাকে তৃণখণ্ডের মত ক'রে বর্জন করতে পারি—এমন হোক আমার বজ্রকঠোর সঙ্কল্প।

মায়ের অস্থিখণ্ডগুলি নিজের বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে নিয়ে, পুঁথির বোঝা হাতে নিয়ে মিলা শৈশবের বহু স্মৃতি-জড়ানো গৃহাবাস পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়লেন। এবারে পথ—যে পথের শেষ বা সমাপ্তি নেই—সেই পথ। জঙ্গলাকীর্ণ অঙ্গন পিছনে ফেলে যখন উন্মুক্ত আকাশের নিচে এসে দাঁড়ালেন, তখন তাঁর মন সর্ব আসক্তির ঊর্ধ্বে উঠে চিন্তাশূন্য হয়ে গেছে। সংসার যে তাঁকে এত সহজে চিরদিনের জন্য মুক্তি দিয়েছে—এই কথা মনে ক'রে, কৃতজ্ঞচিত্তে তিনি গুরুর চরণ স্মরণ করলেন। স্বতঃ উৎসারিত হ'ল, স্তবের রূপে, এই অপরিসীম কৃতজ্ঞতার স্বীকৃতি। মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে তিনি মহর্ষির উদ্দেশে বারংবার নিবেদন করলেনঃ 'হে প্রভু, হে ভগবান, হে তথাগত, হে অন্তর্যামী, সংসারের এই লোভের কারাগার থেকে তুমিই আমাকে মুক্তি দিয়েছো,—নইলে আমার কিছুই সাধ্য ছিল না। এই মায়াময় অনিত্য সংসারে, অবস্তু দেখা দেয় বস্তু রূপে ; অসত্য পরিদৃশ্যমান হয় ক্ষণস্থায়ী সত্যের ছদ্মবেশে। তোমার মহা করুণায়, তোমারই প্রসাদে এই বিড়ম্বনার হাত থেকে মুক্তি পেয়ে একমাত্র ধ্রুব সত্যের পথেই যেন আমি চলতে পারি। যতদিন আমার পিতা জীবিত ছিলেন, ততদিন তাঁর পুত্র রইলো অপরিণত ; যখন আমি পরিণত-বয়স্ক হলাম, তখন আর পিতা রইলেন না। এই দুজনের সাক্ষাৎকার ঘটলে—কল্যাণের পরিবর্তে অকল্যাণই হ'ত। তোমার এই মহিমা স্মরণ ক'রে আমি আজীবন গুহাবাসী হবো।

'যতদিন মা বেঁচে রইলেন—ততদিন পুত্র রইলো দূর-প্রবাসী ; ফিরে এসে দেখলাম মা আর নেই। দুজনে সাক্ষাৎ হ'লে—অমৃতের বদলে গরলই উঠতো। তোমার এই মহিমা স্মরণ ক'রে আমি আজীবন গুহাবাসী হবো। যতদিন আমার বোনটি ঘরে রইলো ততদিন তাই ভাই রইলো দূরে ; ভাই ফিরে এসে দেখলো বোনটি নিরুদ্দেশ। দুজনের দেখা হ'লে, কারুরই কোন কল্যাণ হ'ত না।

তোমার এই কৃপার বিধান স্মরণ ক'রে বাকি জীবন আমি তপশ্চর্যায় নিয়োজিত করবো।

'যতদিন পবিত্র পুঁথিগুলি ঘরে পড়ে রইলো, ততদিন শ্রদ্ধার অর্ঘ্য তারা পায়নি; শ্রদ্ধা যখন জাগলো, তখন পুঁথিগুলি বৃষ্টিধারায় জীর্ণ হয়ে গেছে। যদি দৈবক্রমে এ-দুয়ের মিলন হ'ত—তাতেও মঙ্গল হ'ত না। তোমার এই করুণার স্মরণে আমি আজীবন গুহাবাসী হয়ে তপশ্চর্যায় জীবনপাত করবো।

'যতদিন গৃহ ছিল অভগ্ন, ততদিনে মালিক রইলো দূরে; মালিক যতদিনে ফিরে এলো, ততদিনে গৃহ হয়ে গেছে ভগ্নস্তূপ। যদি এর অন্যথা হ'ত কারুরই কোন কল্যাণ তাতে হ'ত না। এই কৃপার স্মরণে আমি অক্ষয় সত্যের সন্ধানী হয়ে তপশ্চর্যায় আত্মসমর্পণ করবো। যতদিন শস্যক্ষেত্রে উর্ববতা ছিল—কৃষক রইলো দূরে; কৃষক যতদিনে ফিরলো, ততদিনে সমগ্র ভূমি আগাছায় গেছে ভরে। এমনটি যদি না হ'ত--তাতেও হ'ত না কোন কল্যাণ। এই অঘটনই আমার সাধনার জীবনের সহায়ক হয়েছে। স্বদেশ, স্বগৃহ এ সবই যে অনিত্য, অসার তা আমি বুঝেছি; আমার আর কোন কিছুরই প্রয়োজন নেই; আমি সত্যের সন্ধানী—সত্যই আমার লক্ষ্য। হে পিতা, হে মহাগুরু, আমি তোমার শরণ নিলাম।'

একহাতে জননীর দেহাবশেষ ও অন্যহাতে পুঁথির বোঝা নিয়ে মিলা গেলেন তাঁর পূর্বতন শিক্ষকের গৃহে। শিক্ষক তখন গত হয়েছেন; বাড়িতে ছিল তাঁর পুত্র। আত্মপরিচয় দিয়ে মিলা তার সাহায্য ভিক্ষা করলেন। পূতাস্থিগুলি চূর্ণ ক'রে তার সঙ্গে কাদামাটি মিশিয়ে ক্ষুদ্রাকার একটি স্তূপ রচনা ক'রে কোনখানে স্থাপন করতে পারলেই মায়ের ধর্মশরীর সুরক্ষিত হবে—এই ছিল তিব্বতের পারলৌকিক কর্মের একটি অঙ্গ। এ কর্ম একা সম্ভব নয় বলেই সাহায্যের প্রয়োজন: সাহায্যের বিনিময়ে মিলা তাকে পুঁথিগুলি দিতে চাইলেন।

এ কথা শুনেই শিক্ষক-পুত্র সচকিত হয়ে উঠলেন; বললেন, 'ও আমার চাই না; ওসব পুঁথি ঘরে রাখলে আমার অকল্যাণ হবে, কারণ ও বাড়ির সমস্ত কিছুর উপরেই তোমার দেবতাদের জাগ্রত দৃষ্টি রয়েছে।' মিলা তাঁকে বোঝালেন যে স্বেচ্ছাপ্রদত্ত বস্তুতে অমঙ্গল হতে পারে না। শেষ পর্যন্ত তিনি সম্মত হয়ে মিলার মৃতা জননীর শেষকৃত্যে সহায়তা করলেন। সা-সা স্তূপের পাদমূলে শাস্ত্রনির্দিষ্ট ধর্মানুষ্ঠান পরিসমাপ্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলা লোকসঙ্গ পরিত্যাগ ক'রে উদ্দিষ্ট গুহার অভিমুখে যাত্রা করতে চাইলেন, কিন্তু শিক্ষক-পুত্র কিছুক্ষণের জন্য তাঁকে নিরস্ত করতে চাইলেন। মিলার জীবন-কাহিনী আদ্যোপান্ত শুনে তিনি বললেন, 'প্রথম জীবনের অজ্ঞানকৃত দুষ্কৃতির ক্ষালনের জন্য উপযুক্ত পন্থাই তুমি গ্রহণ করেছো : আমি তোমার মঙ্গল কামনা করি। কিন্তু তোমার গুরু মার্পাও যখন বিবাহিত জীবনেই সাধনা ক'রে সফল হয়েছেন—তখন তোমারই বা তাতে বাধা কি? বাড়ি-ঘর-দোর মেরামত ক'রে, জেসেকে বিবাহ ক'রে, সংসার-ধর্মপালনে ব্রতী হও।' মিলা বললেন, 'আমার গুরুর সঙ্গে কার তুলনা? লোকসেবার উদ্দেশে অবতার পুরুষেরা যা করেন, আমার মত সাধারণ মানুষের জন্য সে পথ নয়। সিংহের পক্ষে যা শোভনীয়, সে পথ শশকের পক্ষে অশোভন। আমার গুরু আমার জীবনের পথ-নির্দেশ ক'রে দিয়েছেন; আমার পক্ষে সে ছাড়া আর পথ নেই। ধ্যান সমাধি ছাড়া কিছুই আমি জানি না। গুরু আমার বুকে তপস্যার হোমাগ্নি জ্বালিয়ে দিয়েছেন—সেই আগুনের আলোয় পথ দেখে আমাকে আমার আদর্শলোকে পৌঁছতে হবে। তা ছাড়া এই তো সংসারের শেষ পরিণতি স্বচক্ষেই প্রত্যক্ষ করলাম। এর পরেও আর কেন? আমার মত ক'রে পুড়ে পুড়ে যারা অঙ্গার হয়ে যায় নি—আরামের পথ তাদের জন্যই তোলা থাক। মৃত্যুময় নরকভোগ যাদের জীবনে ঘটে নি তারাই সংসারের এই খেলাঘরে আনন্দের সঙ্গে

যোগ দিতে পারবে। আমার জীবনের ধারা বদলাবার নয়ঃ যতদিন বাঁচবো, কঠোর তপস্যা ছাড়া অন্য কোন পথ আমার জন্য খোলা নেই।'

বলতে বলতেই মিলার দু-চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠলো। 'এই তো আমার পিতা ছিলেন এই গ্রামের সম্ভ্রান্ত অধিবাসীঃ এতবড় বাড়ি, এত ধনসম্পদ, এতখানি সমারোহ আর কোন্ সংসারে ছিল? আজ এই জীর্ণ ভগ্নস্তূপের পানে চাইলে সে অতীত গৌরবের কিছু কি আর ধারণা করা যায়? যে আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবেরা আমাদের অনুগত ছিল—আজ তারা এ পরিবারের নামটি পর্যন্ত সহ্য করতে পারে না। আমার স্বর্গগত পিতা, যিনি একদা সগৌরবে সংসারের পথে বিচরণ করেছেন— আজ কোথায় তাঁর চিহ্ন? জলের আল্পনার মত তাঁর জীবন নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছেঃ আমার স্নেহময়ী তেজস্বিনী জননীর স্মৃতি রক্ষা করছে একমুষ্টি অস্থিচূর্ণ। বহুমূল্য পুঁথিগুলি হয়েছে ইঁদুরের বাসা। আমার একটি মাত্র বোন সংসারের ঘূর্ণিপাকে কোথায় যে হারিয়ে গেছে সে সংবাদ এই বিশাল বিশ্বে কেউই জানে না। এই তো সংসারের প্রকৃত স্বরূপ চোখের সামনে দেখতে পাচ্ছি। এর পরেও আর এই অচিরস্থায়ী বস্তুজগতের প্রতি কার আকর্ষণ থাকে? এ জীবনের প্রতি আমার আর বিন্দুমাত্র মোহ নেই।'

শিক্ষক-পুত্র মিলার সমস্ত কথা শুনে শেষ পর্যন্ত মাথা নেড়ে বললেন, 'তোমার কথা সবই ঠিক। অনেক ভাগ্যে তুমি সত্যপথের আস্বাদ পেয়েছো; তোমাকে প্রতিনিবৃত্ত করবার সাধ্য কার? কিন্তু আমার অনুরোধ এভাবে রিক্তহস্তে তুমি বিদায় নিও না। তোমার পরিবারের কাছে আমাদের ঋণ অপরিশোধ্যঃ দয়া ক'রে তুমি আমাকে তার সামান্য একটু অংশ পরিশোধ করবার সুযোগ দাও। তোমার সাধনা যাতে নির্বিঘ্ন হয়, সেই উদ্দেশ্যে তোমাকে সামান্য কিছু খাদ্যদ্রব্য সংগ্রহ ক'রে দিতে চাই। আমার মিনতি, তুমি এটুকু গ্রহণ করতে ইতস্ততঃ কোরো না।'

ময়দা মাখন পনিরের একটা ঝোলা নিয়ে মিলা শিক্ষকের গৃহ ত্যাগ করলেন। এবারে আর পিছনের কোন বন্ধন নেই ঃ বিশাল পৃথিবীর দ্বার অবারিত। ধ্যানের নেশায় মিলা পথে বেরিয়ে পড়লেন। অধিকদূর অগ্রসর হবার পূর্বেই গ্রাম-সীমান্তে একটি প্রশস্ত গুহা দেখতে পেয়ে, সেইখানেই রয়ে গেলেন। কল্যাণকামী বন্ধুর দান থেকে প্রয়োজন মত সামান্য আহার গ্রহণ ক'রে তপশ্চর্যায় রত হলেন। দু-তিন দিন অন্তর এক আধ গ্রাস আহার কোনমতে সেরে নিয়ে তিনি তপস্যায় মগ্ন হয়ে রইলেন। দিনের পর দিন এই কঠোর খাদ্য সংযমের ফলে তাঁর দেহ শুকিয়ে যেতে লাগলো ঃ কিন্তু দেহবোধ যাঁর অন্তর্হিত হয়েছে তাঁর কাছে দৈহিক প্রয়োজন কতটুকু? এইভাবে কেটে গেল মাসের পর মাস। সমস্ত সঞ্চয় নিঃশেষ হয়ে যাওয়ার পরে মিলা যখন প্রায় উত্থানশক্তি রহিত হয়ে গেছেন, তখন তাঁর একদিন খেয়াল হ'ল যে ক'দিন ধরে কোন আহার্য গ্রহণ করা হয় নি। ধ্যানের আসন পরিত্যাগ ক'রে উঠতে ইচ্ছা করে না; আত্মানন্দে বিভোর মিলা শেষ পর্যন্ত একদিন কোনরকমে উঠে ভিক্ষায় বেরুলেন। পাহাড়ের পাদদেশে মেষপালকদের ডেরা, ভিক্ষাপাত্র নিয়ে তাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালে কিছু কিছু মুষ্টিভিক্ষা পাওয়া অসম্ভব নয়। তাঁর প্রয়োজন যৎসামান্য; তিব্বতের অতি দীনদরিদ্রও ক্ষুধার্ত ভিক্ষুককে দ্বারপ্রান্ত হতে প্রত্যাখ্যান করে না। দেহবোধ শূন্য হয়েও প্রাণাধার দেহকে তিনি কেমন ক'রে বঞ্চিত করবেন?

নিয়তির পরিহাস, প্রথম দিন ভিক্ষায় বেরিয়েই যে চালা-ঘরের সামনে মিলা গিয়ে দাঁড়ালেন—সেই চালার মালিক সেই সর্বস্বাপহারী কাকার স্ত্রী। এতদিন পরে চিরশত্রু মিলাকে দেখেই তিনি চিনলেন। ক্রুদ্ধস্বরে অভিশাপ দিয়ে তিনি লাঠি-হাতে ঘর থেকে ছুটে বেরিয়ে এলেন ও দ্বারপ্রান্তে বাঁধা হিংস্র কুকুরগুলি মিলার প্রতি লেলিয়ে দিলেন। দুর্বল দেহে আত্মরক্ষার শক্তি মিলার ছিল না,

তথাপি ভূমি থেকে একটি কাষ্ঠখণ্ড তুলে নিয়ে হিংস্র আক্রমণ ঠেকাতে লাগলেন। কাকি স্বয়ং অগ্রবর্তী হয়ে যষ্টি দ্বারা তাঁকে প্রহার করতে লাগলেন। 'ওরে ভণ্ড তপস্বী, ওরে পাষণ্ড, খুনে, নরাধম—তোকে আমি ভুলিনি। আমার ছেলেমেয়েদের তুই হত্যাকারী : তোর সেই অপকর্মের বোঝা আমার বুকে পাষাণ হয়ে জমে আছে। তোকে আমি হাতে পেয়ে অল্পে ছেড়ে দেবো ? নিজের হাতে আমি আজ প্রতিহিংসা নেবো।'—এই ব'লে জীর্ণ-দেহ, ক্ষুৎ পিপাসাতুর মিলাকে তিনি প্রহারে জর্জ্জরিত করতে লাগলেন। মিলা পালাতে চেষ্টা ক'রে অব্যাহতি পেলেন না। পাশ্বেই একটা পচা ডোবায় পড়ে গেলেন। ভাগ্যক্রমে সেখানকার জল তেমন গভীর ছিল না, তাই অনেক কষ্টে প্রস্তরখণ্ডগুলির উপরে ভর দিয়ে কোনক্রমে অপর পাড়ে গিয়ে উঠলেন। সিক্তবস্ত্রে কোনরকমে খাড়া হয়ে কাতরস্বরে বললেন, 'তুমি আমার মাতৃস্থানীয়া, তোমার প্রহার আমি মাথা পেতে নিলাম। তোমার সন্তানদের মৃত্যুর কারণ বলে আমাকে তুমি তিরস্কার করেছো—তাও আমি স্বীকার ক'রে নিলাম। কিন্তু তারও আগেকার পুরানো কথা কি তোমার মনে নেই ? পিতৃহীন দুটি শিশু ও শোকসন্তপ্তা জননীর ছোট একটি সংসারকে পৃথিবীর স্রোতে ছিন্ন ভিন্ন ক'রে তোমরাই কি একদিন ভাসিয়ে দাওনি ? তারপরে আমি একদিকে চলে গেলাম, [illegible] আমার মা ও দুখিনী ছোটবোনটি ক্ষুধার তাড়নায় জ্বলতে লাগলো। মা অনশনে প্রাণ হারালেন, ছোটবোনটি পথের ভিখারিনী হয়ে কোথায় যে চলে গেল সে সংবাদ কেউ জানে না। বহুকাল পরে ঘরে ফিরে এসে ভগ্নগৃহে দেখলাম মায়ের জীর্ণ কঙ্কাল। এসব দুঃখের প্রাথমিক কারণ কি তোমরাই নও ?

'তোমাদের দেওয়া দুঃখে আমার মঙ্গলই হয়েছে, কারণ সেই পাথেয় সম্বল ক'রেই আমি সন্ন্যাসের পথে এগিয়ে যেতে পেরেছি। মহাগুরু

মার্পার কাছে শিক্ষাদীক্ষা লাভ ক'রে আমি নির্জনবাসী তপস্বীর জীবন যাপন করছিলাম ; খাদ্যাভাবে মৃতকল্প হয়ে—মুমূর্ষু কীট যেমন কিছু না জেনে পিপীলিকার ক্ষেত্রে এসে উপস্থিত হয়, তেমনি ক'রে তোমার দ্বারপ্রান্তে নিজের অজ্ঞাতসারে এসে পৌঁছেছি। আঘাতে, অভিশাপে, নিষ্ঠুর নির্মম আক্রমণে তুমি আমাকে দেহ-মনে নির্যাতিত করেছ। কিন্তু ক্ষমা আমার গুরুদত্ত ক্ষমতা, তাই অক্ষুব্ধ অন্তরে প্রার্থনা জানাচ্ছি—আমাকে ক্ষুধার অন্ন প্রদান করো।'

মিলার এই করুণ কাহিনী শুনে পাষাণহৃদয়া কাকিও অশ্রু-সংবরণ করতে পারলেন না ; তাঁর পিছনে দাঁড়িয়ে সেই গৃহের বৃদ্ধ পরিচারিকা মিলাকে চিনতে পেরে সশব্দে কেঁদে উঠলেন। লজ্জায় মুখ ঢেকে কাকিমা গৃহাভ্যন্তরে আত্মগোপন করলেন এবং পরিচারিকার হাত দিয়ে কিছু পনিরের গুঁড়া ও মাখন মিলাকে পাঠিয়ে দিলেন।

ক্ষুদ্র মেষপালক-পল্লীর দ্বারে দ্বারে যেখানেই মিলা গেলেন, সেখানেই পেলেন রক্তচক্ষুর অভ্যর্থনার সঙ্গে সামান্য কিছু খাদ্য। গ্লানিহীন প্রশান্ত চিত্তে মিলা অশ্রদ্ধার দানগুলি কুড়িয়ে কুড়িয়ে বস্ত্রাঞ্চলে বেঁধে নিলেন, কারণ খাদ্য যে তাঁর অমৃতপথের পাথেয়, খাদ্যকে বাদ দিয়ে যে দেহধারন সম্ভবপর নয়। কাকিমার রুদ্রমূর্তি দেখে তাঁর আর কাকার সম্মুখীন হবার বাসনা ছিল না ; কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে সে সম্ভাবনাকেও এড়ানো গেল না। দূর থেকে মিলাকে দেখতে পেয়েই তিনি উন্মাদের মত তেড়ে এলেন ; দাঁতে দাঁত চেপে তীব্র স্বরে গর্জন ক'রে উঠলেন—'আমি এখনো মরিনি, প্রতিশোধ নেবার জন্যই বেঁচে আছি ; পাপিষ্ঠ নরাধম, আজ আর তোর রক্ষা নেই।' মস্তবড় একটি প্রস্তরখণ্ড পথের ধার থেকে তুলে নিয়ে তিনি মিলাকে ছুঁড়ে মারলেন ; মিলা প্রাণভয়ে পালাচ্ছেন দেখে তিনি আবার তীরধনুক নিয়ে তাঁকে তাড়া করলেন : এ বাড়ি ও বাড়ির লোক ছুটে এসে তাঁর সঙ্গে যোগ দিল—কারুর হাতে লাঠি, কারুর হাতে ছোরা, কারুর হাতে প্রস্তরখণ্ড।

এতবড় একটি দলকে পশ্চাদ্ধাবন করতে দেখে মিলা বুঝলেন পালানো অসম্ভব। তিনি বুঝলেন, এ সেই অতীতের পুঞ্জীভূত আক্রোশের প্রতিক্রিয়া। স্বাভাবিক ভাবে এদের হাত এড়ানো যাবে না বুঝেই তিনি স্থির হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন এবং আক্রমণোদ্যত জনতাকে ঠেকাবার জন্য. যেন কোন্ অদৃশ্য শক্তিকে লক্ষ্য ক'রে জোর গলায় সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, 'হে দৈবশক্তি, তুমি আমাকে রক্ষা করো; তোমার আশ্রিত ভক্ত শত্রুর দ্বারা আক্রান্ত; আমার আত্মরক্ষার সামর্থ্য নেই, প্রতিশোধের দায়িত্ব তুমি নাও। হে অপরাজেয় মহাশক্তি, তুমি তোমার প্রলয়ঙ্কর প্রতাপ দেখাও!'

শব্দব্রহ্মের প্রতাপ সঙ্গে সঙ্গে পরিদৃশ্যমান হ'ল: জনতা স্তব্ধ হয়ে থেমে গেল। মিলাকে আক্রমণ করবার উৎসাহ যেন মন্ত্রবলে নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল। মিলাকে নিরস্ত হবার জন্য মিনতি জানিয়ে, সকলে মিলে তাঁর কাকাকে ঘিরে ধরলো। তাদের হাত ছাড়িয়ে মিলাকে আক্রমণ করার সাধ্য আর তাঁর রইলো না। তখন সকলে মিলে চাঁদা ক'রে খাদ্যসম্ভার সংগ্রহ ক'রে মিলার ভাণ্ডার পরিপূর্ণ ক'রে দিল। একেবারে অক্ষত দেহে না হ'লেও—মিলা কোনরকমে প্রাণে বেঁচে খাদ্যের বোঝা নিয়ে নিজের গুহায় ফিরে গেলেন। গ্রামের এত কাছে অধিক দিন থাকা যে নিরাপদ নয়, একথা তিনি মর্মে মর্মে বুঝে নিলেন। স্বপ্নাদেশ পেলেন আরও কিছুকাল সেখানেই তাঁকে অবস্থান করতে হবে। এ আদেশের তাৎপর্য বোঝা গেল দু'চার দিন পরেই, যখন লোকমুখে মিলার সংবাদ পেয়ে তাঁর শৈশবকালের বাগ্দত্তা বধূ জেসে, এতকাল পরে একদিন অকস্মাৎ কিছু খাদ্যপানীয় নিয়ে সেই লোকালয় বর্জিত গুহাপ্রান্তে এসে উপস্থিত হলেন। মিলার মুখের পানে চেয়েই জেসে উচ্ছ্বসিত ক্রন্দনের বেগে ভেঙে পড়লেন।

জেসেকে সান্ত্বনা দেবার সাধ্য ছিল না, তথাপি রোরুদ্যমানা বাগ্দত্তা বধূকে কোনক্রমে শান্ত ক'রে, মিলা পুরানো দিনের সমস্ত

কাহিনী তাঁর মুখ থেকে খুঁটিয়ে খুঁটিয়ে শুনলেন—কেমন ভাবে অসহায় অবস্থায় জননীর মৃত্যু হ'ল, ছোট বোনটি বিপথগামিনী হয়ে স্রোতের ঘূর্ণাবর্তে হারিয়ে গেল। শেষকালে চোখের জল মুছে তিনি বললেন, 'কিন্তু জেসে, এতদিন পর্যন্ত তুমি কেন সংসারী হলে না? তুমি তো জানতে যে আমি সংসারের বাইরে চলে গেছি।' অবনত মুখে জেসে বললেন, 'আমাকে তোমার বাগ্‌দত্তা জেনে এবং তোমার শক্তি সামর্থ্যের কথা শুনে, আমাকে গ্রহণ করতে চাইবে এমন স্পর্ধা ছিল কার? তা ছাড়া, কেউ প্রস্তাব করলেও আমি সম্মত হতাম না। তুমি যে ধর্মের পথ বেছে নিয়েছো, সে জন্যও আমার মনে কোন ক্ষোভ নেই। কিন্তু তোমার পৈত্রিক বাড়ি ও জমি-জায়গার কি ব্যবস্থা করতে চাও?'

সামান্য একটুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে মিলা বললেন, যা কিছু রইলো, সে সব রইলো আমার বোনের জন্য এবং তার অবর্তমানে—এখন এবং পরে, তোমার জন্য। ও বাড়ি ও জমি-জায়গায় আমার কোন প্রয়োজনই নেই। গৃহবাসের মেয়াদ আমার ফুরিয়েছে। পশুপাখিরা যেমন ক'রে খাদ্য সংগ্রহ করে, আমারও সেই উপজীবিকা; খাদ্য না জোটে উপবাস করবো। আমার কিছুরই প্রয়োজন নেই। লোকালয়শূন্য স্থানে গুহাবাসী হয়ে আমার জীবন কাটবে। বাড়ি নিয়ে আমার কি হবে,—কারণ আমি বুঝেছি যে আমি যদি পৃথিবীর অধীশ্বরও হ'তাম—মৃত্যুকালে সে সবই আমাকে ছাড়তে হোত। যা পরিণামে ছাড়তেই হবে, তা এখন থেকে ছাড়াই ভাল বলে আমি সেই সিদ্ধান্তই করেছি। সংসারের লোকের পথ আর আমার পথ এক নয়। অতএব আমাকে মৃতের গোষ্ঠিতেই তুমি রেখো।'

জেসে বিস্মিত হয়ে বললেন, 'তোমার পথ তুমি জানো। কিন্তু তোমার মহাযান পথের আরও অনেক পথিক তো আছেন; তাঁরা তো কেউই এমন দীনহীন ভিক্ষুকের মত নয়। তোমার ধর্মপথ কি তাঁদের সঙ্গে একেবারেই মেলে না?'

মিলা বললেন, 'না, কেমন করে তাঁদের সঙ্গে আমার পথ মিলবে! ধর্মপথকে যারা অর্থ বা সম্মানের উপলক্ষ্য হিসাবে ব্যবহার করে, তারা এই পথের দু'একখানি পুঁথির বাঁধা বুলি সম্বল ক'রে নিজেদের স্বার্থ-সাধনে রত হয়। সত্য তারা চায় না এবং পায়ও না। প্রত্যেকটি দল নিজ নিজ মহিমার ঢাক পিটিয়ে সঙ্ঘশক্তিকে পরিপুষ্ট করে এবং তারই অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হয় পারস্পরিক সংঘর্ষে। সত্য-সন্ধানী যারা তারা সত্য নিয়েই থাকে; সর্বান্তঃকরণে একমাত্র সত্যকেই যারা চায়, তারা দলাদলির ধার ধারে না, কারণ কেবল একটিমাত্র আদর্শ ছাড়া আর কোন কিছুরই অস্তিত্ব তারা মানে না। •মহাযানের শ্রেষ্ঠ পথের—বুদ্ধত্বের পথের পথিক আমি—যে পথে সর্ব কামনা-বাসনা বিবর্জিত জীবাত্মা একটি জন্মেই পরিনির্বাণ লাভ করে। এ জন্মের যাবতীয় আশা আকাঙ্খাকে জলাঞ্জলি না দিলে বুদ্ধত্ব লাভ করা যায় না।'

দুঃখের মাঝখানেও জেসের নতমুখে সামান্য একটু হাসির ঝিলিক খেলে গেল। তিনি বললেন, 'সে তো স্বচক্ষেই দেখতে পাচ্ছি। তোমার সঙ্গে যে তাদের মতের মিল নেই—তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ আমার সামনেই রয়েছে। কিন্তু এ কথাও বুঝতে পারছি যে তোমার ধর্ম বড় সহজ ব্যাপার নয়। পথ হিসাবে, তুমি যা'ই বলো, তাদের পথ সহজও বটে লোভনীয়ও বটে।'

হাসির ঝিলিকটুকু মিলার চোখে পড়লো কি না ঠিক বোঝা গেল না। মিলা উদ্দীপ্ত হয়ে বলতে লাগলেন, 'একেবারে নিষ্কীঞ্চন না হ'লে যোগের পথে চলা যায় না। হরিদ্রাভ সন্ন্যাসের বেশ ধারনেই সূচিত হয় না যে একেবারে সর্ব্বস্বত্যাগের অবস্থা হয়েছে। তুমি হয়তো আমার কথা ঠিক বুঝতে পারবে না—কিন্তু সম্পূর্ণ আত্মার-লুপ্তির এই পথে যে কোন অহঙ্কারই প্রতিবন্ধক। যদি আমার বাক্য হৃদয়ঙ্গম ক'রে থাকো, তুমিও এ পথ গ্রহণ করতে পারো। আর

যদি তা না পারো—আমার যা কিছু ছিল সে সব তুমি অনায়াসে ভোগদখল করতে পারো।'

পূর্ণদৃষ্টিতে মিলার মুখের পানে চেয়ে প্রশান্ত স্বরে জেসে বললেন,; 'তোমার সম্পত্তিতে আমার প্রয়োজন নেই ঃ ও সব তোমার বোনেরই প্রাপ্য। আমিও ধর্মপথেই চলতে চাই—কিন্তু তোমার মত ক'রে বা তোমার আদর্শপথে চলার সাধ্য আমার নেই। তোমার সঙ্গে আর কবে দেখা হবে, বা কখনো হবে কি না তা আমি জানি না। তবে আমি বুঝে গেলাম যে আমাকে নিয়ে তোমার কোন উদ্বেগ নেই, এবং জানিয়ে দিয়ে গেলাম যে তার কোন হেতুও নেই।'

যেমন নিঃশব্দে জেসে এসেছিলেন, তেমনি নিঃশব্দেই তিনি গুহার দ্বারপ্রান্ত ছেড়ে আঁকাবাঁকা পার্বত্য পথ ধরে দৃষ্টিসীমার বাইরে চলে গেলেন। অপরাহ্নের ম্লান আলোকে মিলা উদাসভাবে কিছুক্ষণ তাঁর গমনপথের পানে স্থির হয়ে চেয়ে রইলেন। মনের মধ্যে কোন্ অপরিজ্ঞাত দুর্নিরীক্ষ প্রান্তে যেন সামান্য একটু কাঁটার মত কি একটা অস্পষ্ট ব্যথার বোধ হয়তো-বা বিদ্যমান ছিল; কিন্তু এখন আর তার অস্তিত্ব খুঁজে পেলেন না। দূর দিগন্তে, একখণ্ড রাঙামেঘের গায়ে সূর্যাস্তের আলো রচনা করেছে শ্রান্তদিনের বহ্নিমান চিতা ঃ তার ওপরে জ্যোতির্ময় সূর্য অস্তাচলের পথ হতে শেষ দৃষ্টিপাতটুকু ধীরে ধীরে ফিরিয়ে নিচ্ছেন; তার এপারে গগনব্যাপী বিশাল অন্ধকার ধীরে ধীরে পাখা মেলে সেই দিকেই ক্রমে অগ্রসর হয়ে যাচ্ছে। দেখতে দেখতে মিলার দু-চোখ বুজে এলো ঃ অনাবৃত আকাশের তলায় তাঁর নিস্পন্দ দেহ স্থির হয়ে রইলো। আকাশ তারায় তারায় ছেয়ে গেল। সপ্তর্ষিমণ্ডল দেখা দিলেন রহস্যময়ী নীহারিকার আশেপাশে।

এর কয়েকদিন পরেই এসে দেখা দিলেন কাকি। মিলার সম্বন্ধে তাঁর মনে যে বহুদিনের বৈরিভাব ছিল, তার যে কোন পরিবর্তন হয়েছিল—এমন নয়। কিন্তু তিনি ভেবে দেখলেন যে মিলাদের

পোড়ো বাড়ি ও পতিত জমির যথেষ্ট মূল্য আছে—এবং অতীতের ক্ষোভে ভবিষ্যৎ লাভের সম্ভাবনাকে অগ্রাহ্য করাটা বুদ্ধির কাজ হবে না। মিলার আকৃতি প্রকৃতি দেখে এই বিচক্ষণ মহিলা বুঝে নিয়ে ছিলেন যে লোকটি আর যেমনই হোক, সাংসারিক বুদ্ধি বিশেষ তার নেই; অতএব এক আধ থলি ময়দা ও দু'চারটা মিষ্টি কথার বিনিময়ে মিলার ভদ্রাসন ও চাষের জমিটুকু হস্তগত করতে পারলে নিজের উপকারই হবে। নিজের করণীয় স্থির ক'রে, তিনি কিছু খাদ্য-পানীয় সঙ্গে নিয়ে মিলার আস্তানায় এসে হাজির হলেন। বললেন, 'বাবা মিলা, সেদিন তোমাকে না জেনে অনেক কটু কথা বলেছি; সেজন্য আমার আত্মগ্লানির শেষ নেই। তোমার কথা মিথ্যা নয়, অপরাধ আমরা বড় কম করিনি। তুমি যা করেছো তার জন্য তোমাকে দোষ দেওয়াও সঙ্গত নয়, কারণ তুমিও ইচ্ছা ক'রে আমাদের অনিষ্ট করো নি। তা ছাড়া, তুমি এখন সত্য পথের পথিক হয়েছো: আমাদের বংশের ছেলে সন্ন্যাসের পবিত্র ধর্মে দীক্ষা লাভ ক'রে উচ্চভূমিতে প্রতিষ্ঠিত হতে চলেছে—সেও আমাদের গর্বের কথা। তাই তোমার সঙ্গে দেখা ক'রে ক্ষমা চাইতে এলাম।'

মিলা বিনয়বচনে বললেন, 'আপনার কটুবাক্যে আমার মনে যেটুকু আঘাত লেগেছিল—সে আমি ভুলে গেছি। আমার এ পথে কোন কিছু সঞ্চয় ক'রে রাখবার উপায় নেই।' এমনি একটি সুযোগেরই ফাঁকি অপেক্ষা করছিলেন; তিনি বললেন, 'সে কথা জানি বলেই তো ভাবছি, তোমার এই ঘর-বাড়ি জমি-জায়গার ব্যবস্থা কি হবে। তোমার যখন ওসবের দরকার নেই, তখন তোমার সম্মতি থাকলে আমিই ওদের ভার নিতে পারি। একেবারে এমনি চাই না; সাধনার কালে তোমারও তো আহার্যের দরকার। সে ভার আমি নেব। তুমিও নিশ্চিন্ত মনে নিজের পথে চলতে পারবে।'

মিলা বললেন, 'সেই ভালো। আমার যা কিছু আছে সে সবই

আপনি ভোগদখল করুন, আমার কিছুতেই আপত্তি নেই। ভিক্ষা ক'রে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে না হলে তো আমার পক্ষে ভালই হবে।'

কাকি হৃষ্টচিত্তে ঘরে ফিরে গিয়ে সেই দিনই মহাসমারোহে মিলার ভদ্রাসন দখল ক'রে বসলেন এবং প্রতিশ্রুতি-মত কিছু কিছু যবচূর্ণ মাসে মাসে মিলাকে পাঠিয়ে দিতে লাগলেন। এই ভাবেই দু-মাস কেটে গেল। তারপরেই তিনি ভাবলেন মিলাকে খাদ্য-সরবরাহ করা মানে ভস্মে ঘি ঢালা। না দিলেও যেখানে চলে, সেখানে এ অনর্থক অপব্যয়ের প্রয়োজন কি? কিন্তু নিশ্চিন্ত মনে শক্তিমান মিলাকে ফাঁকি দেওয়াও যায় না—কারণ কি থেকে কি হয়ে যায় কিছুই বলা যায় না। সাত পাঁচ ভেবে একদিন অত্যন্ত ভালোমানুষটির মত মুখ ক'রে মিলার কাছে গিয়ে কেঁদে পড়লেন, 'তাই তো বাবা, বড়ই মুস্কিলে পড়ে গেছি। জানি তুমি আমার অনিষ্টের মূল হতে পারো না; কিন্তু গ্রামের লোক সবাই বলছে তোমার ভদ্রাসন দখল ক'রে থাকায় আমার অমঙ্গলের আশঙ্কা আছে। তারা বলে তোমার রক্ষক দৈবশক্তির রোষদৃষ্টিতে পড়লে আমার সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে।' মিলা বললেন, 'তা তারা বলুক; কিন্তু আপনি তো জানেন সেসব পথে আমি আর নেই। তা ছাড়া, আমি যখন স্বেচ্ছায় আপনাকে অধিকার দিয়েছি, তখন রোষদৃষ্টির কথাই তো ওঠে না।'

কাকি বললেন, 'তুমি ঠিকই বলেছ; কিন্তু তোমার কার্যকলাপ যারা দেখেছে, তাদের মনে এরকম আশঙ্কা জাগলে তাদের দোষ দেব কেমন ক'রে? তোমার পরিবর্তনের কথা আমি যেমন জানি, তেমন ক'রে বাইরের লোকে জানবেই বা কেমন ক'রে? তাই তারা ভয় দেখায়, আর আমি মূর্খ মেয়েমানুষ, ভয়ে ভয়ে মরি। তাই ভাবছি তোমার জিনিশ তুমি না হয় ফিরিয়েই নাও; আর কিছু না হোক, আমি অন্ততঃ নির্ভয় হয়ে বাঁচি।'

মিলা হেসে বললেন, 'ভয়ের কিছু নেই বলে তুমি নিজেই যখন

জানো,—আমার পরিবর্তনকে যখন স্বচক্ষেই দেখছো, তখন আমি আর কি ক'রে তোমার এই অমূলক ভয় ভাঙাতে পারি ? ফিরিয়েই বা কি নেব—ফিরিয়ে নেওয়া ধনসম্পত্তি রাখবোই বা কোথায় ?' মিলাকে মৌন হয়ে থাকতে দেখে কাকি ভিতরে ভিতরে ব্যস্ত হয়ে উঠছিলেন। এবার আর কালবিলম্ব না ক'রে আসল কথাটি ব্যক্ত করলেন; বললেন, 'ফিরিয়ে আর তুমি কোথায় কি নেবে ? সে কথা কি আর আমি জানি না ? কিন্তু তৎসত্বেও, তুমি ইচ্ছা করলে আমাকে নির্ভয় ক'রে দিতে পারো। তুমি যদি শপথ ক'রে বলো যে তান্ত্রিক ক্রিয়া-কলাপকে তুমি চিরদিনের জন্য পরিত্যাগ করেছো; এবং কখনো, কোন অবস্থায় আর তাদের শরণ নেবে না,—তাহলেই আমি নিশ্চিন্ত হতে পারি।'

এ প্রতিশ্রুতি যে কেন, সে-কথা মিলার বুঝতে বাকি রইলো না। কিন্তু দ্বিধাহীন প্রসন্নচিত্তে তিনি প্রার্থিত অঙ্গীকার প্রদান করলেন। কাকির অভীষ্ট পূর্ণ হ'ল, তিনি খুশি মনে প্রস্থান করলেন। কয়েকটি দিন পরেই এক থলি যবচূর্ণ, একটি পশুচর্মের পোশাক, একখণ্ড বস্ত্র ও একডেলা মাখন নিয়ে তিনি ফিরে এলেন, বললেন, 'এই নাও তোমার সম্পত্তির মূল্য। মনে রেখো ও জমি-জায়গা এখন থেকে আমারই হয়ে গেল। তুমি সন্ন্যাসী মানুষ—তোমার তো আর ওসব কোন প্রয়োজন থাকবার কথা নয়; অতএব এই নামমাত্র মালিকত্ব ত্যাগ করলে তোমার ভালই হবে। আর, তোমার মঙ্গলের জন্যই বলছি—তুমি এ স্থান ত্যাগ ক'রে দূরান্তরে চলে যাও। কারণ, জানোই তো এখানকার লোকেরা তোমার উপরে প্রসন্ন নয়, তারা বলছে—যাদুকরকে বিশ্বাস কি, যে পূর্বে এত অনিষ্ট করেছে সে যে এখনো করবে না তার প্রমাণ কি ? আমার কথা লোকে মানতে চাইছে না। তারা বলছে,—তুমি যদি ঐ দুর্বৃত্তের সঙ্গে যোগাযোগ রাখো—তা হ'লে তোমাকেও আমরা অল্পে রেহাই দেব না। কাজেই

আমি বলি, তোমার এখান থেকে অনেক দূরে চলে যাওয়াই ভালো—তাতে তোমার মঙ্গল, আমাদেরও মঙ্গল।'

কিছুদিন থেকেই মিলা মনে মনে, দূরের পথে পাড়ি দেবার জন্য প্রস্তুত হয়েছিলেন, কারণ স্থানের দোষেই হোক বা যে কোন কারণেই হোক—তাঁর সাধনায় বিঘ্ন ঘটছিলো। এ ধরনের বিঘ্ন যে মাঝে মাঝে ঘটাই স্বাভাবিক এ বোধ তাঁর ছিল, তিনি জানতেন যে জোয়ার ভাঁটার মত সাধনার স্রোত স্বাভাবিক ভাবেই ওঠে নামে। এ জন্য বিচলিত হওয়ার কোন হেতু নেই জেনেও, এই আকস্মিক শুষ্কতায় তিনি অস্বস্তি বোধ করছিলেন। তার উপরে কাকি যখন নির্জলা মিথ্যা কথাগুলি অম্লান-বদনে সাজিয়ে সাজিয়ে বলে গেলেন, তখন নিঃশব্দে সহ্য না ক'রে তিক্তস্বরে বললেন, 'গ্রামের লোকের নাম দিয়ে এত কথা বলবার কোন প্রয়োজনই ছিল না। আমি লোকের অত্যাচারেও আমার গুপ্তবিদ্যা প্রয়োগ করবো না—এমন কোন শপথ গ্রহণ করিনি। ইচ্ছা করলে আমি এই সমস্ত ষড়যন্ত্রের ও শঠতার প্রতিশোধ মুহূর্তের মধ্যে নিতে পারি—কারণ সে শক্তি আমার সম্পূর্ণ অধিগত। কিন্তু শত্রুর শত্রুতা, বিরুদ্ধের বিরুদ্ধতা, ক্রুদ্ধের ক্রোধ, ক্ষুব্ধের ক্ষোভ, অত্যাচারীর অত্যাচার যদি সইতে না পারি—তবে আর আমার ধর্মের মহত্ব রইলো কোথায়। আমার নিজের ধর্মের কল্যাণেই যে আমার ধৈর্যের প্রয়োজন—এ কথা আর কেউ না জানলেও আমি জানি। কি হবে আমার জমি জায়গা ধনসম্পত্তি নিয়ে—কি হবে আমার সমগ্র পৃথিবীর ঐশ্বর্যে? আমি যদি আজ মরে যাই—কে ভোগ করবে এই জমিখণ্ড, কে বাস করবে আমার পৈত্রিক আবাসে? আমার নিজের মুখ চেয়েই আমাকে ধৈর্যে অবিচল থাকতে হবে।'

কাকির মুখ ভয়ে বিবর্ণ হয়ে উঠেছিল : এখন আবার ধীরে ধীরে সে মুখে আশ্বাস ফিরে এলো। মিলা নিজের ভাবে বলে চললেন, 'তোমরা যে আমার কতবড় উপকারী বন্ধু, তা তোমরা নিজেই জানো

না। তুমি এবং আমার কাকা যেমন একদিক দিয়ে সর্ব অনিষ্টের মূল, তেমনি তোমাদের আর একটি মহত্তর পরিচয়ও আছে। সে কথা তোমরা জানো না, কিন্তু আমার জীবন সেই কৃতজ্ঞতায় তোমাদের পায়ে বিকিয়ে আছে ; আমি সে কথা ভুলবো কেমন ক'রে? এই জন্মেই যদি আমি নির্বাণ লাভ ক'রে কৃতার্থ হতে পারি, সে কেবল তোমাদেরই কৃপায় সম্ভব হবে। আমি আজ যা কিছু হয়েছি, আমি ভবিষ্যতে যা কিছু হবো—সে সমস্তই তোমাদের অনুকম্পায়। তোমরা জানো বা না জানো, মানো বা না মানো—আমার যাবতীয় পরিণতির উপলক্ষ্য তোমরাই। এজন্য, যাবজ্জীবন আমি তোমাদের কাছে বিক্রীত : শেষদিন পর্যন্ত আমি তোমাদের আত্মার কল্যাণের জন্য কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করবো : একদিন না একদিন, কোন না কোন জীবনে তোমাদের যাতে বুদ্ধত্ব প্রাপ্তি ঘটে, সেই হবে আমার আন্তরিক প্রার্থনা। জমি বা বাড়ি—কিছুতেই আমার লিপ্সা নেই, আমার যা কিছু যেখানে আছে সবই তোমরা গ্রহণ ক'রে, জাগতিক বন্ধন থেকে আমাকে চিরতরে মুক্তি দাও,—এই আমার ভিক্ষা। আমার একমাত্র সম্বল আমার গুরুর শিক্ষা : দ্বিতীয় কোন অবলম্বনের আমার প্রয়োজন নেই।'

ভাবোন্মাদ মিলার সমস্ত কথার সারাংশটুকু গ্রহণ ক'রে কাকি পুলকিত হলেন। তাঁর নিজের হিসাবে যে ভুল হয় নি, মিলার সাংসারিক বুদ্ধির সম্বন্ধে তিনি যে অশ্রদ্ধা পোষন করতেন,—সেটা যথার্থ বলে প্রমাণিত হয়েছে এবং সেই সঙ্গে ইপ্সিত বস্তু লাভে যে কোন অন্তরায় ঘটে নি—এই আনন্দে উচ্ছ্বসিত হয়ে তিনি বললেন, 'প্রকৃত ধর্মজ্ঞান যার আছে তার তোমার মত হওয়াই উচিত। যেভাবে তুমি নিজের কর্তব্য বুঝে নিয়েছো—তা সত্যিই প্রশংসার্হ। তোমার সঙ্গে আর হয়তো কোনদিনই আমার দেখা হবে না। কিন্তু তোমার কথা আমার মনে থাকবে।'

কাকি প্রস্থান করলেন। জন্মভূমির শেষ বন্ধনটুকু কাটিয়ে মিলা তাঁর সামান্য খাদ্যের সংগ্রহ এবং ততোধিক সামান্য তৈজসপত্র বহন ক'রে বহুদূরের 'ড্রাকারটাসো' গুহার অভিমুখে যাত্রা করলেন। যতদূর দৃষ্টি যায়, পিছনে আর বন্ধন নেই, পিছন দিকে আকর্ষণ করবার আর কিছু নেই। সমস্ত অতীতটা যেন ধুয়ে মুছে একাকার হয়ে গেছে; প্রীতি-অপ্রীতি নেই, প্রিয় অপ্রিয় নেই, চাওয়ার কিছু নেই, পাওয়ার কিছু নেই। কেন্দ্রাভিমুখী মন নিজের ইষ্টবস্তুকে চিনে নিয়েছে এবং সেই চেনাটিকেই ক্রমে ক্রমে দৃঢ় পরিচয়ে প্রতিষ্ঠিত করবার জন্য সর্বস্ব পণ ক'রে অজ্ঞাতের পথে এগিয়ে চলেছে।

'ড্রাকারটাসো' গুহাটি প্রশস্ত—পরিবেশ সাধনার অনুকূল। বহু পথ অতিক্রম ক'রে অসীমের পথিক তাঁর মনের মত স্থানটি বেছে নিয়ে সাধনার আসন পাতলেন। নিজের মনে, নিজেকেই সাক্ষী রেখে তিনি প্রতিশ্রুতি গ্রহণ করলেন,—যতদিন না পরিপূর্ণ সিদ্ধিলাভ করি, এ স্থান ছেড়ে আর কোথাও যাব না; অনশনে প্রাণ যদি যায়, তাও স্বীকার, দেহধারনের জন্য কোনদিন কারও দ্বারস্থ হবো না; শীতে মরেও যদি যাই, কারও কাছে বস্ত্রখণ্ড প্রার্থনা করবো না; নির্জনতার দুঃখে কোনদিন কারও সঙ্গ প্রার্থনা ক'রে সংসারচক্রে নিজেকে হারিয়ে ফেলবো না; রোগের জ্বালায় কারও কাছে ঔষধের প্রার্থনা জানাবো না। জাগতিক কোন উদ্দেশ্য সাধনের নিমিত্ত আমার এ দেহের কোন অঙ্গ সঞ্চালিত হবে না—কারণ এ দেহ এমন সমগ্রভাবে আমি পরিনির্বাণের উদ্দেশ্যে উৎসর্গিত করেছি। মাথার উপরে আছেন গুরু, আমাকে বেষ্টন ক'রে আছেন দৈবশক্তি। আমার ভার তাঁদেরই হাতে আমি সমর্পণ করলাম। এ শপথ কোন অংশে যদি আমি অমান্য করি, তাহলে তৎক্ষণাৎ, —হে মহাগুরু, হে লোকসাক্ষী দেবলোক, আমি যেন দেহত্যাগ ক'রে, জন্মান্তরে, বুদ্ধত্বলাভের উপযুক্ত হয়ে পৃথিবীতে আসি। বজ্রদৃঢ় সঙ্কল্পে, ক্ষুরধার বিচারবুদ্ধির প্রসাদে আমি যেন তখন সঙ্কল্প সিদ্ধ করতে পারি।

এই ভাবে আত্মসঙ্কল্প দৃঢ় ক'রে মিলা সাধনার আসনে উপবিষ্ট হলেন। সামান্য একটু যবচূর্ণ দিনান্তে একবার মাত্র আহার ক'রে তিনি সর্বস্ব পণ ক'রে সাধনায় বসলেন। দেহ দিনে দিনে শুকিয়ে যেতে লাগলো, হিমশীতল বায়ুর স্পর্শে দেহ অসাড় হয়ে গেলে মহামুদ্রার সাহায্যে দেহাভ্যন্তরে উত্তাপ জাগ্রত করবার প্রয়াস করতেন, কিন্তু দুর্বল দেহে সে চেষ্টা প্রায়ই ব্যর্থ হয়ে যেতো। তখন আকুল হয়ে গুরুর প্রসাদ ভিক্ষা করতেন। প্রথম কয়েকদিন বিঘ্ন ঘটার পরেই পেলেন স্বপ্নাদেশ; অভূতপূর্ব ভাবে গুরুর সাহায্য এলো সেই স্বপ্নের মধ্যে। বিভিন্ন শারীরিক প্রক্রিয়া আত্মপ্রকাশ করতে লাগলো, শ্বাসের ক্রিয়া স্বয়ংক্রিয় হয়ে আবির্ভূত হতে হতে ক্রমে আভ্যন্তরীন উত্তাপ জাগ্রত হ'ল। এমনি ভাবে কঠোর তপশ্চর্যায় দেখতে দেখতে এক বৎসর কেটে গেল।

বৎসরান্তে একদা সমাধির অন্তে মিলা গুহার বাইরে এসে উন্মুক্ত আকাশের তলায় দাঁড়ালেন। সেদিন দু-চোখ মেলে বর্ণাঢ্য পৃথিবীর মুখের পানে চেয়ে তিনি মুগ্ধ বিস্ময়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন। শীত নিঃশব্দে কখন বিদায় নিয়ে চলে গেছে, জানতেও পারেন নি। তখন বসন্ত-উৎসব চলেছে বনভূমির দিকে দিকে: যেদিকে দৃষ্টি পড়ে সেদিকেই যেন আনন্দের হাতছানি। বিস্ফারিত নেত্রে এই আনন্দলীলা দেখতে দেখতে মিলা হয়ে তন্ময় স্বপ্নোত্থিতের মত পায়ে পায়ে এগিয়ে চললেন; স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে পড়লেন কলহাস্য-মুখরিত এক পার্বত্য ঝর্ণার পাশে। সেখান থেকে নিচের দিকে চেয়ে দেখলেন: পায়ের তলায় বহুদূর বিস্তৃত শস্যক্ষেত্রের অপরূপ মহিমা যেন তাঁর দুটি চোখে বহুদূরের এক অপরূপ অঞ্জন মাখিয়ে দিল। মনে হ'ল যেন সমগ্র বিশ্বের সঙ্গে তাঁর যোগ; মনে হ'ল তিনি পথিক, পথেই তাঁর ঘর,—সমগ্র সংসার ছড়িয়ে আছে তাঁর পথের দু-পাশে। দুর্বার বলে সেই পথ যেন তাঁকে আকর্ষণ করছে—কোন একটি স্থানে, কোন একটি ক্ষুদ্র গুহার সীমাবদ্ধ

অন্ধকার যেন তাঁকে ধরে রাখতে পারে না। তরিৎপদে মিলা কিছুদূর পর্যন্ত এগিয়ে গেলেন। হঠাৎ থেমে গেলেন যখনই মনে পড়লো নিজের প্রতিশ্রুতি—'বুদ্ধত্ব লাভ না ক'রে এ গুহা আমি কখনোই ত্যাগ ক'রে যাবো না।'

সঙ্গে সঙ্গে তাঁর মনের মধ্যে প্রতিক্রিয়া শুরু হয়ে গেল। তাঁর একটি মন যেন আর একটি মনকে ভৎর্সনা ক'রে বলতে লাগলো—'এতই যদি তোর বহির্জগতের লালসা, তবে সাধনার ছল ক'রে ঘর ছেড়ে বেরিয়েছিলি কেন? লোকসঙ্গের বৈচিত্র্যই যদি তোর কাম্য হয়, তবে এত ঘটা ক'রে শপথ গ্রহণের কি প্রয়োজন ছিল? সংসারের পানেই যদি তোর অন্তরের আকর্ষণ থাকে, তবে নির্জন গুহাবাসে নিজের অন্তরের নিগূঢ় পরিচয় কেমন ক'রে তোর লভ্য হবে? কার কাছে, কিসের লোভে তুই এই কাঙালবৃত্তি গ্রহণ করতে চাস? পৃথিবীর সৌন্দর্য যদি তোকে টানে, চিন্তা যদি তোর নিস্তরঙ্গ চিত্তকে তরঙ্গায়িত ক'রে তোলে, তা'হলে একের থেকে আর এক চাওয়া তোকে নাচিয়ে নিয়ে বেড়াবে এবং কামনাগুলি একে একে মুকুলিত হয়ে তোকে ক্রমেই উদ্‌ভ্রান্ত ক'রে তুলবে। মিলা, তুমি যদি নিজের মঙ্গল চাও, তাহলে এই ভ্রান্তির পথ এড়িয়ে চলো, কারণ এ পথ সর্বত্যাগী যোগীর জন্য নয়। এই লোভের পথে একবার যদি পা দাও, তুমি সর্বস্বান্ত হয়ে ভেসে যাবে। কোথায় তোমার জাগ্রত বিচারবুদ্ধি? আজ তোমার চরণ সঞ্চরণ করতে চাইবে, কাল চাইবে মন। যাকে প্রশ্রয় দেবে সেই তোমাকে বিপথগামী করবে। চলার পথ তোমার নয়—তোমার পথ স্থিতির; বাইরের গতি তোমার নয়,—তোমার গতি অন্তরের; মাথা তুলে দেখতে চেয়ো না, অন্তরে ডুবে থাক তোমার দৃষ্টি; সুখনিদ্রার অবসর নেই: তোমার জীবনে অখণ্ড হয়ে থাক তপশ্চর্যা।'

মনের অঙ্কুর প্রথমেই বাধা পেয়ে নির্জীব হয়ে মরে গেল। যেখানকার

মিলা সেইখানেই রয়ে গেলেন। একটানা তিনটি বৎসর ঋতুচক্রের বহুবিচিত্র অভ্যর্থনা নিয়ে এলো আর চলে গেল ; কত সোনালি প্রভাত, রক্তিম সন্ধ্যা, শীতের রিক্ততা. হেমন্তের পূর্ণতা, বর্ষার মেঘ, শরতের স্নিগ্ধতা, বসন্তের চাপল্য, গ্রীষ্মের প্রদাহ মন্থর পদে পার্বত্যভূমির বুকে নব নব আবেদন জানিয়ে ফিরে ফিরে এলো—নিঃশব্দে চলে গেল। মিলার সামান্য সঞ্চয় নিঃশেষিত প্রায় হয়ে এসেছিল ; তথাপি ক্ষীয়মাণ ভাণ্ডারকে—স্বল্পাহারকে আরও স্বল্প ক'রে— একেবারে নিঃশেষিত হতে দেন নি। মাঝে মাঝে মনে আশঙ্কা জাগতো পাছে খাদ্যাভাবে অসময়ে মৃত্যু এসে নির্বাণলাভের পথে বাধা সৃষ্টি ক'রে। এই ভয়ে একমুষ্টি খাদ্য মুখে তুলতে গিয়েও তিনি তার আধখানি পরের দিনের জন্য সরিয়ে রেখে দিতেন। এই সঞ্চয়স্পৃহার জন্য মনের মধ্যে ধিক্কার জাগতো ; তখন আবার নিজের মনকে প্রবোধ দিয়ে বলতেন—সংসারের লোকেরা ভবিষ্যৎ সুখের আশায় কত আগ্রহ ক'রে সামান্য টাকাটা সিকিটা সঞ্চয় ক'রে রাখে। অথচ কীই বা তাদের সুখ, কতই না অনিশ্চিত সেই ভবিষ্যতের সম্ভাবনা ! আমার কাম্য যে বুদ্ধত্ব কোন কিছুর হিসাবেই তার মূল্য হয় না ; অতএব এই অমূল্য নিধির জন্য সঞ্চয় করলেই বা দোষ কি ? শেষ পর্যন্ত সঞ্চয় করবার মত কিছুই যখন আর রইলো না, তখন আবার পূর্ব প্রতিশ্রুতি হয়ে দাঁড়ালো খাদ্য সংগ্রহের প্রতিবন্ধক। খাদ্য না পেলে দেহ বাঁচে না, দেহ না বাঁচলে পরম বস্তু লাভ হয় না—অথচ সত্যের ভিত্তি থেকে স্খলিত হলে ধর্মের মূলেই যে টান পড়ে। বিচারে সিদ্ধান্ত হল—খাদ্য চাই : লোকালয়ে গৃহস্থের দ্বারস্থ না হয়েও কোনক্রমে দেহের খাদ্য দেহকে দিতেই হবে। সেই পার্বত্য প্রদেশেই, ঝর্ণার আশেপাশে বিছুটি গাছের বন : সবুজ নধর পাতাগুলির গায়ে সূক্ষ্ম চুলের মত অসংখ্য বিষাক্ত কাঁটা। মনে মনে মিলা স্থির করলেন, এই পাতা সিদ্ধ ক'রে জঠরের জ্বালা নিবারণ করবেন। দুর্বল শরীরে এতখানি পথ নিত্য যাতায়াত

সম্ভব হবে না বুঝে, এই ঝর্ণার আশেপাশে একটি বৃক্ষমূলে ধ্যানের আসন স্থাপন করলেন। জলের অভাব নেই, খাদ্যেরও অভাব নেইঃ উপর দিকে চাইলেই উন্মুক্ত আকাশ, সামনে পিছনে অবারিত পার্বত্য ভূমি রৌদ্র-করোজ্বল। দেহের সমস্ত আবরণ জীর্ণ হয়ে খসে গেছে, কঙ্কালসার দেহের প্রত্যেকটি হাড় গোণা যায়। বিছুটি পাতা সিদ্ধ দিনের পর দিন খেয়ে খেয়ে সারা দেহ সবুজ হয়ে গেছে। কিন্তু সমাধিবান পুরুষের কোনদিকেই দৃষ্টি নেই। জীর্ণ-শীর্ণ উলঙ্গ দেহ, মাথার চুলগুলি জটার জঙ্গলে অপরিচ্ছন্ন; কিন্তু দেহই বা কার, চুলই বা কার? শরীরের লোমগুলি পর্যন্ত সবুজের আভা ধারন করেছে। কিন্তু মিলার কোন দিকেই দৃষ্টি নেই; অন্তরের বাইরে চোখ মেলে দেখার মত কোথায় কি আছে যে তিনি সেদিকে নজর দেবেন?

সঙ্কট কালের নির্দেশ হিসাবে গুরুদেব যে খামখানি মিলাকে দিয়েছিলেন, সেখানি মিলার সঙ্গে সঙ্গেই থাকতো। যত্নে আদরে, পরম সম্ভ্রমে কখনো কখনো মিলা সেই শেষ-সম্বলটি মাথায় ছুঁইয়ে, সর্বাঙ্গে বুলিয়ে শান্তি পেতেন। খুলে পড়বার লোভ যে হোত না, তা নয়; কিন্তু মনে মনে বুঝতেন যে তেমন সঙ্কট এখনো আসেনি। গুরুর শ্রীহস্তের স্পর্শধন্য লিপিখানি মস্তকে ধারন ক'রে ঘণ্টার পর ঘণ্টা তিন স্থির সমাধিতে মগ্ন হয়ে স্থাণুর মত বসে থাকতেন।

এই ভাবে, বিছুটিপাতা সিদ্ধ খেয়ে, দেহবোধশূন্য মিলার একটি বৎসর কেটে গেল।

সহসা একদিন এই লোকালয়বর্জিত অরণ্য প্রদেশে মানুষের আবির্ভাব ঘটলো; কিব্রং প্রদেশ থেকে কয়েকটি সখের শিকারী দূর থেকে মিলাকে দেখতে পেয়ে প্রথমে ভাবলো কঙ্কাল-সার প্রেতাত্মা। কাছে এসে, ভালো ক'রে দেখে, তারা যখন বুঝলো যে মিলা সন্ন্যাসী-জাতীয় মানুষ ছাড়া আর কিছুই নয়—তখন তারা সিদ্ধান্ত করলো যে এই নির্জন প্রদেশের অধিবাসীর কাছে আর কিছুই না থাক, প্রচুর খাদ্য-

ভাণ্ডার নিশ্চয়ই লুকানো আছে ; নইলে সে বাঁচে কি খেয়ে ! মিলাকে ধমক দিয়ে তারা বললো—'আমরা ক্ষুধার্ত, যা যেখানে আছে শীঘ্র বার ক'রে দাও—নইলে তোমার ভালো হবে না।' মিলা বললেন, 'আমার যা খাদ্য তোমরা তা খেতে পারবে না ; আমি এই বিছুটি সিদ্ধ খেয়ে বেঁচে আছি ; এ ছাড়া আর কোন খাদ্যই আমার নেই।' খাদ্যের আকৃতি দেখে তারা শিউরে উঠলো। বললো 'ও বিষ খেয়ে কেউ বাঁচে, চোখে দেখলেও আমাদের বিশ্বাস হবে না। ভালোয় ভালোয় কি কোথায় লুকানো আছে বলো ; অস্বীকার করলে তোমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে।' শাস্তির নমুনা-স্বরূপ তারা মিলাকে জোর ক'রে আসন থেকে তুলে আছাড় দিয়ে ফেলে দিল। মিলার দেহে প্রচণ্ড আঘাত লাগলো, কিন্তু মন নির্বিকার। তিনি বললেন, 'আমাকে অপমান ক'রে তোমাদের লাভ কি ? কোন খাদ্যই আমার কাছে নেই : কিন্তু এরকম দুর্ব্যবহার ক'রে কি কারুর কাছে খাদ্য আদায় করা যায় ? আমাকে এভাবে আছাড় দিলেই কি তোমরা খাদ্য পাবে ? সন্ন্যাসীকে আঘাত ক'রে কি তোমরা পুণ্য অর্জন করতে চাও ?'

নির্বিকার মিলার শান্ত কণ্ঠের এই উক্তি শুনে দুর্বৃত্তেরা আরও উত্তেজিত হয়ে উঠলো ; বললো, 'পুণ্য বা পাপ যাই হোক, তোমাকে আমরা সহজে নিষ্কৃতি দেবো না। তোমার সন্ন্যাসী-গিরি আমরা পরখ ক'রে দেখবো।' শীর্ণদেহ মিলাকে আসন থেকে শূন্যে তুলে বারংবার ছুঁড়ে ছুঁড়ে সজোরে আছাড় দিতে লাগলো। এই পাশবিক নির্যাতনেও মিলার ধৈর্যচ্যুতি ঘটলো না ; দৈহিক বেদনাকে ছাড়িয়ে তাঁর মন এই বিপথগামী জীবগুলির প্রতি করুণায় আর্দ্র হয়ে উঠলো। তাঁর মনে হ'ল—'আহা, এরা বড় দুঃখী, ক্ষুধার জ্বালায় এমন বিসদৃশ আচরণ করছে ; এদের কল্যাণ হোক, মনের গতি পরিবর্তিত হোক।' তাঁর চোখে জল দেখে পাষণ্ডের দল অট্টহাস্য করতে লাগলো ; কেবল তাদের মধ্যে একজনের মনে হ'ল—মিলা সাধারণ মানুষ নয়, মিলার

চোখের জল নিছক দৈহিক বেদনার অভিব্যক্তি নয়। সে লোকটি গোড়া থেকেই মিলার অত্যাচারীদের সঙ্গে সহযোগিতা না ক'রে, দূরে দাঁড়িয়ে মিলার ভাব পর্যবেক্ষণ করছিলো। এই নিষ্ঠুর লীলা আর সইতে না পেরে সে দুর্বৃত্তদের নিবৃত্ত করবার জন্য সচেষ্ট হয়ে উঠলো; বললো, 'তোমরা অন্ধ না হলে বুঝতে যে এ এক সত্যিকারের লামা। এই অস্থিচর্মসার দুর্বল মানুষটির উপরে এভাবে বলপ্রয়োগ ক'রে তোমাদের কি লাভ তোমরাই জানো। আমার অনুরোধ তোমরা এ কর্ম থেকে বিরত হও। আমরা ক্ষুধার্ত হয়েছি বলে ওর অপরাধ কোথায়?'

কৃতাঞ্জলি হয়ে সেই লোকটি মিলাকে সম্বোধন ক'রে বললো, 'অসামান্য তোমার সহ্যশক্তি; আমি বুঝেছি তুমি সামান্য মানুষ কখনোই নও। আমি এদের বাধা দিতে পারলাম না, কারণ আমার একার কথা এরা কেউ মানছে না। কিন্তু আমার কথা তুমি স্মরণে রেখো, এদের পাপে আমিও যেন জড়িয়ে না পড়ি। আমার জন্য তুমি প্রার্থনা কোরো।'

দলের একটি লোকের মুখে এই বিজাতীয় উক্তি শুনে সবাই বিদ্রূপের হাসি হাসলো; হাসতে হাসতে উচ্চৈঃস্বরে বললো, 'আর আমরা তোমাকে যে বারংবার তুলেছি, বারংবার ফেলেছি, তার পুণ্যও আমাদের প্রাপ্য—এ কথা যেন তোমার স্মরণে থাকে।'

উচ্চহাস্যে বনভূমি মুখরিত ক'রে দলটি চলে গেল। কিন্তু এত পীড়নেও মিলার এতটুকু ভাবান্তর ঘটলো না; অক্রোধ পরমানন্দ পুরুষ যেমন ছিলেন তেমনি রইলেন। কারও বিরুদ্ধে তাঁর কিছুমাত্র অভিযোগ নেই, মনের মধ্যে নেই অত্যাচারের প্রতিক্রিয়া। আহত অবসন্ন দেহ, কিন্তু সেই আঘাতের বেদনা যে বোধ করবে, অত্যাচারে যে মন ক্ষুব্ধ হবে, অপমানে যে মন ক্ষুণ্ণ হবে, সে মনের অস্তিত্বই যে আর নেই। দেহ যার আঘাতও তার; বাহির ও অন্তর যার একাকার

হয়ে গেছে, তার কাছে, বাইরে থেকে এসে আঘাত হেনে যাবে কে ? বাইরের আঘাত বাইরে পড়ে রইলো—মিলা অন্তরের মাঝে তলিয়ে গেলেন।

ওই স্থানে সেই একভাবে আরও একটি বৎসর কেটে গেল। নিরাবরণ নগ্ন দেহে, স্থানকালের অতীত সত্তায়, দেহবোধের ঊর্ধ্বে অধিষ্ঠিত মিলার দিবারাত্রির কোন হিসাবই ছিল না। জাগতিক সম্পদ বলতে তখন মিলার ছিল কেবল শূন্য ময়দার বস্তাটি। হঠাৎ তাঁর একসময়ে খেয়াল হ'ল এই বস্তাটিকে জোড়াতালি দিয়ে বিছানায় পরিণত করলে কেমন হয় ? পাশের শেলাইগুলি ছিঁড়ে সমান করতে গিয়েই মনে হ'ল—যদি আজ এখনই আমার মৃত্যু হয়, তবে কি সুখশয্যার লোভ নিয়ে আমার হবে ? হাতের কাজ ফেলে রেখে মিলা আবার নিজের মধ্যে ডুব দিলেন। জীর্ণ পশুচর্মের তলার দিকটা টেনে নিম্নাঙ্গ চাপা দিতেন এবং উপরের অঙ্গ ঢাকা দিতেন সেই বস্তা-ছেঁড়া চটের টুকরো দিয়ে। দিনের বেলা, লতা-বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে সেই বস্তার টুকরোই কৌপীনের মত ক'রে দেহলগ্ন হয়ে থাকতো।

দ্বিতীয় ও তৃতীয় বৎসরের মাঝামাঝি, সোরগোল ক'রে সেই অরণ্যভূমিতে এলো আর একদল শিকারী। এদের সঙ্গে প্রচুর খাদ্য-সম্ভার। দূর থেকে মিলাকে দেখে এরাও প্রথমে অপদেবতা মনে ক'রে ভয় পেয়ে গেল। দিনের আলোয় এভাবে সাক্ষাৎ অপদেবতার অভ্যুদয় অসম্ভব ভেবে, ক্রমে সাহস সঞ্চয় ক'রে, তারা মিলার আসনের চারিপাশে ভিড় ক'রে দাঁড়ালো। মিলা বললেন, 'আমি সন্ন্যাসী, ভূতপ্রেত নই, খাদ্যাভাবে আমার দেহ কঙ্কালসার হয়েছে।' যখন তারা চারিদিক অনুসন্ধান ক'রে বুঝলো যে বিছুটিপাতা ছাড়া মিলার অন্য কোনরূপ খাদ্য আশেপাশে কোথাও নেই—তাদের মিলার প্রতি শ্রদ্ধা হ'ল। যাবার সময় মিলাকে ভক্তিভরে প্রণাম ক'রে তাদের উদ্বৃত্ত খাদ্যসম্ভারের কিয়দংশ তারা মিলাকে দিয়ে গেল। তারা

বললো, 'এমন কঠোর তপশ্চর্যার বিবরণ আমরা এতদিন পর্যন্ত কানে শুনেছি ; কিন্তু স্বচক্ষে কখনো দেখিনি। পশুহত্যায় আমরা বহু পাপ করেছি : আমাদের প্রদত্ত এই মাংস গ্রহণ ক'রে আপনি আমাদের সেই পাপ ক্ষালনে সহায়তা করুন—এই আমাদের নিবেদন।'

প্রায় আড়াই বছর পরে মিলা এই প্রথম মানুষের খাদ্য আহার করলেন। তাঁর দেহ-মনে যেন নববলের সঞ্চার হ'ল। আবার কতদিন পরে এমন আহার্য জুটবে কে বলতে পারে ; অতএব যতটুকু অল্পাহারে শরীর রক্ষা করা যায় সেই ভেবেই চলতে লাগলেন। মাংসের সঞ্চয় কিছুদিন জমানো থাকার ফলে, তাতে শেষ পর্যন্ত পোকা কিল্‌বিল্‌ করতে লাগলো, কিন্তু তথাপি এই দুর্লভ খাদ্যকে তিনি বর্জন করতে পারলেন না। শেষ পর্যন্ত পোকার সংখ্যা এমন বেড়ে গেল যে সে মাংস আর পোকা বেছে খাওয়া সম্ভব নয় ; মাংসের অধিকার পোকাদের হাতে ছেড়ে দিয়ে তখন মিলা আবার আগের মত বিছুটি সিদ্ধ খেয়ে সাধনায় লেগে রইলেন। এরই মধ্যে কোথা থেকে সাধুর আস্তানায় হানা দিল এক চোর ;—লোকমুখে সাধুর বিবরণ শুনে তার ধারণা হয়ে থাকবে যে এই নির্জনবাসী তপস্বীর খাদ্যের অভাব নেই। ধ্যানস্থ মিলার আশেপাশে, অন্ধকার রাত্রে চোরকে হাতড়ে বেড়াতে দেখে মিলা হেসে বললেন, 'দিনের বেলায় খুঁজে আমিই তো কিছু পাই না, তবে রাতের বেলা খুঁজে যদি তুমি কিছু পাও—আমার তাতে কিছুমাত্র আপত্তি নেই।' চোর এবং সাধু —দুজনেই সমস্বরে হাসলো। যেখানকার চোর সেইখানেই ফিরে গেল, যেখানকার সাধু সেখানেই রয়ে গেলেন।

মিলার একটিমাত্র আদরের ছোটবোন পেতা সংসারের স্রোতে ভেসে কোথায় যে হারিয়ে গিয়েছেন—সে সংবাদ নিজের জন্মভূমিতে শেষ বারের জন্য ফিরে গিয়েও মিলা সংগ্রহ করতে পারেন নি। জীবনে

হতে পারে—সে সম্ভাবনাও ছিল সুদূরপরাহত। কিন্তু নিয়তির বিধান ছিল অন্যরকম। যে অরণ্যময় অঞ্চলে মিলা তপস্যা করছিলেন —সেখানে একমাত্র শিকারীরা ছাড়া, সহরের মানুষ আর কেউই বড় একটা আসতো না। এমনি একটি শিকারীর দলের মাধ্যমেই মিলার সংবাদ পেতার কানে গিয়ে পেঁছালো। ঘটনাটি যেভাবে ঘটলো তা এইরূপ: সেদিনও মিলা প্রতিদিনের মত ধ্যানের আসনে উপবিষ্ট ছিলেন; নির্বাত নিষ্কম্প শিখাটির মত তাঁর চিত্ত অন্তরের দীপাধারে কেন্দ্রীভূত হয়ে এসেছে—এমন সময়ে কে যেন তাঁর দেহে প্রচণ্ড এক খোঁচা দিল। চোখ মেলে দেখলেন—সামনে কয়েকজন শিকারী। এক ব্যক্তি আর একজনকে সম্বোধন ক'রে বললো—'দেখলি তো, এটা মানুষই, ভূত নয়: ভূত হলে আর ধনুর্গুণের একটা খোঁচায় চোখ মেলে চাইতো না।' মিলাকে নিঃশব্দে চেয়ে থাকতে দেখে, অপর ব্যক্তি সভয়ে বলে উঠলো—'কি জানি বাপু; খোঁচা খেয়ে কথা বলে না এক মরা মানুষ। এর আকৃতি প্রকৃতি দেখে জ্যান্ত মানুষ বলে আমার কিন্তু এখনও মনে হচ্ছে না, কারণ চোখ মেলে চাইতে কি আর ভূতেও পারে না? তার চেয়ে চল আমরা এখান থেকে পালাই।'

বাদ-প্রতিবাদ শুনে মিলা হেসে বললেন, 'আমাকে দেখে অনেকেই তাই ভাবে বটে; কিন্তু তোমাদের ভয়ের কোন হেতু নেই, কারণ আমি রক্তমাংসের মানুষই বটে।' মিলার মুখে হাসি দেখে প্রথম ব্যক্তি বললো, 'তোমার মুখ আমার চেনা চেনা বোধ হচ্ছে: অনেক দিন আগে,—প্রায় বছর তিনেক আগে তোমাকে তোমার জন্মভূমিতে দেখেছিলাম—তোমার নামই তো মিলা?' মিলা বললেন 'হ্যাঁ, আমিই মিলা।' লোকটি বললো, 'শুনেছিলাম তুমি বিরাট শক্তিধর, তার উপরে লামা হয়েছে; তোমার যে এমন দশা দেখবো তা আমি কল্পনাও করিনি। আমি তো জানি ধার্মিক লোকেরা ভালো খায় ভালো পরে।

আমরা তোমার অতিথি—কিছু আহারাদির ব্যবস্থা করো।' মিলা হেসে বললেন, 'আমার খাদ্য তোমাদের রুচবে না—অতএব সে চেষ্টায় লাভ নেই।' লোকটি বললো, 'খুব রুচবে ; ক্ষুধার সময়ে যা জোটে তাই রোচে। তুমি যা খাও তাই আমি খাবো।' মিলা বললেন, 'বেশ, ঐ বিছুটি শাক তুলে, হাঁড়িটি আগুনে চাপিয়ে দাও।' লোকগুলি ব্যবস্থায় লেগে গেল, মিলা খোলা-চোখেই নিজের মধ্যে মগ্ন হয়ে রইলেন। কিছুক্ষণ পরে তারা বললো, 'জল ফুটছে, হাঁড়িতে আর কি দেবো ?' মিলা পূর্ববৎ একভাবে থেকেই বললেন, 'আরও শাকের ডগা দাও।' আবার কিছুক্ষণ পরে তারা বললো, 'মশলাপাতি কোথায় ? মাংস, হাড়, পিঁয়াজ, আদা, ময়দা, নুন—এ সব না হ'লে কি ক'রে রান্না হবে ?' মিলা বললেন, 'কোথায় কি পাবো ? দরকার হ'লে আরও শাক ওতে দিতে পার, কারণ ওই এক ছাড়া দ্বিতীয় খাদ্যের আয়োজন এখানে নেই।' অতিথি বিরক্ত হয়ে বললো, মশলার বদলেও শাক, নুনের বদলেও শাক—এ কখনো মানুষে খেতে পারে ?' প্রসন্ন হাস্যে মিলা বললেন, 'এই খেয়েই তো আমার কয়েক বছর কেটেছে।' মিলার মুখের হাসি দেখে সেই লোকটি অধিকতর বিরক্ত হয়ে বললো, 'এর মধ্যে তো তোমার পৌরুষ কিছু নেই ; লোকের বাড়ি পেটভাতায় কাজ করলেও তো এর চেয়ে ভালো খাবার মানুষের জোটে। তোমার এই কদর্য জীবনযাত্রা দেখলে করুণাও হয় ঘৃণাও হয়। তুমি মনুষ্য নামের কলঙ্ক।'

মিলা উদ্দীপ্ত হয়ে বললেন, 'ওকথা বোলো না। আমার জীবন যদি কলঙ্কের, তবে গৌরব কার। আমার মত সৌভাগ্য আর ক'জনের ভাগ্যে ঘটেছে ? সাক্ষাৎ মার্পার কাছে আমি বুদ্ধত্বের দীক্ষা পেয়েছি, এমন সত্য পথের শিক্ষা পেয়েছি যাতে এই জন্মেই হবে আমার নির্বাণ-প্রাপ্তি। জাগতিক সুখের মোহকে আমি স্বেচ্ছায় বিসর্জন দিয়ে এই নির্জনে তপস্যায় নিযুক্ত আছি। আমি কি পেয়েছি তোমাকে কেমন

ক'রে বোঝাবো? মুখের ভাষায় সে অনন্তকে আমি কেমন ক'রে প্রকাশ করবো। যেটুকু বঞ্চনা আমি বরণ ক'রে নিয়েছি সে যে কত অকিঞ্চিৎকর, কত তুচ্ছ—সে তুমি কি জানবে? একমুষ্টি অন্ন, একখণ্ড বস্ত্র, অর্থহীন লোকমান্য বর্জন ক'রে তারই বিনিময়ে আমি দেবদুর্লভ জ্ঞানের পথে চলেছি। আমাকে তোমার ঘৃণ্য বলে মনে হ'লে আমার তাতে কিছুই ক্ষতি নেই; কিন্তু যে দেশে বুদ্ধের সমাজ সেখানে জন্ম-গ্রহণ ক'রে নিজের আত্মাকে কোন্ দুর্গতির অতলে তুমি দিনে দিনে ডুবিয়ে দিচ্ছো, সে কথা কি তুমি মুহূর্তের জন্যও চিন্তা ক'রে দেখেছো? কঠিন প্রস্তর-শয্যায় কত আরাম, কদর্য আহারে কত তৃপ্তি, তপশ্চর্যার সংযমে কত আনন্দ, তোমাকে আমি কেমন ক'রে বোঝাবো? অতৃপ্তি কোথাও নেই, নিরানন্দ কোথাও নেই। যোগীর জগৎ আনন্দের জগৎ, যোগী কারুর করুণার পাত্র নয়।'

তখন পশ্চিম গগন অস্তগামী সূর্যের আলোয় রক্তিমাভ হ'য়ে উঠেছিল; সেই দিকে দৃষ্টি পড়তেই মিলা সচকিত হয়ে বললেন, 'কিন্তু বন্ধু, আর বিলম্ব কোরো না, ওদিকে সন্ধ্যা ঘনিয়ে আসছে: বিনা আলোকে পার্বত্য পথে চলা বড় কঠিন। তা ছাড়া—আমারও সময় বড় অল্প; কখন অতর্কিতে মৃত্যু এসে হানা দেবে কে বলতে পারে? বাজে কথায় অমূল্য সময় অনেক ব্যয় করেছি। আর নয়।'

কিয়াঙা-সা নগরের এক বাৎসরিক উৎসবে, ঘটনাচক্রে, এর কিছুদিন পরেই, এই শিকারীদের সঙ্গে পেতার সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তারা মিলার কথাই আলোচনা ক'রে নিজেদের মধ্যে হাস্যপরিহাস করছিলো, এমন সময়ে পেতাকে পাশ দিয়ে যেতে দেখে, তাদের একজন তাকে ডেকে বললো, 'কি আশ্চর্য! আমরা তোমারই দাদার কথা বলছিলাম।'

ব্যথায় বিবর্ণ হয়ে পেতা বললেন, 'আমাকে নিয়ে তোমাদের এই নিষ্ঠুর পরিহাস কেন? আমি তো তোমাদের কোন অনিষ্টই করিনি।

তোমরা ভালো ক'রেই জানো আমার দাদা বহুদিন ধরে নিরুদ্দিষ্ট। আমার বাবা নেই, মা নেই, ত্রিসংসারে আপন বলতে আমার কেউ নেই। তবে, আজ এতদিন পরে, আমার দাদার কথা তুলে কেন আমাকে তোমরা কাঁদাতে চাও?'—এই কথা বলেই পেতা আর্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠলেন;—মজা দেখবার জন্য, সেই উৎসবক্ষেত্রেই বহুলোকের ভিড় জমে গেল। ক্রন্দনের ধ্বনি শুনে জেসেও ভিড় ঠেলে সেখানে এসে উপস্থিত হলেন। রোরুদ্যমানা পেতাকে দু-হাতে বুকে জড়িয়ে জেসে বললেন, 'ওরা সত্যি কথাই বলেছে। ড্রাকারটাসো গুহায় মিলা আছে, আমিও শুনেছি। তুমি একদিন নিজেই গিয়ে খোঁজ নিয়ে এসো; তারপরে, তোমাতে আমাতে একবার গিয়ে ঘুরে আসবো।'

এতকাল পরে দাদার সংবাদ পেয়ে পেতা আর স্থির থাকতে পারলেন না। একপাত্র ছাং ও সামান্য কিছু ময়দা নিয়ে সেই দুর্গম প্রদেশের অভিমুখে যাত্রা করলেন। গুহার পথ জানা নেই, কিন্তু লোকের কাছে জিজ্ঞাসা করে জেনেছিলেন যে পার্বত্য পথ উপরের দিকে উঠতে উঠতে ঝর্ণার পাশে গিয়ে অকস্মাৎ শেষ হয়েছে, তারই একান্তে সেই গুহা।

শ্বাপদশঙ্কুল এই পার্বত্য প্রদেশে শিকারীরা ছাড়া আর কেউই বড় একটা আসতো না। দুর্গম খাড়া পথে, নিছক মনের জোরে, অনেক দূর পর্যন্ত চলে এসে ঝর্ণার মুখ পর্যন্ত পৌঁছাতে পৌঁছাতে বেলা অনেক হয়ে গেল। ধারে কাছে লোকালয়ের চিহ্ন পর্যন্ত নেই, মানুষের হাতেগড়া পথের রেখাটুকুও চোখে পড়ে না। উদ্‌ভ্রান্ত হয়ে এদিক ওদিক চাইতে চাইতে, ঝর্ণার ধারে একটি বৃহৎ বৃক্ষমূলে, অনতিবৃহৎ একটি গুহার প্রবেশদ্বার তাঁর চোখে পড়লো। কৌতূহলী হয়ে পেতা সেইদিকেই অগ্রসর হলেন এবং কিছুদূর গিয়েই বিস্ময়ে ভয়ে স্তব্ধ হয়ে দাঁড়িয়ে গেলেন। চোখে পড়লো নীলাভ সবুজ রঙের একটি কঙ্কালসার দেহ; মুখের উপরে চোখের বদলে দুটি গভীর গহ্বর, মাথার উপরে

একবোঝা চুলের পাহাড়। ভয়ে ভয়ে দু-এক পা এগিয়ে গিয়ে, ভালো ক'রে দেখেও কিছুতেই তিনি ধারণা করতে পারলেন না যে সে দেহে জীবনের কিছুমাত্র লক্ষণ আছে। অপদেবতা ভ্রমে তাড়াতাড়ি পালাতে গিয়ে দেখলেন যে আতঙ্কে পা দুটি একেবারে অসাড় অচল হয়ে গেছে। তাঁর মুখ দিয়ে অস্ফুট আর্তনাদের মত একটা স্বর নির্গত হ'ল। সেই জন্যই হোক বা অন্য যে কোন কারণেই হোক—উপবিষ্ট কঙ্কালমূর্তির দুটি চোখ উন্মীলিত হ'ল দেখে পেতা সাহসে ভর ক'রে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কে তুমি, মানুষ না আর কিছু?' ক্ষীণ কণ্ঠে উত্তর পেলেন, 'আমি মিলা।'

কণ্ঠস্বরে মিলাকে চিনতে পেরে ভাবাবেগে পেতা আকুল হয়ে কেঁদে উঠলেন এবং পরক্ষণেই, ছিন্নমূল তরুর মত, গুহার মুখে অজ্ঞান হয়ে পড়ে গেলেন। মিলা আসন ছেড়ে উঠে, তাঁর মুখে মাথায় ঝর্ণার জল ছিটিয়ে, অনেক যত্নে তাঁর চৈতন্য সম্পাদন করলেন। মিলার কোলের উপরে মুখ গুঁজে, পেতা বহুদিনের বহুকথা স্মরণ ক'রে আর্তনাদ করতে লাগলেন। তিনি কাঁদতে কাঁদতে বললেন, 'এতদিন পরে যে এভাবে তোমার দেখা পাবো, তা আমি ভাবতেও পারিনি; মানুষের যে এমন আকৃতি হতে পারে, স্বচক্ষে না দেখলে আমি বিশ্বাস করতেও পারতাম না। আমি যে কতবড় হতভাগিনী—এই তার আর এক প্রমাণ। তোমাকে একবার শেষ দেখা দেখবার জন্য অতৃপ্ত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে মা মারা গেলেন; তাঁর মৃতদেহ সৎকারের জন্যও কেউ আমাদের ছায়া মাড়ালো না। নিরুপায় নিরাশ্রয় হয়ে আমি রাতের অন্ধকারে একবস্ত্রে গৃহত্যাগ ক'রে সেই যে বেরিয়ে এলাম—সেই থেকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে আমার দিন চলে। পথের কুকুরের মত পরের অন্নে আমার দিন কাটে। তুমি জীবিত কি মৃত কিছুই জানি না। এতকাল পরে যদি বা তোমার দেখা পেলাম—তুমি যে রক্তমাংসের মানুষ, তাও তো বোঝবার উপায় নেই; এতখানি দৈন্য যে কোন

মানুষের হতে পারে, তাও আমার কল্পনার অতীত ছিল। তোমাকে দেখে আমার মনে ধারণা হয়েছে যে আমাদের মত ভাগ্যবিড়ম্বিত পৃথিবীতে বোধ করি আর কেউ কোথাও নেই।'

মিলা বহুভাবে পেতাকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করলেন। বললেন, 'না পেতা, তুমি অনর্থক ভাগ্যকে দোষ দিচ্ছো। সাংসারিক দুঃখকষ্টকে কখনোই বড় ক'রে দেখতে নেই, কারণ এ সবই আজ আছে কাল নেই। সুখ দুঃখ উভয়ই ক্ষণস্থায়ী। একমাত্র সত্য—যার ক্ষয়ব্যয় নেই, পরিবর্তন নেই—আমি সেই পথের পথিক। জন্মসূত্রে যে জীবন আমি পেয়েছি, তার কৃতজ্ঞতার ঋণ শোধ করবার জন্য আমি এই কঠিন পথ বেছে নিয়েছি। তাই আমার এই কদর্য বাসস্থান যে-কোন মানুষের অযোগ্য ; এই দেখো, কি খেয়ে জীবনধারন করি ; এ খাদ্য যে মানুষের উপযুক্ত নয়—তা কি আমি জানি না ? কঙ্কালের মত এই আমার দেহ দেখলে শত্রুরও চোখে জল আসবে। ক্ষ্যাপার মত আমার স্বভাব, নিঃস্ব আমার অবস্থা, অপরিসীম দারিদ্রের ছাপ সর্বাঙ্গে। আমাকে দেখে তুমি যে ব্যথা পাবে, হতাশ হবে—তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই। কিন্তু বোনটি, তোমার দাদার রাজৈশ্বর্য তুমি দেখোনি—যে ঐশ্বর্য আমার অন্তরের বোধিসত্বায়, যে কোন দিগ্‌বিজয়ীরও সে ঈর্ষার বস্তু। এই শীতল কঠিন প্রস্তরের আসনে আমি যখন সমাধিস্থ হয়ে থাকি, তখন আমার দেহাস্থি থেকে মাংস ত্বক্ খণ্ড খণ্ড ক'রে বিচ্ছিন্ন করলেও আমার দেহ সে ক্ষতি টের পাবে না। ভিতরে বাহিরে আমার দেহ এই নিত্য দিনের একমাত্র ভক্ষ বিছুটির মত সবুজ হয়ে গেছে ; আমার সমগ্র অন্তর একটি মাত্র বেদনায় জাগ্রত হয়ে আছে। ভেবে দেখো, পেতা, এ জন্মে না হয় পরজন্মে তোমার দাদা বুদ্ধত্বের অধিকারী হতে চলেছে : সামান্য দুঃখে তোমার অভিভূত হবার কোন কারণ নেই। আমি বলি তুমিও ধর্মের পথে আমার অনুগামী হও, এখন থেকে ত্যাগের পথে এগিয়ে চলো।'

পেতা দুঃখের মধ্যেও ম্লান হাসি হাসলেন, বললেন, 'রক্ষা করো, তোমার এ পথ আমার নয়। আমার আছেই বা কি যে আমি ত্যাগ করবো। তোমাব কি পথ আমি জানি না, বোঝবার সাধ্যও আমার নেই। এই যদি সত্য পথ হয় তবে অন্য ভক্তেরা এই পথেই বা চলে না কেন। তোমার মত এতখানি না পারলেও, তারা কি আর আংশিক ভাবেও এই পথে চলতে পারতো না! এভাবে সাধনা করে, এমন একজনও তো আমার চোখে পড়লো না।'

পেতা কিছুক্ষণ পরেই চলে গেলেন, কিন্তু পেতার আনীত মানবীয় খাদ্য গ্রহণ ক'রে সেদিন মিলার ধ্যানই জমলো না। কয়েকদিন পর্যন্ত এই শারীরিক ও মানসিক অস্বস্তির জের চললো। এরই মধ্যে বেশ কিছু খাদ্যসম্ভাব সঙ্গে নিয়ে পেতা ও জেসে উভয়েই একসঙ্গে এসে হাজির হলেন।

মিলা তখন নগ্ন দেহে ঝর্ণা থেকে জল আনতে বেরিয়েছেন; দূর থেকে এই দিগম্বর পুরুষকে দেখে দুই বন্ধুই স্বাভাবিক সঙ্কোচে মুখ ফিরিয়ে, অনুকম্পায় কেঁদে ফেললেন। দুজনে সমবেত ভাবে মিলাকে অনুরোধ জানালেন—আর কিছু না হোক, মিলা যেন মানুষের মত বাঁচবার চেষ্টা করেন, অন্ততঃ মুষ্টি ভিক্ষা গ্রহণ ক'বেও যেন নিজের জীবিকা অর্জনের প্রয়াস করেন, কারণ এভাবে উন্মাদের মত বেঁচে থাকার কোন অর্থ হয় না।

মিলা বললেন, 'সে কেমন ক'রে হয়? সময় বড়ই অল্প, মাথার উপরে উদ্যত মৃত্যুকে তুচ্ছ ক'রে ভিক্ষায় বেরুবার সময় কোথায়? ক্ষুধায় মরি, শীতে মরি, সেও আমার সইবে, কারণ যে কোন অবস্থায় সত্যের জন্য মরণে পরিতৃপ্তি আছে। আত্মীয়, বন্ধু, সংসার, অর্থ, আরাম—এই সমস্ত বজায় রেখে, ভালো খেয়ে ভালো প'রে যারা ধর্মের ভান ক'রে, আমি তাদের দলে নই। কিসের বিনিময়ে তারা কি পায় তা আমি জানি। সে রকম ধর্মে আমার অভিরুচি নেই। তোমাদের

আর আসতেও হবে না, খাদ্য বা বস্ত্রখণ্ডে আমার প্রয়োজনও নেই। খাদ্যের জন্য ভিক্ষা করা আমার কর্ম নয়, তোমাদের উপদেশ আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।'

অশ্রুসিক্ত নয়নে রোষভরে পেতা বললেন, 'তা কেন করবে? বরং আরও বেশি ক'রে শরীরকে নিগ্রহ করবার কোন পদ্ধতি জানা থাকলে, বোধ করি তাতেই তুমি খুশি হতে। আমাদের কথায় তুমি কান দেবে কেন? যাতে তোমার তৃপ্তি হয়, তাই তুমি প্রাণভরে করো; আরও যতখানি অত্যাচার নিজের উপরে করতে পারো তাই তুমি করো।'

মিলা সহাস্যে বললেন, 'যাকে তুমি দুঃখ বলছো, এ তো কোন দুঃখই নয়; সংসারের ক্ষেত্রে নিত্যনিয়ত যে দুঃখের বীজ লোকে বপন ক'রে চলেছে—তার তুলনায় এ কোন দুঃখই নয়। এই দুঃখের মধ্যেই আমি ভাল আছি। সবার চোখের আড়ালে, সমস্ত সংসারের অলক্ষ্যে, এই নির্জনেই যেন আমার জীবনের পরিসমাপ্তি ঘটে। আত্মীয়েরা আমার আনন্দ নাই বা জানলো, শত্রুরা নাই বা জানলো আমার দুঃখ। বার্ধক্য আসুক, রোগ আসুক—কেউ যেন না জানে; মৃত্যু আসুক সবার অজ্ঞাতসারে, প্রাণহীন শবদেহ একান্তে পড়ে থেকে কৃমিকীটের ভক্ষ্য হোক। এমনি মৃত্যুই আমার একমাত্র কামনা। আমার মৃত্যু-শয্যার পাশে কোন মানুষের পদচিহ্ন পড়ে, এ আমি চাই না। মৃত্যুর পরে কারুর কোন শোকোচ্ছ্বাস আমার কাম্য নয়। আমার গতিবিধি যেন কেউ না জানে, আমার গন্তব্য নিয়ে কেউ না আলোচনা করে—এই আমার প্রার্থনা। আমার জীবনে মরণে এই নির্জনতা, নিঃসঙ্গতা, একাকিত্ব আমি বরণ ক'রে নিয়েছি। এ ছাড়া দ্বিতীয় কোন প্রার্থনা আমার নেই: শ্রীগুরুর আশীর্বাদে আমার এই প্রার্থনা যেন সফল হয়।'

মিলার কথা শুনে, জেসে বললেন, 'তোমার কথায় ও কাজে যে সামঞ্জস্য আছে তা আমি স্বীকার করি।' পেতা বললেন, 'চাও বা

না চাও, তোমার এ দৈন্য আমার সহ্য হয় না। পেটভরে একটু আহার করলে, কিংবা একখণ্ড বস্ত্রে দেহ আবৃত করলেই যে তোমার ধর্মবস্তু কর্পূরের মত উপে যাবে, এ কথা আমি কোনমতেই মানতে পারি না। লোকের দ্বারে ভিক্ষা করবে না—এমন পণই যখন তোমার, এই নির্জনেই যে তোমার মৃত্যু হবে তাতে আর সন্দেহ কি! যদি তেমনি মৃত্যুই তোমার কাম্য হয়, তাতে কার কি বলবার থাকতে পারে? তোমার জন্য বস্ত্রখণ্ড সংগ্রহ ক'রে, আবার আমি কিছু খাদ্য নিয়ে ফিরে আসবো। যদি ততদিন পর্যন্ত বেঁচে থাকো—আবার দেখা হবে।'

সংসারে মিলার একমাত্র স্নেহাস্পদ বলতে যে দুটি প্রাণী অবশিষ্ট ছিলেন, তাঁরা দুজনেই অব্যক্ত বেদনা বুকে নিয়ে ধীরে ধীরে পার্বত্য পথ ধরে দৃষ্টিসীমার বাইরে অন্তর্হিত হয়ে গেলেন। বনভূমির নির্জনতার বুকে একক পুরুষ অদ্বিতীয় রূপে বিরাজ করতে লাগলেন। কিন্তু সমাধির যে বিঘ্ন ইতিপূর্বেই শুরু হয়েছিল, তার কোন প্রতিবিধান হ'ল না; মিলা অস্থির হয়ে উঠলেন। আসনে গিয়ে বসেন নামমাত্র; সারা দেহ মন যেন একসঙ্গে বিদ্রোহ ঘোষণা করেছে। আসন থেকে টলতে টলতে উঠে আসেন, বরফের মত শীতল জলে অবগাহন ক'রেও দেহের জ্বালা যায় না। অন্ধকার আকাশের গায়ে বৃক্ষশাখাগুলি জড়াজড়ি ক'রে চোখের সামনে খাড়া হয়ে থাকে; পাতার ফাঁকে ফাঁকে আকাশের তারাগুলি জ্বল্‌জ্বল্‌ ক'রে জ্বলতে থাকে। গুহার বাইরে এসে অস্থির পদে কিছুক্ষণ পদচারণা ক'রে তিনি আবার আসনে গিয়ে বসেন—কিন্তু বৃথা চেষ্টা, তাঁর নিজের দেহ নিজের মন যেন আর নিজের বশে নেই। ক্ষিপ্তের মত দু'হাত দিয়ে নিজের রুক্ষ চুলগুলি টেনে টেনে ছেঁড়েন; আবার আসন ছেড়ে উঠে পড়েন। এমনি ক'রে সারারাত্রি কাটে; প্রত্যেকটি প্রহর যেন অনন্তকালের মত দীর্ঘ হয়ে ওঠে; উত্তপ্ত মস্তিষ্কে এলোমেলো চিন্তাগুলি জট পাকিয়ে তাঁকে যেন পাগল ক'রে তোলে।

এইবার তাঁর মনে হল—সাধক জীবনে এর চেয়ে বৃহত্তর সঙ্কট আর কি হতে পারে? শ্রীগুরুর দেওয়া গোপন নির্দেশ খুলে দেখবার এই তো সময়। ভোরের আলো জাগার সঙ্গে সঙ্গে তিনি সন্তর্পণে সংরক্ষিত লিপিখানি খুলে পড়লেন। দিনের আলোর মত সমস্ত রহস্য পরিষ্কার হয়ে গেল। সর্বজ্ঞ মহাগুরু ঠিক এই অবস্থাটির কথা ভেবেই বিভিন্ন ক্রিয়ার বিধান দিয়েছেন: এই সঙ্কটকালে গ্রহণীয় খাদ্যের যে বিধান দিয়েছেন, দৈবযোগে পেতা ও জেসে তদনুরূপ খাদ্যই তাঁর কাছে পৌঁছে দিয়ে গেছেন। শ্রীগুরুর চরণে প্রণিপাত জানিয়ে, মিলা আদিষ্ট পন্থায় সাধনা শুরু করলেন। মন্ত্রের মত তাঁর সমস্ত জ্বালা জুড়িয়ে গেল; নাভিমূলে সুষুম্না চক্রের ক্রিয়া যেখানে স্তব্ধ হয়ে ছিল সেখানে যেন তড়িৎশক্তি জাগ্রত হ'ল এবং সঙ্গে সঙ্গে মিলা গভীর সমাধিতে নিমগ্ন হয়ে গেলেন। স্তরের পরে স্তর অতিক্রম ক'রে তিনি উচ্চতম জ্ঞানের শ্রেষ্ঠতম উপলব্ধির আস্বাদ লাভ করলেন। তিনি প্রত্যক্ষ করলেন যে সংসার ও নির্বাণ যেন একটি নির্বিকল্প অবস্থার দুটি বিভিন্ন অথচ সংশ্লিষ্ট রূপ—মন ও মহামানবের মত পরস্পরের সঙ্গে অঙ্গাঙ্গীভাবে বিজড়িত। দেহের মধ্যে যিনি দেহাতীত, রূপের মধ্যে যিনি অরূপ, স্থূলের মধ্যে যিনি সূক্ষ্ম, তিনি সেই 'মহতোমহীয়ানের' উপলব্ধি লাভ ক'রে ধন্য হলেন। ধ্যানযোগে যে বীজটি উপ্ত হয়েছিল, উপযুক্ত কালের অপেক্ষায় যেন সে মাথা তুলে দিনের আলোয় আত্ম-প্রকাশ করতে পারছিল না। তিনি বুঝলেন যে বাধা বিঘ্ন, সুযোগ দুর্যোগ কিছুই আকস্মিক নয়; জন্মজন্মান্তরের একটিমাত্র অচিন্তনীয় পরিণতির ধারা ঘটনায় ঘটনায় রূপে রূপে নিজেকে বিস্তারিত ক'রে চলেছে, এবং উপলক্ষে উপলক্ষে, কার্য কারণের সমন্বয়ে, আবর্তে আবর্তে, বন্ধনে মুক্তিতে, একটি মাত্র অলঙ্ঘনীয় লক্ষ্যপথের পানে দুর্বার গতিতে ছুটে চলেছে। তার মধ্যে গুরু-নির্দিষ্ট সমাধানেরও যেমন স্থান, সাময়িক সঙ্কটেরও তেমনি স্থান। জেসে ও পেতার অপ্রত্যাশিত

সাহায্যও এই ক্রমবিবর্তমান স্রোতের একটি অপরিহার্য আবর্ত বুঝে তাঁর অন্তর তাদের প্রতিও কৃতজ্ঞতায় উদ্বেল হ'য়ে উঠলো। সমগ্র সৃষ্টির মধ্যে যে একটিমাত্র ঐক্য, যে ঐক্যে মৃত্তিকার অঙ্কুর আকাশের ধারাবর্ষণে পরিপুষ্ট হয়ে, আলোকের পানে মুখ তুলে হাসে এবং পরিশেষে সমগ্র জীবজগৎকে নিঃশেষ আত্মদানে পরিতৃপ্ত করে, তারই উদ্দেশে তাঁর হৃদয় আনন্দের স্তরে ঝঙ্কৃত হয়ে উঠলো। পরক্ষণেই তিনি নিস্তরঙ্গ অন্তরের গভীরতম লোকে নিজের মধ্যে বিলুপ্ত হয়ে গেলেন। তাঁর সাধক জীবনের শেষ অধ্যায় শুরু হয়ে গেল।

উপলব্ধির পরে উপলব্ধি, শক্তির পর শক্তি, বিভূতির পর বিভূতি ভিড় ক'রে এলো তাঁর জীবনের দ্বারে। বায়ুব চেয়ে তিনি লঘু, অণুর চেয়ে তিনি অণু, অনন্তের মত িনি অনন্ত হয়ে—সর্বতোমুখী শক্তিতে সর্ব দেহে সর্ব স্থানে পরিব্যপ্ত হয়ে গেলেন। দূর হয়ে উঠলো নিকট, অপ্রাপ্য হয়ে উঠলো হস্তামলকবৎ অধিগত, ইচ্ছানুগ হ'ল গতি, বাধাহীন বন্ধনহীন, স্থানকালের অতীত হয়ে তিনি ইচ্ছাময় রূপে আত্মানন্দে বিচরণ করতে লাগলেন। এক মিলা যেন সহস্র মিলায় রূপান্তরিত হয়ে সহস্রভাবে বিভাজিত নিগূঢ় সত্তায় সঞ্চরণশীল হয়ে উঠলেন। জ্ঞানের অন্ত নেই, শক্তির অন্ত নেই, আনন্দের অন্ত নেই। কিন্তু এই বিভূতির খেলাটি শিশুর মত ক'রে কিছুদিন খেলেই, তিনি আবার পূর্বের মত সমাধির অতলে তলিয়ে গেলেন। প্রথম প্রথম যে খেলায় মজা লাগতো, পরে ভেবে দেখলেন সে খেলায় সুখ নেই। আকাশ দিয়ে সশরীরে উড়ে যেতে যেতে, নাগাধিরাজের শৃঙ্গে শৃঙ্গে ধ্যানের আসন পেতে বসেও, আবার নিজের খেয়ালের খুশিতে নিজের আসনটিতে নিশ্চিন্ত হয়ে বসলেন। আকাশে পরিভ্রমণকালে দু'একবার কৌতূহলি লোকদৃষ্টির সামনে পড়ে গিয়ে তাঁর মনে ভয় হ'ল পাছে সিদ্ধাইয়ের আকর্ষণে লোক সমাগম শুরু হয়ে গিয়ে আশ্রমপীড়ার সূত্রপাত হয় এবং এইভাবে ক্রমে ক্রমে লোকমান্যের লোভ তাঁকে

পেয়ে বসে। এই সব ভেবে চিন্তে মনে স্থির করলেন যে এতদিনের তপস্যাক্ষেত্র পরিত্যাগ ক'রে ল্যাপচী-চুবারের নিভৃত গিরিকন্দরে আশ্রয় নিয়ে, অবশিষ্টকাল লোকলোচনের বহির্দেশে সমাধিমগ্ন হয়ে থাকবেন।

সঙ্গে নিয়ে যাবার মত তৈজসপত্রের মধ্যে ছিল কেবল মৃত্তিকার একটি রন্ধন ভাণ্ড—যে পাত্রে এতদিন পর্যন্ত বিছুটি পাতার ঝোল রান্না হয়েছে, সেই পাত্রটি। এই বহুমূল্য সম্পদটি পিঠে ঝুলিয়ে নগ্নদেহে গুহার বাইবে আসতে গিয়ে, দুর্বল দেহে মিলা অকস্মাৎ পা পিছলে পড়ে গেলেন এবং সঙ্গে সঙ্গে পাত্রটিও গড়িয়ে পড়ে চূর্ণ বিচূর্ণ হয়ে গেল। ক্ষতির দিক দিয়ে ব্যাপারটা সামান্য হতেও সামান্য। তাঁর জীবনে পথের নেশায়, তিনি এব চেয়ে অনেক বড় ক্ষতিকেও দু'পায়ে মাড়িয়ে মাড়িয়ে—এত দূব পর্যন্ত চলে এসেছেন। কিন্তু এখনকার মন যে অন্য সুবে বাঁধা ; তাই এতটুকু একটা তুচ্ছাতিতুচ্ছ ঘটনাকে উপলক্ষ ক'বেও মনের মধ্যে চিবন্তন সুবটি ঝঙ্কাব দিয়ে উঠলো। শক্তিব খেলাও যে এক হিসাবে সংসারের খেলারই রূপান্তব ; এও যে মৃত্তিকার পাত্রের মতই একটা অধ্রুব, ভঙ্গুর বস্তু—এই সত্যটি তিনি, আর একবার, মগ্নচৈতন্যে—যেন নতুন ক'বে লাভ কবে, আনন্দে বিস্ময়ে বিহ্বল হয়ে, নিজের মনে উচ্চৈস্বরে গান গেয়ে উঠলেন : এই যে আমার এতদিনের মৃত্তিকার ভাণ্ড, তাও মুহূর্তেব মধ্যে অনস্তিত্বে পরিণত হয়ে গেল। যা ছিল তা আর নেই। জীবনে যা কিছু থাকে, তা ধ্বংস হবার জন্যই থাকে ; কোন কিছুকেই জোর ক'রে আগলে রাখা যায় না। এই ভগ্ন ভাণ্ডের চূর্ণগুলি জীবনের প্রতীক ; এরাও আমার গুরু। কিছুই যে চিরস্থায়ী নয়, এই শিক্ষাই আমি পেলাম এদের কাছে।

ভগ্নভাণ্ডের খণ্ডগুলি শিরে ধারন ক'রে মিলা যখন আত্মহারা হয়ে গান গাইছিলেন, তাঁর সুর-মাধুর্যে আকৃষ্ট হয়ে এক শিকারির দল

সেই স্থানে এসে উপস্থিত হ'ল। মিলাকে তদবস্থায় দেখে তারা জিজ্ঞাসা করলো, 'ব্যাপার কি সাধু? এই ভাঙা ভাণ্ডের টুকরোগুলি এত সমাদরে মাথায় নিয়ে কি এত গান গাইছো? আমাদের সঙ্গে খাদ্য আছে, খেতে চাও তো বল।'

প্রদত্ত খাদ্য মিলা সাদরে গ্রহণ করলেন। শিকারিদের একজন বললো, 'তোমার দেহ দেখে মনে হয় যেন প্রচণ্ড শক্তির আধার। তবে কেন এত কষ্ট ক'রে এই অরণ্যে পড়ে আছো? ইচ্ছা করলে তুমি অশ্বারোহী বীরের মত বিশ্ব জয় করতে পারো। আশ্রিত প্রতিপালন ক'রে, শত্রুদের জয় ক'রে, বাহুবলে বা বাণিজ্যে শ্রেষ্ঠতম সম্মানের মর্যাদা লাভ করতে পারো। তবে কেন সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে, নিজেকে এমন ক'রে প্রবঞ্চিত ক'রে রেখেছো?' মিলাকে নিঃশব্দে আহার করতে দেখে, তাদের মধ্যে আর একজন বললো—'বাজে কথা রাখো; এখানে তোমার উপদেশ খাটবে না; দেখছো না, এ লোকটি সত্যিই একজন উঁচুদরের সাধক। তার চেয়ে, ওঁর মিষ্টি গলায় আর একটি গান শুনতে পেলে আমাদের আত্মার কল্যাণ হবে।'

আহার সমাপনান্তে মিলা প্রথম মুখ খুললেন। তিনি বললেন, 'তোমাদের ধারণা আমি বড় দুঃখী, কিন্তু সে ধারণা ভুল—কারণ আমার মত সুখী পৃথিবীতে আর কেউ নেই। আমার এ কথা তোমরা হয়তো ঠিক বুঝতে পারবে না। তোমরা গান শুনতে চেয়েছো, আমি আমার গানে তোমাদের ঐশ্বর্যের কথা শোনাচ্ছি। বুকের ভিতরে দেবতার পাদপীঠ—সেইখানেই আমার মন-রূপী অশ্বের লীলা-নিকেতন; একমুখী উদ্দেশ্যের বল্গা দিয়ে সেই অশ্বকে সংযত ক'রে, তাকে ধ্যানের খোঁটায় বাঁধতে হবে; ক্ষুধিত অশ্বকে পরিতৃপ্ত করতে হবে গুরুমুখ-নিসৃত বাণীর খাদ্যে; তার পিপাসা প্রশমিত করতে হবে চৈতন্যের প্রস্রবণে; শীতের সময়ে তাকে সংরক্ষিত করতে হবে শূন্যতার আবেষ্টনে; তার পৃষ্ঠে জীন চড়াতে হবে ইচ্ছাশক্তির ও বুদ্ধিবৃত্তির;

তাকে বাঁধতে হবে স্থৈর্যের অটল বন্ধনে; তাকে স্থির করতে হবে শ্বাসের সংযমে। জ্ঞান ও শক্তির অধিকারী চড়বে সেই অশ্বের পৃষ্ঠে, মহায়নিক বিজ্ঞানের শিরস্ত্রাণ থাকবে তার মাথায়, বর্ম হবে বিদ্যা, চিন্তা, বিচার; উচ্চতম আকাঙ্ক্ষার বর্শাফলক উদ্যত হয়ে থাকবে তার হাতে, ক্ষুরধার বুদ্ধির অসি থাকবে তার পাশে, অক্রোধ ও অহিংসার শরদণ্ডে সংযুক্ত থাকবে চতুগু´ণের পালক, শরের মুখে থাকবে সূচ্যগ্র সূক্ষ্ম বুদ্ধি;—অধ্যাত্মজ্ঞানের কোদণ্ডে সেই শর যোজনা ক'রে, জ্ঞানপথ ও উপযুক্ত পদ্ধতির ছিদ্রপথে, পূর্ণ যোগে, তাকে নিক্ষেপ করলে সেই শর সমগ্র সংসারের বুকে উৎক্ষিপ্ত হয়ে পড়বে, এবং অভ্রান্ত লক্ষ্যে সমস্ত বিশ্বাসীর চিত্ত থেকে স্বার্থচিন্তার মালিন্যকে বিদূরিত ক'রে দেবে। তাতেই আসবে সমগ্র সংসারের শান্তি।'

মিলার গান যখন শেষ হ'ল তখন তাঁর শ্রোতাদের চোখের সম্মুখে পৃথিবীর যেন কি এক রূপান্তর ঘটে গেছে। তারা স্তব্ধ বিস্ময়ে স্থাণুর মত সেইখানেই বসে রইলো। অশ্ব বা অশ্বারোহীব রূপক কিছুমাত্র অনুধাবন করতে না পেরেও তাদের মনে হ'ল এ যেন আর এক জগতের, আর এক সত্যের ইঙ্গিত। কারুর মুখে কোন কথা নেই দেখে, মিলা ধীরে ধীরে নিজের পথে এগিয়ে চললেন। চুবারের পথে চলতে চলতে, পাল্‌থুং-এর পর্বতমালা অতিক্রম ক'রে তিনি যখন টিংরি উপত্যকার মাঝামাঝি এসে পৌঁছালেন, তখন অপরাহ্ন বেলা। আকাশের আলোয় ধরিত্রীর রংয়ের মেশামেশি হয়ে অপূর্ব শ্রী ধারন করেছে। পথের ধারে বিশাল একটি পুষ্পিত তরুর পাদমূলে প্রশস্ত শিলাসন দেখতে পেয়ে বিশ্রামের জন্য তিনি সেইখানেই উপবেশন করলেন। সেদিন বোধ হয় গ্রামাঞ্চলে কোন উৎসব ছিল: বহুবর্ণরঞ্জিত বিচিত্র সজ্জায় একদল কুমারী পথ দিয়ে যেতে যেতে সহসা মিলার কঙ্কালসার দেহ দেখে পথের মধ্যে থেমে গেল; তাদের মধ্যে অনুচ্চস্বরে একজন বললো, 'মানুষটার কি সাংঘাতিক

আকৃতি হয়েছে দেখো। ভগবান করুন—জন্ম-জন্মান্তরে এমন চেহারা আমার যেন কখনো না হয়।'

তাদের কথা বলার ভঙ্গি দেখে মিলা হেসে ফেললেন। বললেন, 'ছি, ছি,—মেয়েরা, কারুর সম্বন্ধে এমন ক'রে কখনো কি বলতে হয়? আমাকে দেখে যদি তোমাদের করুণাই হয়ে থাকে, সেই করুণার সঙ্গে এমন ক'রে আত্মম্ভরিতা মেশানো কি তোমাদের উচিত? তা ছাড়া, জন্মান্তরের ভাবনা এখন থেকে তোমাদের না ভাবলেও চলবে। তোমরা নিশ্চিন্ত হতে পারো যে এমন আকৃতি তোমাদের কখনোই হবে না—সে জন্য জীবনভবে প্রার্থনা করলে'ও, না। তোমরা এখানে একটু বোসো—তোমাদের একটা গান শোনাই। লোক আমি ভালই; এই দেখো তোমরা আমাব নিন্দা করলে, কিন্তু আমি যেচে তোমাদের গান শোনাচ্ছি।'

কুমাবীব দল মিলাব এই সহজ আত্মীয়তায় মুগ্ধ হয়ে তাঁর শিলাসন-খানি পরিবেষ্টন ক'বে বসলো। শিশুর মত আনন্দে মিলা তাদের গানের পরে গান শোনাতে লাগলেন। সে সব এমন গভীর ভাবের গান যে তাদের ভাবার্থ এক বর্ণও তাদের বোধগম্য হবার কথা নয়, কিন্তু গায়কও যেমন খুশি, শ্রোতারাও তেমনি খুশি। এই গানের মাঝখানেই, ধূয়া ধরে মিলা গাইলেন: 'তাচ্ছিল্যের সঙ্গে অনুকম্পা মিশিয়ে রচিত হয়েছে তোমাদের করুণা যেমন আমার প্রতি, তেমনি আবার অনুরূপ মনোভাব আমারও হয়েছে তোমাদের প্রতি। যুগ-মাহাত্ম্যে সাধুরা পায় না শ্রদ্ধা, অসাধুরা পায় সমাদর। তোমাদের অনাদর অবজ্ঞার বিনিময়েও, আমি মিলারেপা তোমাদের কল্যাণ-কামী।'

মেয়ের দল সজাগ, সচকিত হয়ে উঠলো, কারণ তিব্বতের এক প্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত ইতিমধ্যেই লোকের মুখে মুখে মিলারেপার নাম ছড়িয়ে পড়েছিল। আবালবৃদ্ধবনিতার জানা

ছিল তাঁর আশ্চর্য অলৌকিক তপস্যার বিবরণ। ইতর ভদ্র সবাই জানতো পূণ্যভূমি তিব্বতের কোন না কোন দুর্ভেদ্য গিরি গুহায়, বহু তপস্বীর মধ্যে একজন যোগীশ্রেষ্ঠ আছেন যিনি আশৈশব বিশাল শক্তির অধিকারী। আকাশপথে তিনি সঞ্চরণ করতে পারেন, জলের উপর দিয়ে তিনি স্বচ্ছন্দে হেঁটে চলেন—কারণ জলবায়ু আকাশ অগ্নি সবাই তাঁব বশীভূত। ইচ্ছামাত্র তিনি অদৃশ্য হতে পারেন, বায়ুবেগে সহস্রযোজন পথ মুহূর্তের মধ্যে অতিক্রম করতে পারেন। দৈবশক্তিতে আত্মশক্তিতে অতুলনীয় এই মহাত্মার অসাধ্য কিছু নেই। তাঁর ইচ্ছায় বিশ্বপ্রকৃতির বুকে মুহূর্তে প্রলয়ের তাণ্ডব ওঠে, নিমেষে থেমে যায়। নিছক বায়ু ভক্ষণ ক'রে ইনি বেঁচে থাকেন। গুরুর আদেশে নিজের দুটি হাত দিয়ে তিনি অসংখ্য প্রাসাদ গড়েছেন, ভেঙেছেন। বিষাক্ত বিছুটি পাতার রস তাঁর কাছে পরম উপাদেয় হয়ে উঠে। জাগতিক ঐশ্বর্য দু-পায়ে মাড়িয়ে তিনি দ্বিতীয় বুদ্ধের মত দীনহীন বেশে পর্বতে অরণ্যে বিচরণ করেন। তাঁর কঙ্কালসার দেহের হাড় কখানি গোণা যায়। রাজাধিরাজ হয়ে তিনি নিঃস্ব, রিক্ত, সর্বস্বত্যাগী, একক। বাস্তবে কল্পনায় মিশিয়ে জনশ্রুতি যে তাঁর সম্বন্ধে কতরকমের আশ্চর্য উপাখ্যান রচনা ক'রে রেখেছিল—সে কথা সংসার-বিমুখ মিলা কিছুই অবগত ছিলেন না। সূর্য উঠলে যেমন ক'রে সমগ্র চরাচর তার আলোয় ভাস্বর হয়ে ওঠে—ঠিক তেমনি ক'রেই, আতিব্বত ভারতবর্ষ মিলারেপার নাম ও অলৌকিক কাহিনী নানাভাবে অতিরঞ্জিত হয়ে, লোকের মুখে মুখে ছড়িয়ে পড়েছিল।

মিলাকে দেখে যে মেয়েটি প্রথমে মন্তব্য করেছিল, সাক্ষাৎ মিলাকে সামনে দেখে সে ভয়ে লজ্জায় অভিভূত হয়ে পড়লো। নিজের সম্পত্তি সাতটি কড়ি মিলার পায়ে জরিমানা-স্বরূপে স্থাপন ক'রে, সে নিজের নির্বোধ উক্তির জন্য অনুতপ্ত হয়ে ক্ষমা ভিক্ষা করলো। মিলা হেসে বললেন, 'ক্ষমা চাইবার কি হয়েছে? তোমার বলার অনেক

আগেই তোমাদের আমি ক্ষমা করেছি। আর একটা গান করি শোনো : 'সত্যের যুগ আর নেই, ধর্মের যুগও আর নেই : এ যুগের সবাই হয়েছে অর্থের পূজারী। ধ্যানের আদর নেই, সমাদর আছে বক্তৃতার ; যারা যত ধূর্ত তাদেরই তত জয় জয়কার। কে চায় ধ্যানীকে কে চায় ধর্মকে ? মানবীয় প্রেমবিরহের কাহিনীই এ যুগের ধর্মকথা।'

গানের শেষে মেয়েদের কাছে বিদায় নিয়ে মিলা আবার নিজের পথে যাত্রা করলেন। অনেক দূরের পথ ল্যাপটি-চুবার পর্যন্ত যাওয়া হ'ল না। কাছাকাছি নিমা-জং পর্বতের গুহায় কয়েক মাসের জন্য আশ্রয় নিয়ে ধ্যানসমাধিতে নিমগ্ন হয়ে রইলেন। কিন্তু লোকালয় কাছেই ; সেখান থেকে দলে দলে পুণ্যকামী নরনারী খাদ্য-পানীয় নিয়ে গুহার দ্বারে ভিড় করতে লাগলো। বিনা চেষ্টায় খাদ্য সমস্যা মিটলো বটে, কিন্তু মিলা ভেবে দেখলেন, এভাবে জন-সমাগম ঘটতে থাকলে তাঁর তপশ্চর্যাব বিঘ্ন হবে। তিনি মনে মনে স্থির করলেন জনপদ পরিত্যাগ ক'রে এবার এমন দুর্ভেদ্য গহন প্রদেশে আশ্রয় নেবেন, যেখানে লোক-সংসর্গের সম্ভাবনা মাত্র আর থাকবে না। এমন সময়ে অভাবনীয় ভাবে একদিন পেতা এসে হাজির হলেন।

মিলাকে ড্রাকারটাসো গুহায় অনাবৃত উলঙ্গ দেহে অবস্থান করতে দেখে অবধি পেতার মনে সুখ ছিল না ; সামান্য একখণ্ড কম্বলের অভাবে দাদার এই দুর্দশার দৃশ্য তাঁকে সর্বদাই পীড়া দিত। তাই, লোকের বাড়ি চেয়ে চিন্তে একখানি পশমের কম্বল সংগ্রহ ক'রে, তিনি শীঘ্রই একদিন মিলার পূর্বাতন সাধনক্ষেত্রে গিয়ে দেখলেন গুহা শূন্য। যাঁর জন্য এত কষ্ট ক'রে কম্বল সংগ্রহ হ'ল—তিনি নগ্নদেহেই সে স্থান পরিত্যাগ করেছেন দেখে তাঁর মাতৃহৃদয় ব্যথিত হয়ে উঠলো। তিনি স্থির করলেন যেমন করেই হোক এ কম্বল যথাস্থানে পৌঁছে দিয়ে তবে তাঁর নিষ্কৃতি। তখন থেকে এই একটিমাত্র

উদ্দেশ্যে তিনি মিলার গন্তব্যস্থানের সন্ধান ক'রে ফিরতে লাগলেন। সবুজ শুঁয়াপোকার মত গায়ের রং, কঙ্কালসার এক সাধু কোন পথ দিয়ে গেছেন, খোঁজ নিতে নিতে তিনি টিংরি পর্যন্ত এসে পৌঁছালেন। এখানে এক ভারি জব্বর সাধুর খবর পেয়ে তিনি ভাবলেন হয়তো বা দাদার এতদিনে সুমতি হয়েছে এবং অবস্থা ফিরেছে। সাধুর আস্তানার আশে পাশে লোকের দারুণ ভিড় ঠেলে তিনি সাধুর সম্মুখে গিয়ে পৌঁছালেন। হতাশ হয়ে দেখলেন, সোনার ছাতা মাথায় দিয়ে পাঁচরঙা রেশমের বহুমূল্য পোশাকে, শিষ্য-সেবক-পরিবৃত হয়ে রাজাসনে যিনি উপবিষ্ট—তিনি চিরদুঃখী মিলা নয়—আর এক জন। হতাশার প্রথম ঘোর কাটিয়ে যখন তিনি আবার একবার ভালো ক'রে তাকিয়ে দেখলেন তখন তাঁর মনে হ'ল, হ্যাঁ, এই একটা সাধুর মত সাধু বটে। সাধুর মাথায় সোনার মুকুট, মুখে প্রসন্ন হাসি, পায়ের কাছে ফুল-চন্দনের পাহাড় জমে গেছে, সোনা রূপার স্তূপ হয়ে গেছে। ভক্তেরা কেউ-বা শঙ্খ, কেউ-বা কাঁসর ঘণ্টা, কেউবা রকমারি বাদ্যযন্ত্রে বিবিধ ধ্বনির সমন্বয় সাধন করছে। বিবিধ আহার্যের নৈবেদ্য সাজিয়ে, বিবিধ-পানীয়ের অর্ঘ্য নিয়ে দলে দলে দূর-দূরান্তরের ভক্তেরা একে একে এসে ছাংয়ের পাত্র সাধুর মুখে তুলে ধরছে। দৃশ্যটি উপভোগ করবার মত; পেতা ভাবলেন, এমনি না হ'লে আর সাধু কিসের! এই অজ্ঞাতনামা সাধুটির আসনে ছন্নছাড়া মিলাকে কল্পনা ক'রে পেতা পরম পুলকিত হয়ে উঠলেন। কি প্রাচুর্য, কি ঐশ্বর্য, কি শান্তি এখানে! একটু চেষ্টা করলে কি আর মিলা এই সাধুর আশ্রয় নিয়ে নিজের অবস্থা ফেরাতে পারেন না! ধর্ম নিয়ে যারা থাকে তাদের কত ঐশ্বর্য, কত সুখ, কত সমারোহ, কত সম্মান। এই ইনিও কি ধর্ম নিয়ে নেই? অথচ এঁর রাজার কত ভোগ-সুখেরও তো কোন অভাব নেই। আর ওদিকে আর একজন ধার্মিক বিছুটির ঝোল খেয়ে নগ্নগাত্রে দৈন্যের ধ্বজা ওড়াচ্ছেন: নিজেরও দুঃখ, আত্মীয়-স্বজনদেরও বলতে

লজ্জায় মাথা কাটা যায়। দাদার সঙ্গে দেখা হ'লে আমি একবার প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে দেখবো তাঁকে ভ্রান্ত পথ থেকে যদি কোন রকমে প্রতিনিবৃত্ত করা যায়। এমন আদর্শকে উপেক্ষা করে যারা, মনঃকল্পিত ধর্মের ধান্ধায়, দুঃখবাদকেই চরম সত্য বলে মনে করে, তাদের মত অনুকম্পার পাত্র আর কে আছে ?

পেতার জিজ্ঞাসার উত্তরে আশপাশের লোকেরা বললো, 'হ্যাঁ, হ্যাঁ—কেউ কেউ সেই পাগলটাকে এই অঞ্চলে দেখেছে বটে। শুনেছি নাকি তারই নাম মিলারেপা। চেহারার বর্ণনায় ঠিকই মিলছে—ক্ষ্যাপার মত আকৃতি-প্রকৃতি, গায়ের রং সবুজ, জরাজীর্ণ দেহের হাড় কখানি একটি একটি ক'রে গোণা যায়, উলঙ্গ ভূতের মত দেখতে। এ পথ দিয়ে এগিয়ে গেলে অনেক গুহাই দেখা যাবে। তারই কোন একটাতে হয়তো তার দেখা পাবে।' পেতার সনির্বন্ধ প্রশ্নের উত্তরে তারা এ কথাও বললো যে ভ্রান্ত পথ—দৈন্যের অহঙ্কার ছাড়িয়ে, মানুষের মত সাজসজ্জা ক'রে মিলাকে ফিরিয়ে আনতে পারলে, করুণার অবতার মহাগুরু লামা বারি লাট্‌সাওয়া তাকে তাঁর শ্রীচরণে স্থান দিতেও পারেন।

মিলাকে এই মহাগুরুর আশ্রিতরূপে কল্পনা করতে করতে, এবং রমণীয় ভবিষ্যতের চিন্তায় বিভোর হয়ে, কম্বল-কাঁধে পেতা সেই পথ ধরে গুহা হতে গুহান্তরে হারানো মানুষটির সন্ধান ক'রে ফরিতে লাগলেন। মিলার দেখা পেয়ে—সেই চিরন্তন দৈন্যমূর্তি পুনরায় দেখেই পেতা অন্য সব কথা ছেড়ে, প্রথমেই তাঁর মনের কথাটি প্রকাশ ক'রে বললেন, এভাবে আর কত দিন চলবে ? এই কি একটা মানুষের জীবন না কি ? ধর্ম—কাকে বলে, ধর্ম মানুষ কেমন ক'রে করে—দেখতে হয়তো আমার সঙ্গে চলো। দেখে আমার চোখ জুড়িয়ে গেছে, অন্ধ যদি না হও—তোমারও চোখ জুড়িয়ে যাবে। তার আগে এই কম্বলটি কেটে আগে লজ্জা-নিবারণের ব্যবস্থা করো :

এমন নির্লজ্জের মত লোকালয়ে যাওয়া চলে না। দেখে এলাম লামা বারি লোটসাওয়াকে—কি চেহারা, কি সাজ, কি ঐশ্বর্য ; বসে আছেন সিংহাসনে, মাথায় সোনার ছাতা, রেশমের পোশাক, কাতারে কাতারে শিষ্য-সেবক, খাদ্য-পানীয়ের অন্ত নেই। তার পাশে তোমার মূর্তি কল্পনা ক'রে আমি লজ্জায় মরি। লোকে মুঠো মুঠো সোনা-রূপা পায়ে রেখে কৃতার্থ হয়ে যাচ্ছে। একে বলে তপস্যা, একে বলে ধর্ম। তুমি যা নিয়ে আছো একে ধর্ম বলে না—কিছুই বলে না। যা করবার আমি করবো, যা বলবার আমি বলবো। তুমি মানুষের মত বেশ ক'রে আমার সঙ্গে সেখানে একটিবার চলো। কোনগতিকে যদি তাঁর শিষ্যবর্গের মধ্যে স্থান ক'রে নিতে পারো, তোমাব অবস্থা ফিরে যাবে, মানুষ বলে নিজের পরিচয় দিতে পারবে—এমনকি কালক্রমে হয়তো তোমার নিজেরও খানিকটা প্রতিষ্ঠা হবে, শিষ্য-সেবক নিয়ে মাথা উঁচু ক'রে চলতে পারবে।

মিলাকে স্থির গম্ভীর মুখে সব কথা শুনতে দেখে পেতা উৎসাহিত হয়ে উঠলেন। তিনি বুঝে নিলেন তাঁর এবারকার দৌত্য একেবারে ব্যর্থ হবে না। উৎসাহেব আধিক্যে পূর্বকথার জের টেনে পেতা বলে চললেন, 'ভেবে দেখো দেখি, নিজের অমূল্য জীবনটাকে নিয়ে কি ভাবে তুমি ছিনিমিনি খেলছো। এই কি একটা মানুষের জীবন? আমি তোমার একটিমাত্র বোন হয়ে পথের ভিখারির মত ভেসে বেড়াচ্ছি ঃ তুমি একজন গন্যমান্য লামা হয়ে কোথায় কি ভাবে দিন কাটাচ্ছো! একবার যদি কোনগতিকে ওই রাজৈশ্বর্যের মধ্যে নিজের স্থান ক'রে নিতে পারো—তোমার ও আমার, দুজনেরই বরাত ফিরে যাবে। ওখানকার অফুরন্ত সমারোহের ছিটেফোঁটা পেলেও, তোমার আমার স্বচ্ছন্দে চলে যাবে। এমনি ক'রে বেঁচে মরে থাকার সত্যি সত্যিই কোন অর্থ হয় না।' বলতে বলতে তাঁর দু-চোখ বেয়ে জল ঝরতে লাগলো।

স্নেহাস্পদ বোনটির চোখের জল নিজের হাতে মুছিয়ে দিয়ে মিলা বললেন, 'ছিঃ পেতা, এভাবে অধীর হতে নেই। তুমি আমার এই দীনহীন উলঙ্গ বেশ দেখে ভাবছো আমার মত দুঃখী বুঝি পৃথিবীতে আর নেই। কিন্তু জন্মের সময় থেকেই যার উলঙ্গ দশা, তার এতে লজ্জা সঙ্কোচের আছে কি? মানুষ হয়ে জন্মে, সত্যলাভে আমার জীবন সার্থক হয়েছে—এই আমার গর্ব। যে দেহ নিয়ে আমি জন্মেছি, সেটা আবৃত কি অনাবৃত, সে চিন্তা আমার নয়, কারণ দেহের ধর্ম দেহের কাছে। কিন্তু আমার আত্মাকে আমি কালিমালিপ্ত করিনি: নিজের অতৃপ্ত বাসনার প্রেরণায়, স্বার্থসিদ্ধির কদর্য অভিপ্রায়ে নিজেকে বা অপরকে কোনদিন প্রতারণা করিনি, কারুখ্যে আঘাত ক'রে নিজের সুখ সন্ধান করিনি। অতএব আমার লজ্জার কোন হেতু আমি দেখতে পাই না। লজ্জা তাদের, যারা মিথ্যা আড়ম্বরে যথার্থ দৈন্যকে আবৃত ক'রে নিজেকে এবং অপরকে প্রবঞ্চিত করে। তোমার ধারণা হয়েছে যে আমি খাদ্য বা পরিধেয় অর্জন করতে অক্ষম বলেই এভাবে পড়ে আছি। তোমার সে ধারণা সত্য নয়। সংসার আমার কাছে অগ্নিকুণ্ডের মত ভয়াবহ বলেই সংসারকে আমি বর্জন করেছি, এবং নিছক ঘৃণায় আমি এই তুচ্ছ সংসারের ভোগসুখকে বিষের মত পরিত্যাগ করেছি। এই অপরিতৃপ্ত লোভের পশ্চাদ্ধাবন ক'রেই মৃত্যু হয়েছে আমার পিতার ও অগণিত পিতৃপুরুষের। তাই এই ঘৃণিত সংসার-সুখে আমার বিন্দুমাত্র লোভ নেই। আমার গুরু সেই আদেশই আমাকে দিয়েছেন। তিনি বললেন, নামের লোভ, জিহ্বার লোভ, পরিধেয় বস্ত্রের লোভ ইত্যাদি পরিহার ক'রে, জীবনের সর্ববিধ আশা আকাঙ্ক্ষার পাশ কাটিয়ে সমগ্র প্রাণ দিয়ে সাধনাকে একমাত্র উদ্দেশ্যের রূপে গ্রহণ করতে হয়। আমি জীবন দিয়ে সেই আদেশই পালন করেছি। এই পথের পথিক হয়ে আমি আমার অনুবর্তীদের ভোগসুখের সম্পদ দিতে পারবো না—কিন্তু অনন্ত শান্তির ভাণ্ডার

আমি তাদের হাতে তুলে দিতে পারবো। ইচ্ছা করলে, বারি লোটসাওয়ার মত সম্পদ আমিও লাভ করতে পারতাম। কিন্তু কি হবে আমার সে মিথ্যা প্রয়াসে, কারণ সেসব দিয়ে তো মৃত্যুকে কোনদিন ঠেকানো যাবে না। আমি কোন্ দুঃখে ওই পতিত ঐশ্বর্য-বানের দাসত্ব করতে যাবো? আমি এ জীবনেই বুদ্ধত্ব লাভের প্রয়াসী; তাই আমার সমস্ত প্রচেষ্টা সেই পথেই পরিচালিত করেছি। শোনো পেতা, আমি তোমার শুভাকাঙ্ক্ষী অগ্রজ, আমার কথা শোনো। চলো আমরা দুজনে সর্বস্ব পণ ক'রে ল্যাপচি কাঙ্ বা কাঞ্চনজঙ্ঘার নিভৃত গুহায় তপস্যা করি। জাগতিক লাভ-ক্ষতির হিসাব নিকাশ ছেড়ে, চলো আমরা অমরতার পথে জ্যোতির্ময় মুক্তির পথে প্রয়ান করি। ত্যাগের পথই মুক্তির পথ।'

ম্লানহাস্যে পেতা বললেন, 'আছে কি যে ত্যাগ করবে? সামান্য দেহাবরণের বস্ত্রখণ্ডও যার নেই, তার মুখে এ ত্যাগের সঙ্কল্প মানায় না। আমারই বা ত্যাগ করার মত সম্পদ কি আছে? এখনই দিনান্তে একমুষ্টি অন্ন জোটে না—পর্বতের গুহায় পাথর চিবিয়ে বাঁচা আমার সাধ্য নয়। ভালো ভালো কথা শুনতেই মিষ্টি; সাধ্য থাকলে—লামা বারি লোটসাওয়াকে অযথা তুচ্ছ না ক'রে তুমিও তার মত হতে পারতে। কিন্তু সে তোমার সামর্থ্যের বাইরে, তাই বড় বড় কথা বলে নিজেকে প্রবোধ দেবার চেষ্টা করছো। কোথায় তোমার ল্যাপ্চি কাঙ্ তা আমি জানি না, জানতে চাইও না। তোমার ভালোর জন্য বলছি সে চেষ্টা তুমিও ছাড়ো। আর কিছু না পারো, যেখানে হোক এক জায়গায় বা এখানেই স্থির হয়ে থাকো। এখানকার লোকজনের তোমার প্রতি যা হোক একটু শ্রদ্ধার ভাব আছে। এখানে টিকে থাকলে তবু যাহোক দু-এক মুষ্টি খাদ্যও তোমার কোনক্রমে জুটবে; দূরে গেলে তাও জুটবে না। আমার কথা যদি শোনো, অন্ততঃ কিছুদিনের জন্যও এই স্থানেই তুমি অবস্থান

করো। আমার অনেক কষ্টে সংগ্রহ করা এই কম্বলটি কেটে একটি কটিবাস সেলাই ক'রে পরো। কয়েকদিনের মধ্যেই ফিরে এসে, আমি যেন তোমাকে ভদ্রবেশে দেখতে পাই।'

পেতার পুনরাগমনের সময় পর্যন্ত সেইখানে অপেক্ষা করতে মিলা স্বীকৃত হলেন। আশাভঙ্গের বেদনা বুকে নিয়ে পেতা সংসারের পথে ফিরে গেলেন। পেতার আনা কম্বলটি হাতে নিয়ে নাড়াচাড়া করতে করতে মিলার মনে এক বিচিত্র ভাবোদয় হ'ল। তিনি সূক্ষ্মাগ্র এক-খণ্ড প্রস্তরের সাহায্যে কম্বলটি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র বহু খণ্ডে বিভক্ত করলেন—যাতে বিভিন্ন খণ্ডে শরীরের হস্তপদাদি বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ পৃথকভাবে আবৃত করা যায়। এই কর্মটি সমাপ্ত ক'রে, নিশ্চিন্ত হয়ে আত্মকার্যে মনোনিবেশ করলেন। কয়েকদিন পরে পেতা এসে দাদাকে পূর্ববৎ দিগম্বর অবস্থায় দেখে জিজ্ঞাসা করলেন, 'কই, সেই কম্বল দিয়ে বুঝি কিছুই এযাবৎ করা হয় নি?' মিলা হাসিমুখে বললেন, 'নিশ্চয়ই হয়েছে, দাঁড়াও, পরিচ্ছদ পরে তোমাকে এখুনি খুশি ক'রে দেবো।' পেতা সেইখানেই বসে রইলেন, মিলা গুহাভ্যন্তর থেকে অপরূপ সাজে কিছুক্ষণের মধ্যেই এসে দেখা দিলেন। প্রত্যেকটি অঙ্গের জন্য পৃথক পৃথক কম্বলের আবরণ,—হাতে, পায়ে, মাথায়, কটিদেশে, প্রত্যেকটি আঙ্গুলে আলাদা আলাদা পরিচ্ছদ ধারন ক'রে মিলা যখন সগর্বে এসে পেতার সম্মুখে দাঁড়ালেন, তখন পেতা ক্রোধে বিরক্তিতে ফেটে পড়ে বললেন, 'তুমি মানুষ নও, তোমার রুচি প্রকৃতি সব পৈশাচিক হয়ে গেছে। লজ্জাসরমের বালাই না থাক, কত কষ্টে সংগৃহিত কম্বলটির এই দুর্দশা করতেও কি তোমার সঙ্কোচ হ'ল না? এই জন্যই কি কম্বল এনেছিলাম? এদিকে তো বল ধ্যান-ধারণা ছাড়া কোন কিছুতেই তোমার মন নেই—তবে এতখানি সময় নষ্ট ক'রে এ অনাসৃষ্টি ব্যবস্থা করলে কেমন ক'রে?'

পেতার ভর্ৎসনার উত্তরে মিলা হাসিমুখে বললেন, 'কথাটা ঠিকই

বলেছো ; কিন্তু সময়টা কি সত্যিই অপব্যয় করেছি ? দেহের আবরণ না থাকলে সেটা লজ্জার বিষয় বলে তোমার ধারণা। তাই ভাবলাম, দেহ তো আমার একটাই—তার বহু অঙ্গ। সেই বহু অঙ্গের আবৃতই বা করি কা'কে, অনাবৃতই বা রাখি কাকে ? যাকে অনাবৃত রাখবো—সেই তো উলঙ্গ থেকে তোমাকে লজ্জা দেবে। অতএব প্রত্যেকটির জন্য আলাদা আলাদা আবরণ সেলাই ক'রে একেবারে ক্রটিহীন নিশ্ছিদ্র হয়ে তোমাকে দেখা দিলাম। এসব তোমারই জন্য—কারণ আমার নিজের লজ্জা-সঙ্কোচের যে বালাই নেই—এ কথা তুমি বহুদিনই জানো। তবে, যেখানে সত্যিকারের আত্মাবমাননা সেইখানেই যে সত্যিকারের লজ্জা—এ কথা আমি কখনোই ভুলিনি ; তাই মানব-জন্ম লাভ ক'রে আমার প্রকৃত সত্ত্বাকে কোনরূপ আত্মবঞ্চনায় আমি কলঙ্কিত করিনি। তোমার আনিত কম্বলে তোমার অভিষ্ট আমি যে পূরণ করেছি—এ কথা তুমি অস্বীকার করতে পারো না, কারণ প্রকৃতির দেওয়া যে সব অঙ্গে তোমার লজ্জা, তাদের সবাইকেই আমি তূল্যভাবে আবৃত ক'রে, তোমাকে লজ্জার হাত থেকে আমি বাঁচিয়েছি। যাতে লজ্জার কিছু নেই—সংসারের যত লজ্জা তাই নিয়েই, কিন্তু যেখানে সত্যিই লজ্জা, সত্যিই গ্লানি, সত্যিই অপমান—সেখানে দেখি লোকে নির্বিকার। এই অকারণ লজ্জা সামাজিকতার অর্থহীন পরাক্রমঃ এর মূলে আছে অজ্ঞান। মিথ্যাচার, প্রবঞ্চনা, অন্যায়, পাপ—যেখানে সত্যিই লজ্জার স্থান আছে, সেখানে যারা পশুর মত বিচার-বুদ্ধিহীন, তারাই আবার স্বাভাবিক দেহের অনাবৃত অঙ্গ দেখলে লজ্জায় চোখ ঢাকে। পাপের লজ্জা, অকর্তব্যের সঙ্কোচ, অনাচার ব্যাভিচারের বিভৎসতা তাদের চোখে পড়ে না বলেই বাইরেকার বিধিনিষেধকে তারা এতখানি বড় ক'রে দেখে। তোমাদের পৃথিবীর সমাজবিধিকে যারা পায়ের ধূলোর মত ক'রে ঝেড়ে ফেলেছে, তারা এসব বন্ধন স্বীকার করবে কেন ? অতএব আমার কথা ভেবে তুমি অনর্থক মনে কোন ক্ষোভ রেখো

না। একটু বিচার-বুদ্ধি প্রয়োগ করলেই তোমার মনের এই অহেতুক বিরক্তি দূর হয়ে যাবে।'

দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা ক'রে সংগ্রহ-করা খাদ্যের ছোট পুঁটুলিটি মিলার হাতে তুলে দিয়ে পেতা বললেন: 'আমি বুঝেছি যে তুমি আমার কথা শুনবে না। কিন্তু তথাপি রাগ ক'রে যে তোমাকে ত্যাগ ক'রে যাবো, সে সাধ্যও আমার নেই। আমার আনা এই খাদ্যও হয়তো বা তোমার প্রয়োজন নেই—কিন্তু আমার শেষ অনুরোধ রইলো, এগুলি তুমি দয়া ক'রে গ্রহণ কোরো; তাতে তোমার তপশ্চর্যার বিঘ্ন হবে না।' মিলা বললেন, 'এ তোমার রাগের কথা, পেতা; কারণ খাদ্যাভাবে কষ্ট পেলেও তোমাব স্নেহের দান গ্রহণ করবো না, এমনতর উগ্র তপস্বী যে আমি নই, তার অনেক প্রমাণ তুমি ইতিপূর্বেও পেয়েছো। কিন্তু আমি বলি কি—খাদ্য যখন আপাততঃ যথেষ্টই রয়েছে, তখন এ কয়দিন তুমিও তো আমার কাছে থাকতে পারো।' সামান্য একটু ক্ষণ চুপ ক'রে থেকে পেতা এ প্রস্তাবে রাজি হয়ে গেলেন, কিন্তু কিসের আকর্ষণে যে রাজি হলেন তা নিজেও যেন বেশ পরিষ্কার ভাবে বুঝতে পারলেন না। মিলার সঙ্গে তাঁর কোনদিক দিয়ে কিছুমাত্র মিল নেই; দুটি জীবন দুটি সুরে বাঁধা; বাইরের দিকে এমন কোন সহানুভূতির যোগ নেই—যার ফলে বহির্মুখী পেতা নিজের স্বভাবের প্রবল আকর্ষণকে অগ্রাহ্য ক'রে, আন্তরিকভাবে মিলার সান্নিধ্য কামনা করবেন। দৃষ্টিসীমার বহির্দেশে, মাটির তলায় যেখানে অন্ধকারের প্রাণস্রোত নিঃশব্দ ধারায় প্রবাহিত, সেখানে রসপিপাসু শিকড়গুলি একটি পিপাসায় উদ্বুদ্ধ হয়ে কেমন ক'রে একটি উৎসে গিয়ে সম্মিলিত হয়—সে বিবরণ বাইরের চোখ দিয়ে দেখা যায় না। মিলার কোন কথা, কোন আচরণ পেতার ভাল লাগে নি; কিন্তু তথাপি, মিলা যখন নিজেই তাঁকে থাকতে বললেন, তখন পেতাও খুশি হয়ে কিছুদিনের জন্য সেই দুর্গম পার্বত্য প্রদেশে রয়ে গেলেন।

এমনি সময়ে, সর্ব অনিষ্টের মূল সেই কাকি, বহুপথ অতিক্রম ক'রে মিলার সন্ধান করতে করতে এই দুর্গম প্রদেশে এসে উপস্থিত হলেন। দূর থেকে কাকিকে আসতে দেখে, পেতা ত্বরিৎপদে ছুটে গিয়ে, খরস্রোতা পার্বত্য নদীর উপরের সাঁকোর অবলম্বনটি টেনে নিয়ে, মিলাকে তাঁর আগমন বার্তা জ্ঞাপন করলেন। কাকি ওপার থেকে ডেকে বললেন, 'সাঁকোর কাঠ টেনে নিলে আমি পার হবো কেমন ক'রে ?' পেতা বললেন, 'পাছে তুমি পার হও, সেই জন্যই তো এই কাঠ টেনে নিলাম। তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎকারের কিছুমাত্র প্রয়োজন আমাদের নেই ; অনিষ্ট অনেক করেছো, তাতেও কি তোমার আশা মেটেনি ?' কপালে করাঘাত ক'রে কাকি বললেন, 'তোমার অভিযোগ মিথ্যা নয়, মা ; কিন্তু আমি এসেছি আমার অনুতাপের জ্বালায়। তোমার কাকা ইহলোকে নেই, আমার একটিমাত্র ভাই ছিল—সেও মারা গেছে। সমস্ত দুষ্কৃতির বোঝা আমার বুকের উপবে চেপে বসেছে ঃ অনুতাপে আমি জ্বলে পুড়ে ছাই হয়ে যাচ্ছি। তোমাদের দুজনের কাছে মার্জনা না পেলে আমার দুঃসহ জীবন আরও দুঃসহ হয়ে যাবে। কৃপা ক'রে আমাকে তোমাদের কাছে আসতে দাও।'

মিলাকে দেখতে পেয়ে কাকি ওপার থেকেই বারংবার মাটিতে মাথা ঠেকিয়ে প্রণিপাত করতে লাগলেন। মিলার মন মুহূর্তে কোমল হয়ে গেল ; কিন্তু অপাঙ্গে পেতার কঠিন মুখভাব লক্ষ্য ক'রে মিলা বললেন, 'কিন্তু আমার আত্মীয়-স্বজনদের সঙ্গে আমার তো কিছুমাত্র যোগ নেই। ভিক্ষার জন্য যখন তোমাদের দ্বারপ্রান্তে গিয়ে প্রহৃত হয়ে ফিরেছিলাম, তখনো আমি আত্মীয়বোধে তোমাদের দ্বারস্থ হই নি। আমার কাছে কার কি প্রয়োজন থাকতে পারে আমি জানি না, জানতে চাইও না। তোমার এপারে এসে কাজ নেই ঃ তুমি যে পথে এসেছো সেই পথেই ফিরে যাও।'

কাকি তর্ক করলেন না, প্রতিবাদ করলেন না ; সমস্ত অভিযোগ

স্বীকার ক'রে নিয়েও অসহায়ের মত দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে কাঁদতে লাগলেন দেখে মিলা আর নিষ্ক্রিয় হয়ে থাকতে পারলেন না। কিন্তু পেতার হৃদয় এতেও দ্রব হ'ল না, কারণ তাঁর মনে বদ্ধমূল হয়ে ছিল এই ধারণা যে দুরাত্মার ছলের অভাব নেই। কাকি যখন কেঁদে বললেন, 'সত্যিই যদি তোমরা আমাকে এভাবে পরিহার করো, তাহলে আমি এই উত্তুঙ্গ শৃঙ্গ থেকে ঝাঁপিয়ে পড়ে তোমাদের চোখের সামনেই আত্মহত্যা করবো'—তখন আর পেতার বাধা টিকলো না। মিলা নিজের হাতে সাঁকোর কাষ্ঠখণ্ড সংযুক্ত ক'রে কাকিকে নিজের কাছে আসতে দিলেন। কাকির জীবনের বহুতর দুষ্কৃতি অনুতাপের অশ্রুজলে ধুয়ে মুছে অপসৃত হয়ে গেল। মিলার স্বতঃস্ফূর্ত মার্জনায় তাঁর জীবনের আমূল পরিবর্তন ঘটে গেল। সংসারের খেলা তাঁর ইতিপূর্বেই সমাপ্ত হয়ে গিয়েছিল; এবার মিলার কাছে সত্যপথের সন্ধান পেয়ে তাঁর অনাসক্ত চিত্ত নিজের শাশ্বত পরিণতির পথটি পেয়ে গেল। সর্বস্ব ত্যাগ ক'রে আশা আকাঙ্ক্ষার সর্ববিধ প্রয়াস ছেড়ে তিনি তপস্যার পথ গ্রহণ করলেন এবং পরিণামে পরমপদ লাভ ক'রে কৃতার্থ হলেন।

মিলারেপার অলৌকিক জীবনের এই অধ্যায়টি যাঁরা তাঁর স্বমুখে শোনবার সৌভাগ্য লাভ করেছিলেন, তাঁরা বিস্ময়-বিমূঢ় হয়ে জিজ্ঞাসা করেছিলেন, 'কাকির জীবনের পরম রূপান্তর এত অনায়াসে কেমন ক'রে সম্ভব হ'ল?' মিলা বললেন, 'তা কেন হবে না? আন্তরিক অনুতাপ আসার সঙ্গে সঙ্গেই অনুকূল স্রোতটি বইতে শুরু করে এবং সঙ্গে সঙ্গে মনটিও নিরাশ্রয় হয়ে, নিজের মধ্যে সহজ গতির পথটি খুঁজে নেয়।'

তাঁরা বললেন, 'বুঝেছি—আপনার কৃপায় সবই সম্ভব। নইলে যাদের জীবনে সুকৃতি বা তপস্যা কিছুই নেই তারা কিসের জোরে পার হবে। আমাদের মত যারা, তাদের না আছে বিশ্বাস-ভক্তি, না আছে সঙ্কল্পের দৃঢ়তা। একবার ছাড়ি, একবার ধরি; দু-পা অগ্রসর

হয়ে তিন-পা পেছিয়ে আসি—এই তো আমাদের তপশ্চর্যা। সংসারের দুর্বার আকর্ষণকে পরাভূত ক'রে নিজের জোরে এগিয়ে যাবো—সে সামর্থ্য আমাদের কোথায়! আপনার মত বিশ্বাস ভক্তি বা সর্বস্বপণ ত্যাগের শক্তি আমরা কোথায় পাবো!' বিনম্রভাবে মিলা বললেন, 'সংসারের যে ভয়াবহ মূর্তি আমি দেখেছি তাতেই আমাকে কর্মের পথে এগিয়ে দিয়েছে—নইলে নিছক নিজের চেষ্টায় আমিই বা শ্রেয়ের পথটি পেতাম কি ক'রে? কর্মবাদের সূত্রটি কেবল বুদ্ধি দিয়ে বুঝে নিলেই হয় না, অন্তর দিয়ে উপলব্ধি করতে হয়। নইলে আক্ষরিক টীকা ভাষ্যের প্রলোভনে, শূন্যবাদের মোহাবর্তে পড়ে লোকে হাবুডুবু খায়। শূন্যবাদের নিঃসীম শূন্যতা যখন জীবনের বুকে সত্যিসত্যিই প্রতিভাত হয়ে ওঠে—তখনই মনোজগতের বিচার-বুদ্ধির সমস্ত ধারাটি সেই আলোকে উদ্দীপ্ত হয়ে উঠে। সত্যিকারের বিবেক তখনই জাগে। প্রথমে যেটা থাকে নৈতিক ভালো মন্দর চুলচেরা বিচার, পরে সেইটাই হয়ে ওঠে স্বাভাবিক সত্য। আমার জীবনের কাহিনী সবই তো তোমরা জানো। এর মধ্যে আমার মহিমা কোথাও কিছু নেই। কৃতকর্মের ফল যে সুদূরপ্রসারী—এই বিশ্বাসটুকু আমার ছিল বলেই নিজের বিষম দুষ্কৃতির চিন্তায় আমি অস্থির হয়ে পড়েছিলাম। কি করলে সেই অবশ্যম্ভাবী দুর্ভোগের হাত থেকে উদ্ধার পেতে পারি—এই চিন্তায় অস্থির না হ'লে গুরুবাক্যে আমার নিষ্ঠা আসতো না; নিষ্ঠার অভাবে প্রাণপণ প্রচেষ্টাও জাগতো না।'

মিলারেপার অমিত যোগশক্তি, অসীম করুণা, অলৌকিক জীবন যে কেবল নিষ্ঠা ও প্রচেষ্টার ফল, একথা শিষ্যেরা নিঃসংশয়ে মেনে নিতে পারতেন না, কারণ তাঁদের মনে এই ধারণাটাই বদ্ধমূল হয়ে গিয়েছিল যে এই লোকোত্তর পুরুষের দেবদুর্লভ জীবন কখনোই একটি জীবনের তপস্যার ফলে সম্ভব হয় নি। তাঁদের মনে হ'ত, এ কোন ছদ্মবেশী দৈবশক্তি—স্বয়ং তথাগত বুদ্ধের সাক্ষাৎ অবতার। তাঁদের ভাব

বুঝে মিলা বলতেন, 'তোমাদের কথার প্রতিবাদ করতে চাই না। কার অবতার আমি, সে সংবাদ আমি রাখি না—রাখার প্রয়োজনও বোধ করি না। তোমাদের বিশ্বাসে হস্তক্ষেপ ক'রে, আমি তোমাদের ভাব ভঙ্গ করতে চাই না। আমি জানি, যে অবতারই আমি হই, আমার এই সুদীর্ঘ জীবনের তপস্যার পূর্বে আমি বদ্ধ জীব ছাড়া আর কিছুই ছিলাম না। আমার প্রতি প্রীতি ও বিশ্বাসে, যদি তপস্যাকে খর্ব ক'রে অবতারত্বের মহিমাকে বাড়িয়ে দেখো—তা হলে ধর্মের প্রতি তোমাদের বিষম অবিচার করা হবে। আমার সম্বন্ধে যা বিশ্বাস করো তাতে তোমাদের বা আমাব কোন রকম ক্ষতিবৃদ্ধি নেই, কারণ বিশ্বাস যদি আন্তরিক হয়, তাতে বিশ্বাসের অনুরূপ লাভই তোমাদের হবে। কিন্তু সেই বিশ্বাসে যদি তপস্যাকে অবহেলা করো, তাহলে প্রার্থিত বস্তু লাভ করা সহজ হবে না। আধ্যাত্মিক অগ্রগতির পথে লোকে যখন অকারণে অথবা সামান্য কারণে, নির্বিচারে নিজেকে অবতারের আসনে সমারূঢ় ক'বে তোলে, তখনই সে বুদ্ধির দোষে ও আত্মাভিমানে অবনতির পথটি বেছে নিয়। আমি তোমাদের বারংবার বলেছি, এখনও বলছি—এ পথে কোনরকম অহঙ্কারেরই স্থান নেই। এ পথের একমাত্র সম্বল জ্বলন্ত বিশ্বাস, প্রাণবন্ত নিষ্ঠা, অনমনীয় দৃঢ়তা—এবং অনলস তপস্যা। পূর্ববর্তী মহামানবদের জীবনধারা অনুসরণ করো, বিচার ক'রে দেখো তাঁবা কিভাবে মোহময় সংসারকে সবলে প্রত্যাখ্যান ক'রে কঠিন তপস্যায় আত্মনিয়োগ করেছিলেন, সর্বদা স্মরণে রাখো যে মাথার উপরে মৃত্যুর করাল ছায়া উদ্যত হ'য়ে আছে, এবং এই ভাবে তপস্যায় লেগে থাকো। এ ছাড়া আর অন্য কোন পথ নেই—কারণ সর্বস্ব ত্যাগ না করলে সর্বস্ব লাভ করা যায় না। যা কিছু আমি পেয়েছি যা কিছু আমি হয়েছি—সব এই ভাবেই সম্ভব হয়েছে ; অন্য কোন সহজ পন্থার কথা আমি জানি না, সে রকম কোন পথ আছে বলেও মানি না।'

'তপস্যা-তপস্যা-তপস্যা' শুনতে শুনতে শিষ্যেরা হাঁপিয়ে উঠেছিলেন। তাঁরা সবিনয়ে নিবেদন করলেন, 'প্রভু, আপনার এই অত্যাশ্চর্য তপস্যাময় জীবনের অভিজ্ঞতায়, কঠোর কৃচ্ছ্র সাধনের নিরবচ্ছিন্ন অধ্যায় ছাড়া আর কিছুই কি নেই?' মিলা সহাস্যে বললেন, 'কেন, আমার প্রথম জীবনের মূঢ়তায় কি তোমরা হাস্যরসের খোরাক কিছুই পাও নি?' শিষ্যেরা বললেন, 'তা হয়তো আছে, কিন্তু হাসি-কান্নার পার্থক্য সেখানে এত কম যে হাসতে গিয়েও আমরা সে সব কাহিনী শুনতে শুনতে কেঁদে ফেলেছি। তাই আমাদের মাঝে মাঝে ইচ্ছা করে, নিছক হাসির কথা আপনার মুখ থেকে কিছু কিছু শুনি।' মিলা বললেন, 'তপস্যাকে যতক্ষণ বাইরে থেকে দেখো, ততক্ষণ তাকে কঠিন বলেই মনে হয় বটে; কিন্তু তার অভ্যন্তরে যে আনন্দের স্বতঃস্ফূর্ত প্রস্রবণ, তাকে দেখতে হলে সদর ছেড়ে একটু অন্দরের দিকে পা বাড়াতে হয়। তারপরে সকল তপস্যার অবসানে যখন মুক্তিপথের সন্ধান মেলে, এবং সেই বহু দুঃখের আবিষ্কৃত পথ ধরে যখন অগণিত পথহারা দুঃখজয়ের পথে দলে দলে এগিয়ে চলে—এতটুকু জীবনে সে আনন্দ রাখবার স্থান কোথায়?

পেতা যে কয়দিন অনিচ্ছা সত্ত্বেও নির্বাসন বরণ ক'রে মিলার কাছে রইলেন, তার মধ্যে নিজের অজ্ঞাতসারে কি পেলেন, সে কথা জানবার উপায় নেই। বলা বাহুল্য তাঁর সঙ্গপ্রয়াসী অন্তর এ নির্জনতা বেশিদিন সইতে পারলো না এবং শেষ পর্যন্ত মুক্ত বিহঙ্গমকে উদার মুক্তির নিঃসঙ্গতায় বর্জন ক'রে তিনি তাঁর চিরাভ্যস্ত কোলাহলের আশ্রয়ে ফিরে গেলেন। এর পরে মিলা, কোথায় কেমন ভাবে—থাকা-না-থাকার মাঝখান দিয়ে কালাতিপাত করতে লাগলেন—সে বিবরণ লোকচক্ষুর অগোচর। কাঞ্চনজঙ্ঘার গিরিগুহায়, নেপালের য়োলমো কাংড়ার কন্দরে, জ্ঞাত অজ্ঞাত, গম্য অগম্য, ক্ষুদ্র বৃহৎ কত রকমেরই গুহায় যে তিনি তপস্যা করলেন, কত রকমের শরীরি

অশরীরি যে তাঁর কাছে শিক্ষাদীক্ষা লাভ ক'রে কৃতার্থ হ'ল— সে সমস্ত কাহিনী কোন মানুষের জানবার উপায় নেই। শিষ্যে প্রশিষ্যে—শাখাপল্লবে বিস্তৃত হয়ে, তাঁর অধ্যাত্ম রাজ্য ক্রমে সুদূর-প্রসারী হয়ে উঠলো। এর মধ্যে গৃহী সংসারী থেকে আরম্ভ ক'রে, সর্বস্বত্যাগী সন্ন্যাসী পর্যন্ত সকলেরই স্থান ছিলো। কোথা থেকে, কেমন ক'রে লোকে তাঁর কথা জানলো—কি ভাবে তার তপস্যার সৌরভ দিকদিগন্তে পরিব্যপ্ত হল, কি আশ্চর্য উপায়ে তাঁর আকর্ষণে মুমুক্ষু মানবতা তাঁর দূর-দুর্গম গুহাপ্রান্তে এসে সমবেত হ'ল—সে সব অলৌকিক সংঘটন এ পর্যন্ত লোকের মুখে মুখে পৌরাণিক কাহিনীর মত, তিব্বতের পার্বত্য উপত্যকায় ছড়িয়ে আছে। তিব্বতের লোকেরা আজ পর্যন্ত মিলার নাম শুনলে বুদ্ধকে বোঝে, বুদ্ধের নাম শুনলে মিলাকে বোঝে। সারা জীবন যে মিলা নিজের অলৌকিক সত্বাকে মানবতার আবরণ দিয়ে, দৈন্যের আচ্ছাদনে আবৃত ক'রে রেখে-ছিলেন—লোকের অন্তরে অন্তরে আজও তাঁর জন্য অবতারের রাজ সিংহাসন।

মিলারেপার জীবনের শেষ প্রান্তে—যখন অধ্যাত্মসম্পদ আহরণের লীলা শেষ হয়ে বণ্টনের পালা শুরু হয়েছে, যখন তিনি আর লোক সংসর্গ পরিত্যাগ ক'রে একক জীবন যাপন করেন না, এবার সেই কাহিনী। এখন আর প্রতিষ্ঠার ভয়ে ভীত হয়ে তিনি দিগ্বিদিকে ছুটে বেড়ান না। যেখানে যখন সাময়িক ভাবে অবস্থান করেন—দেশ দেশান্তরে ধর্মপিপাসুর দল তাঁর চারিপাশে ভিড় ক'রে আসে, শূন্য পাত্র অজস্র ধারায় ভরে নিয়ে, যথাসময়ে নিঃশব্দে ফিরে চলে যায়। সবাই যে ফিরে যায় তাও নয়; এমন অনেকে আসে, যারা আর ফেরে না; দেহ মন প্রাণ চিরদিনের জন্য বিকিয়ে দিয়ে, মিলার নির্দিষ্ট সাধন-পন্থা গ্রহণ ক'রে, তাঁরই আদেশে কোন-না-কোন স্থানে ধর্ম-সঙ্ঘ রচনা ক'রে রয়ে যায়।

এমনি এক সময়ে, মিলা যখন ড্রিণ প্রদেশে অবস্থান করছেন, তখন তাঁর দর্শন লাভের জন্য এক বিশিষ্ট সম্পন্ন ব্যক্তি পার্শ্ববর্তী গ্রাম থেকে এসে উপস্থিত হলেন। সে অঞ্চলে লোকটির খ্যাতি প্রতিপত্তির অন্ত নেই—ভাবভঙ্গি রাজর্ষির মত, বেশভূষায় মণিমাণিক্যের ছড়াছড়ি। সঙ্গের লোকজনেরা সসম্ভ্রমে তাঁর পরিচয় দিয়ে বললেন, 'ইনি আমাদের মহামান্য লামা সাফুয়া : আমাদের এ অঞ্চলের শীর্ষস্থানীয় ; আপনার দর্শনের জন্য এসেছেন।' লামা সাফুয়া অতি আড়ম্বরে মিলাকে অভিবাদন করলেন, কিন্তু বেশভূষা আকৃতি প্রকৃতি লক্ষ্য ক'রে ভক্তিভাব দূরে থাক তাঁর বিতৃষ্ণার অবধি রইলো না। প্রকাশ্যে সে ভাব দেখানো চলে না, কারণ মিলার অতি অলৌকিক যোগবিভূতির বিষয়ে নানা রকমের জনশ্রুতিই তাঁর কানে এসেছিলো। এই দীনহীন উলঙ্গ সাধুটার মধ্যে লোকে যে কি দেখে,—কেন যে দলে দলে উন্মাদেরা এর কাছে ছুটে আসে—এ কথা ভেবে তাঁর বিস্ময়ের সীমা-পরিসীমা রইলো না, এবং সঙ্গে সঙ্গে ঈর্ষার সঙ্গে উষ্মা জড়িত হয়ে তাঁর মনের মধ্যে এক বিকৃত বিষাক্ত ভাবের সৃষ্টি হ'ল। মিলা যে কতবড় একটা অপদার্থ, এই সত্যটি মুগ্ধ ভক্তদের চোখে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দেবার উদ্দেশ্যে তিনি বড় বড় আধ্যাত্মিক সমস্যার অবতারণা করতে লাগলেন। কিন্তু যেমনটি আশা করছিলেন ঠিক যেন তেমন হ'ল না, কারণ মিলা অতি অবলীলাক্রমে তাঁর সমস্ত প্রশ্নেরই সদুত্তর দিলেন। কূট তর্কের সহজ সরল উত্তর শুনে সমাগত ভক্ত মণ্ডলি মুগ্ধ হয়ে গেলেন দেখে লামা সাফুয়া হিংসায় জ্বলতে লাগলেন। সন্ধ্যা সমাগমে যখন তাঁর ওঠবার সময় হ'ল, তখন তিনি বাহ্যতঃ বিনীতভাবে বিদায় নিয়ে গেলেন, কিন্তু মনের মধ্যে সূক্ষ্মাগ্র কাঁটার মত জেগে রইলো দানবীয় প্রতিহিংসার বাসনা। সুযোগ এসে উপস্থিত হ'ল সামান্য কয়েক দিনের মধ্যে।

ড্রিণ প্রদেশের এক ভক্তপরিবারের সনির্বন্ধ অনুরোধে মিলাকে

এক বিবাহ-সভায় প্রধান অতিথি রূপে উপস্থিত হতে হ'ল। গৃহকর্তা কৃতার্থ হয়ে সপরিবারে মিলার পদপ্রান্তে প্রণিপাত ক'রে সভার সর্বোচ্চ স্থানে তাঁকে নিয়ে গিয়ে বসালেন। লামা সাফুয়ার স্থান হ'ল তাঁর নিচেই। সর্বসমক্ষে অভ্যাগত মিলাকে প্রণাম ক'রে লামা সাফুয়া নিজের আসনে গিয়ে বসলেন। কিন্তু নির্বিকার মিলা তাঁকে কোন প্রত্যভিবাদন করলেন না দেখে তাঁর ক্ষুব্ধ অন্তর ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলো। একমাত্র নিজের গুরু ছাড়া মিলা কখনো কারুর কাছে মাথা নোয়ান নি, অতএব সামাজিক কর্তব্যের কোন মূল্যই তাঁর ছিল না। মিলা যে কতবড় মূর্খ এবং তিনি নিজে যে তাঁর তুলনায় কতবড় মহা পণ্ডিত, সভাস্থ সকলের কাছে এটা প্রমাণ করতেই হবে, নইলে খ্যাতি প্রতিপত্তি বজায় রাখা যাবে না। এই কথা ভেবে, তিনি বস্ত্রাঞ্চল থেকে একখণ্ড পুঁথি বার ক'রে মিলার হাতে দিয়ে বললেন, 'এই দুরূহ দার্শনিক গ্রন্থের অর্থভেদ করতে পারছি না, আপনি যদি অনুগ্রহ ক'রে গ্রন্থখানি পাঠ ক'রে আমাকে আক্ষরিক অনুবাদ ক'রে বুঝিয়ে দেন তাহলে বড়ই কৃতার্থ হই।'

মিলা গ্রন্থখানি হাত দিয়েও ছুঁলেন না; বললেন, 'এ সব গ্রন্থপাঠে আমার কিছুমাত্র প্রবৃত্তি নেই। এসব কাজে তোমাদেরই নৈপুণ্য। শাস্ত্রের অর্থ ঠিকমত বুঝতে হ'লে সর্ববিধ জাগতিক আশা আকাঙ্ক্ষার মূলোচ্ছেদ ক'রে আমিত্বের বর্জন করা দরকার। নির্জন পর্বতে গিয়ে ধ্যানধারণা না করলে শাস্ত্রীয় সত্যের স্ফুরণ হয় না। পুঁথিতে লেখা শব্দাড়ম্বরের মধ্যে সত্যকে খুঁজে পাওয়া যায় না; এসব কথার বোঝা কাজে লাগে কেবল অর্থহীন তর্কযুক্তির মাঝে নিষ্ফল আত্মম্ভরিতায়। পুঁথির পাতায় অজ্ঞতার অন্ধকার, পুঁথির মধ্যে সত্য নেই। তাই আমি এসব জানি না—যাও বা শিখেছিলাম সে সব ভুলে গেছি। ও সব রাখো, বরং আমি গান করি তুমি শোনো। কেন যে শাস্ত্রপাঠে আমার অভিরুচি নেই এই গানেই তুমি বুঝতে পারবে।

'অসীম কৃপা আমার গুরুদেব মার্পার। সেই কৃপার ফলে যেন আমি তর্কযুক্তি সমস্যার প্রতি কোনদিন আকৃষ্ট না হই। যখন থেকে সেই পরম করুণার ছোঁয়া পেয়েছি, তখন থেকেই আমার চিত্ত অবান্তর বিষয় থেকে চিরদিনের জন্য নিবৃত্ত হয়ে গেছে। সেই জ্যোতির্ময়ের ধ্যানে আমি আত্মহারা হয়ে গেছি : জাগতিক শক্তি ও সম্ভ্রমে আমাব দৃষ্টি নেই, দেহবোধ হয়েছে অন্তর্হিত, আশাও নেই আশঙ্কাও নেই, পুথিঁর বন্ধন থেকে আমি মুক্তি পেয়েছি। কার লেখা কি পড়বো, নিজের মনে নিজেকেই আমি পড়ি আর তারই মধ্যে তলিয়ে যাই। যা কিছু জানার জানি আমি নিজের অন্তরে—সমস্যাও থাকে না, সমাধানের প্রয়োজনও থাকে না। যা অনন্ত—যার সৃষ্টি স্থিতি লয় নেই—তার মাঝখানে কোথায় নাম, কোথায় রূপ ? নিজের ধর্মকায়ার অনুভূতির মাঝে হারিয়ে গেছে মনেব ধ্যান। আদি-অন্তহীন সত্ত্বার স্বাধীনতায় ডুবে থেকে ভুলে গেছি কৃত্রিম লোকাচারের অনুশাসন। দেহ-মনের নিরতিশয় দৈন্যে শক্তির গর্ব ক্ষমতার ঔদ্ধত্য নিঃশেষে বিলুপ্ত হয়ে গেছে। দেহ-দুর্গে অধিষ্ঠিত হয়ে আরাম আবাস আমার নেই ; নৈশব্দের প্রত্যক্ষ জ্ঞানে শব্দরূপ বিধৃত বিশেষ্য বিশেষণ ক্রিয়াপদের অর্থ আমি হারিয়ে ফেলেছি। হে পণ্ডিত, তোমাদের পুঁথির পাতায় এসবের অর্থ তুমি খুঁজে দেখো।'

লামা সাফুয়া মিলার এই গান শুনে বিষম অপমানিত বোধ করলেন। হিতাহিত জ্ঞানশূন্য হয়ে বললেন, 'এসব তোমার যৌগিক বাগাড়ম্বরে আমি ভুলি না। দার্শনিক যারা তারা তোমার এই সব অর্থহীন বাক্য-বিন্যাসে ভুলবে না। শাস্ত্র প্রমাণে তোমাকে আমি উচ্চাসন দিতে পারবো না। ধর্মতত্ত্বের কিছুই তুমি বোঝো না। আমারই ভুল হয়েছিল, লোকের কথা শুনে তোমাকে আমি উঁচুদরের সাধক বলে ভেবেছিলাম। এখন বুঝছি, তুমি আমার প্রণম্য নও, তোমার কাছে মাথা নত করা আমার উচিত হয় নি।'

নির্বিকার মিলা এ অপমানে কিছুমাত্র বিচলিত হলেন না। তিনি হাসিমুখে নিজের আসনে স্থির হয়ে বসে রইলেন। কিন্তু সম্মানিত অতিথির এই অপমানের গৃহস্বামী তীব্র প্রতিবাদ করলেন। কেবল তিনি একা প্রতিবাদ করলেও একটা কথা ছিল। কিন্তু যা ঘটলো তা লামা সাফুয়ার মত মহামান্য ব্যক্তির পক্ষে যেমন অপ্রত্যাশিত তেমনি মর্মান্তিক। সে অঞ্চলে ইতিপূর্বে তাঁর প্রতিপত্তির অন্ত ছিল না; সামাজিক পদমর্যাদায় তিনিই ছিলেন এ যাবৎ সর্বাগ্রগণ্য। ধর্মমণ্ডলির প্রধান রূপে তাঁরই স্থান ছিল সবার উপরে। দণ্ডমুণ্ডের একমাত্র কর্তা ছিলেন তিনি; তাঁর মুখের উপরে কেউ কোনদিন মাথা উঁচু ক'রে স্পর্ধিত প্রতিবাদ জানাতে পারে—একথা তিনি কখনো স্বপ্নেও মনে স্থান দিতে পারেন নি। লোকের ক্রিয়া-কর্মে তিনি আমন্ত্রিত হয়ে চিরদিন এসেছেন রাজার মত মাথা উঁচু ক'রে, নিজের অপ্রতিহত অধিকারে শ্রেষ্ঠ আসনটিতে গিয়ে বসেছেন, জনপদের আপামর জনসাধারণ তাঁর পায়ে মাথা রেখে প্রণাম করেছে, কৃতার্থ হয়ে স্বাগত সম্ভাষণ জানিয়েছে। এই ব্যবস্থাই এতদিন সমভাবে চলে এসেছে। কোথাকার এক ভুঁইফোঁড় ভণ্ড—কদাকার উলঙ্গ দেহে বুজরুকির বোঝা নিয়ে এসে, তাঁর প্রাপ্য আসনটি অধিকার ক'রে বসবে এবং প্রকাশ্য সভায় এভাবে তাঁকে ধূলায় মিশিয়ে দেবে—এ অসহ্য। অথচ এ গর্হিত অপরাধের সামান্য একটু প্রতিবাদও করা চলবে না? তাঁর বিবেচনায় তিনি মিলাকে যেটুকু বলেছেন, তার মধ্যে অন্যায্য বা অশিষ্ট কিছুই ছিল না, কারণ শাস্ত্র যে জানে না বা মানে না—ধর্মজগতে তার স্থান কোথায়? কোথায় লোকে তাঁকে সমর্থন করবে, তা না হয়ে, তাঁরই পদানত আশ্রিত লোকেরা সর্বসমক্ষে আজ তাঁকেই যে এমন ক'রে অপমান করবে, এ কথা কি কোনদিন স্বপ্নেও মনে হয়েছে! তাঁর মুখের উপরে যখন জনমত সমবেত কণ্ঠে তীব্রস্বরে প্রতিবাদ ক'রে ব'লে উঠলো—'সাবধান

লামা সাফুয়া, মিলাকে অপমান করার স্পর্ধা তুমি কোরো না ; তোমার বিদ্যা যতই হোক, তোমার মত পণ্ডিত যত গণ্ডা যেখানে আছে—তাদের সমস্ত বিদ্যা একত্র করলেও মিলার সামান্য একটি লোমকূপেরও তূল্য হয় না। ধর্মের বা সত্যের বড়াই করা তোমার সাজে না। কুশীদজীবি লামা তুমি—নিছক লামা-নামের কল্যাণে যেটুকু উচ্চাসন পেয়েছো তাতেই সন্তুষ্ট থাকো। মিলার পাশে বা মিলার ধারে কাছে কোথাও তোমার স্থান নেই।'—তখন তাঁর মনে হল যেন অকস্মাৎ পায়ের তলার মাটি সরে গিয়ে অতলস্পর্শ গহ্বরের সৃষ্টি হয়েছে।

এতবড় অপমানের পরেও তিনি স্তব্ধ হয়ে বসে রইলেন ; না পারলেন গায়ের ঝাল মেটাতে, না পারলেন সভা ত্যাগ ক'রে যেতে। রুদ্ধ আক্রোশে ফুলতে ফুলতে প্রতিশোধের চিন্তা করতে লাগলেন। চোখের সামনে তিনি যে ভবিষ্যতের চিত্রটি দেখতে লাগলেন—সেটি কোনমতেই আনন্দের বলা চলে না। মিলার জন্য তাঁর প্রতিষ্ঠা, সম্পদ, শ্রী সব যেতে বসেছে। শীঘ্রই এমন একদিন আসবে যেদিন কাতারে কাতারে নরনারী তাঁরই সিংহদ্বারের সামনে দিয়ে মিলার গুহাদ্বারে ভক্তিশ্রদ্ধার অর্ঘ্য নিয়ে সমবেত হবে। সে বঞ্চনা তিনি সইবেন কি ক'রে ?

লামা সাফুয়া উদ্‌ভ্রান্ত চিত্তে ভাবতে লাগলেন—এমনটা কি ভাবে সম্ভব হ'ল ? তাঁর বহু শ্রমে গড়া প্রতিষ্ঠার সৌধ এক ঐন্দ্রজালিকের বিসদৃশ চক্রান্তে এমন ক'রে কেন ভেঙ্গে পড়বে ? গানের ছলে যে হেঁয়ালি তিনি শুনলেন—এ আবার কি রকমের বৌদ্ধধর্ম ? সারাজীবন ধরে তিনি যে বৌদ্ধদর্শনের আলোচনা করেছেন—তার মধ্যে তো এ সব কথা আছে বলে মনে হয় না। ধর্ম-বিরুদ্ধ, ধর্ম-বিগর্হিত, ভ্রান্ত মতবাদের কুয়াশায় যুক্তিকে বিভ্রান্ত ক'রে, এই কৌশলী যাদুকর তাঁর নিজস্ব ক্ষেত্র থেকে তাঁকে অপসারিত ক'রে, নিজের প্রতিপত্তির সাম্রাজ্য করতে চায়। এসব কথা বৌদ্ধধর্মের কথা নয়—হতে পারে

না; এসব ভাব—বিভ্রান্ত, বিজাতীয়। অন্ধ জনমত কিসের সম্মোহনে ভুলেছে কে জানে? নিশ্চয়ই মিলার বহু অলৌকিক ক্ষমতার কথা শাখাপল্লবে বিস্তারিত হয়ে তাদের মনে এই মিথ্যা মোহাবরণের সৃষ্টি ক'রে থাকবে। ধর্মরক্ষায়, সত্য প্রতিষ্ঠায়, অসত্যের দমনে, অনর্থের প্রতিকার প্রত্যেক স্বধর্মনিষ্ঠ ব্যক্তির কর্তব্য আছে। প্রতিকারের পন্থা হিসাবে কোন অন্যায়ই অন্যায় নয়, বিষের ঔষধ যে বিষ—এ সত্য শাস্ত্রসম্মত। বিদ্বেষে মুখ কালো ক'রে সভার অবসানে যখন লামা সাফুয়া নিজের আবাসে ফিরে গেলেন—সেদিন তাঁর অনুগমন করবার জন্য, তাঁর চিরদিনের অনুগত ভক্তেরাও কেউ, সাগ্রহে এগিয়ে এলো না। ক্রোধে, আক্রোশে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়ে, তিনি একা একা পাহাড়ের পথ দিয়ে নির্দিষ্ট ভাবে, পাগলের মত, ঘুরে বেড়ালেন। বাড়ি ফিরেই তাঁর এক বিশ্বস্তা রক্ষিতাকে ডেকে পাঠালেন। রুদ্ধদ্বার কক্ষে মন্ত্রণা-সভার সিদ্ধান্ত মিলার কিছুই অজানা রইলো না।

পরদিন লামা সাফুয়ার দেওয়া বিষাক্ত দধির ভাণ্ড নিয়ে একটি নারী যখন মিলার গুহাদ্বারে উপনীত হ'ল—মিলা তখন ধ্যানস্থ। পূর্বাপর সমস্ত জেনে এই অসহায়া নারীর জন্য তাঁর মন অনুকম্পায় ভরে উঠলো। তিনি বুঝলেন এর কোন হাত নেই; লামা সাফুয়ার প্রতিশ্রুত বহুমূল্য রত্নের লোভে হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে এই দুর্ভাগা নারী নরহত্যার নিমিত্ত হতে অগ্রসর হয়েছে। দোষ এর নয়, দোষ—লোভ নামক সাংসারিক প্রবৃত্তির। তিনি একথাও বুঝলেন যে বহু-প্রতারিতা এই হতভাগিনী নারী পুনরায় প্রতারিত হবার পথে চলেছে, কারণ যে রত্নের লোভে সে এ কর্মে প্রলুব্ধ হয়েছে, শেষ পর্যন্ত সে রত্নও সে পাবে না। মিলা ভাবলেন—এখনই যদি আমি আমার চিরাচরিত স্বভাব অনুসারে এই খাদ্য গ্রহণ করি, তাহলে আর এর প্রতিশ্রুত রত্নলাভের আশা নেই, কারণ নিজের উদ্দেশ্য সফল হওয়ার পরে কুচক্রীর আর এই প্রতিশ্রুতির কথা মনেও থাকবে না, বরং

হয়তো তখন আমার মৃত্যুর জন্য সে এই হতভাগিনীকেই অভিযুক্ত করবে।

নিজের আসন্ন মৃত্যুর জন্য মিলার অন্তরে বিন্দুমাত্র ক্ষোভ ছিল না, কারণ তাঁর আরব্ধ কর্ম যে সমাপ্তির পানে চলেছে—এ তিনি জানতেন। ফুল ফোটার পালা যতদিন চলছিলো ততদিন ছিল মৃত্তিকার দেহটির প্রতি দায়িত্ব ঃ আজ সেই ফুলফোটার অবসানে এসেছে দিকদিগন্তের পরিণত ফলসম্ভার, জন্ম-জন্মান্তরের কর্মসূত্রে তাঁর কাছে যার যা প্রাপ্য ছিল—সমস্ত ঋণ কড়ায় গণ্ডায় পরিশোধ করা হয়ে গেছে। এখন শেষ প্রাপ্য হয়তো বা এই অতি অভাগিনী নারীর। 'সব্বে সত্তা সুখিতা হোন্তু, অবেরা হোন্তু, অব্যাপজ্‌ঝা হোন্তু, সুখী অত্তানং পরিহরন্তু, সব্বে সত্তা মা যথালব্ধসম্পত্তিতো বিগচ্ছন্তু'—বুদ্ধের এই মহাবাণী—সকল প্রাণী সুখিত হোক, শত্রুহীন হোক, অহিংসিত হোক, সুখী আত্মা হয়ে কালহরণ করুক। সকল প্রাণী আপন যথালব্ধ সম্পত্তি হতে বঞ্চিত না হোক। 'মাতা যথা নিযং পুত্তং আয়ুসা একপুত্তমনুরক্‌খে, এবমিপ সর্বভূতেষু মানসং ভাবয়ে অপরিমানং ঃ মা যেমন একটিমাত্র পুত্রকে নিজের আয়ু দিয়ে রক্ষা করেন, সমস্ত প্রাণীতে সেই প্রকার অপরিমিত মানস রক্ষা করবে। বুদ্ধের এই আদেশ, গুরুর এই শিক্ষা, মিলার জীবনে ওতপ্রোত হয়ে উঠেছিল বলেই মিলা ভীতিকম্পিতা বেপথুমানা নারীর মুখের পরে প্রসন্ন দৃষ্টি স্থাপন ক'রে বললেন, 'তোমার প্রদত্ত খাদ্য আমি গ্রহণ করবো—কিন্তু এখনও তার সময় হয় নি। এখন তুমি ফিরে যাও; পরে এসো, তখন আমি তোমার খাদ্য গ্রহণ করবো।'

লজ্জায় মুখ ঢেকে, ভীত ত্রস্ত হয়ে মেয়েটি সে স্থান ত্যাগ ক'রে লামা সাফুয়ার প্রাসাদে ফিরে গেল। নির্দিষ্ট কক্ষে সাফুয়া উৎকণ্ঠিত চিত্তে তারই পথ চেয়ে বসে ছিলেন। বললেন, 'সংবাদ কি? এত শীঘ্র ফিরে আসবে তা তো আমি ভাবিনি। দধির ভাণ্ড ফিরিয়ে

এনেছো কেন?' উদগত অশ্রু কোনক্রমে সম্বরণ ক'রে মেয়েটি বললো, 'আমার দ্বারা এ হবে না: যিনি সব জানেন তাঁকে আমি কেমন ক'রে প্রবঞ্চনা করবো? সবাইকার সব খাদ্যই যিনি স্বীকার করেন—আমার খাদ্য গ্রহণে তিনি অস্বীকার করলেন দেখেই তো বোঝা যায় যে কিছুই তাঁর অজানা নেই।' ব্যঙ্গ হাস্যে কক্ষতল প্রকম্পিত ক'রে লামা সাক্যিয়া বললেন, 'তুমি একটি মূর্খ: গণ্ডমূর্খ বললেও অত্যুক্তি হয় না। তুমিও লোকের মুখে মিলার শক্তির অতিরঞ্জিত বর্ণনা শুনে অর্থহীন প্রলাপ বকছো। মিলার যদি সে শক্তিই থাকবে তাহলে কি আর তাকে ভিক্ষান্নে জীবনযাপন করতে হয়? শক্তিমানের কাছে দারিদ্র্য কখনো ঘেঁসতে পারে? তা ছাড়া, মিলা তো তোমার খাদ্য গ্রহণ করতে অস্বীকার করে নি—পরে আসতে বলেছে, এই মাত্র। এতে এমন প্রমাণ কেমন ক'রে হয় যে সে সব জানে। আরে বাপু, ধর্মতত্ত্ব তো আর আমি নিজেও কিছু কম জানি না; শক্তি যাদের থাকে তাদের দেখলেই চেনা যায়। মিলা একটা বুজরুক—সাধারণ একটা যাদুকর। ওরকম হবার জন্য আর ধর্মসাধনার প্রয়োজন হয় না। মূর্খ লোকেরা কাঁচখণ্ডকে হীরক বলে ভ্রম ক'রে, কিন্তু কাঁচ তো আর তাতেই হীরকখণ্ডে পরিবর্তিত হয়ে যায় না। মিছে দুর্ভাবনা না ক'রে, বরং এই নাও তোমার প্রাপ্য রত্ন তোমাকে অগ্রিমই দিয়ে দিচ্ছি। এবার নিশ্চিত হ'য়ে ফিরে গিয়ে কাজ হাসিল ক'রে এসো। তুমি যে কেন মনে জোর পাচ্ছিলে না, তা আমার আর বুঝতে বাকি নেই; মেয়েদের আমি ভালো ক'রেই চিনি। নিজের আঁচলে-বাঁধা রত্নের মহিমায় এবারে আর মিলার কল্পিত যোগশক্তি বাধা সৃষ্টি করবে না। কিছু কিছু যোগশক্তি আমারও যে আছে—এই যাত্রায় তার প্রমাণ পাবে; দেখবে এবার মিলা নিশ্চয়ই তোমার খাদ্য গ্রহণ করবে।'

হাত পেতে হীরকখণ্ড গ্রহণ ক'রেও মেয়েটি দ্বিধাহত চিত্তে পুনরায় বললে, 'তোমার এ পুরস্কার আমার চাই না, আমি এ কাজ পারবো

না। মিলার শক্তির অনেক অলৌকিক বিবরণ আমি শুনেছি : এবং সে সব কথা আমি এখন আর অবিশ্বাসও করতে পারি না। আমি জানি দ্বিতীয়বারও মিলা এ খাদ্য গ্রহণ করবেন না। তিনি যদি বলেন—'তোমার আনা খাদ্য তুমি নিজে খাও'—তখন আমি কি করবো? এই নাও তোমার হীরে—এ আমি চাই না : ওখানে দ্বিতীয়বার যাওয়ার সাধ্য আমার নেই।'

লামা সাফুয়া যখন দেখলেন যে শিকার প্রায় হাতছাড়া হয়ে যায়, তখন তিনি তাঁর শেষ অস্ত্রটি ত্যাগ করলেন। বললেন, 'মিলা ধর্মের শত্রু বলেই ধর্মমতে আমি তার নিধন কামনা করি। যারা শাস্ত্রের কথা জানে না, তারাই মিলাকে মহাশক্তিধর বলে মনে করে। মিলার কোনরকম অলৌকিক শক্তি নেই ; থাকা সম্ভব নয়, কারণ শাস্ত্রীয় বর্ণনার সঙ্গে তার আচার-ব্যবহার আকৃতি-প্রকৃতির কিছুমাত্র মিল নেই। বেশ তো, তোমার যখন ধারণা মিলা দ্বিতীয়বারও তোমার খাদ্য প্রত্যাখ্যান করবে—তুমি সেটাই কেন পরখ ক'রে দেখো না। যদি সফল হয়ে ফিরতে পারো তখন তোমার আমার স্বার্থ সম্পূর্ণ এক হয়ে যাবে—এবং তখন তোমাকে বিবাহ ক'রে প্রকাশ্যে স্বামীস্ত্রীর মত আমাদের জীবন যাপনেও কোন বাধা থাকবে না। তখন আমার স্ত্রী-রূপে তোমার পদমর্যাদা কতখানি উঁচুতে উঠে যাবে সেটাও একবার কল্পনা ক'রে দেখো। আমার যা কিছু আছে, এই বৃহৎ অট্টালিকা, সমস্ত ধনসম্পদ, রাজৈশ্বর্য সব তোমারই হবে। মিলা যেভাবে নিজের প্রতিপত্তি বিস্তার করছে, তাতে কিছুদিনের মধ্যেই আমার সব যাবে। যদি সব থাকে—সে কেবল তোমার দৌলতেই থাকবে, এবং তারপরে তোমার নিজের কল্যাণ আমার কল্যাণের সঙ্গে মিলে এক হয়ে যাবে। এবার ভেবে দেখো—আর একবার গেলে তোমার তাতে কতটুকু ক্ষতিবৃদ্ধির সম্ভাবনা।'

এবার নারীর মন টললো। নিজের ভবিষ্যৎ কল্পনা ক'রে সে

পুলকিত হয়ে উঠলো। যে বহুমূল্য রত্নটি ইতিপুর্বেই তার হস্তগত হয়েছিল, সেটিকে প্রাণ ধরে ফিরিয়ে দিতে তার বুক ফেটে যাচ্ছিল; তার উপরে এই অসম্বরণীয় প্রলোভন তাকে মুহূর্তের মধ্যে দুঃসাহসী ক'রে তুললো। মিলা যদি সত্যিই শক্তিবান হন, তাহলে বড়জোর দ্বিতীয়বার ফিরে আসতে হবে; আর যদি সত্যিকার ভণ্ড মানুষ হন—তবে আর তাঁর বাঁচা মরায় এমন কি এসে যাবে! অথচ এই দ্বিতীয় অভিযানের বিনিময়ে সে নিজে কোথা থেকে কোথায় উঠে যাবে,—ভিখারিণী হবে রূপকথার রাজরানী। সমস্ত পথটি নিজের রঙিন কল্পনায় বিভোর হয়ে যখন সে মিলার সান্নিধ্যে গিয়ে পৌঁছালো, দেখলো গুহায় আর কেউ নেই, মিলা একা তাঁর আসনে স্থির হয়ে বসে আছেন।

মেয়েটির গুহাদ্বারে পৌঁছানোর সঙ্গে সঙ্গে মিলা চোখ মেলে চাইলেন, মৃদু হেসে দক্ষিণ হাতখানি প্রসারিত ক'রে বললেন, এসেছো? কি খাদ্য দেবে দাও।' কম্পিত বক্ষে বিষাক্ত দধির পাত্রটি তাঁর হাতে তুলে দিয়ে চকিতের মধ্যে তার মনে একটা নিগূঢ় স্বস্তির ভাব খেলে গেল, মনে হ'ল—হয়তো বা লামা সাফুয়ার কথাই ঠিক, মিলা বোধ হয় অসাধারণ নন, নইলে বিষের কথা জানলে কে স্বেচ্ছায় তা গ্রহণ করে, কেই বা এমন প্রসন্ন হাসি হাসতে পারে! তার মাতৃহৃদয়ের কোনখানে যদি বা কোন সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম অনুশোচনার সুর বেজে থাকে—মুহূর্তের স্বস্তিতে সে ভাব চাপা পড়ে গেল।

মিলা বিষের পাত্রটি হস্তে ধারন ক'রে মেয়েটিকে বসতে বললেন। তারপরে একান্ত নির্লিপ্ত, প্রশান্ত ভাবে বললেন, 'প্রতিশ্রুত রত্নটি তো তোমার হস্তগত হয়েছে।' এর মধ্যে প্রশ্ন নেই, তিরস্কার নেই—নিছক একটি মন্তব্য ছাড়া কিছুই এ নয়; কিন্তু চোখের সম্মুখে নীলাকাশ জুড়ে অকস্মাৎ বজ্রপাত হলেও বুঝি কেউ এতখানি চমকে ওঠে না। মেয়েটি মিলার সামনে উপুড় হয়ে পড়ে, থর থর ক'রে কাঁপতে কাঁপতে

তাঁর দুটি পা ধরে কাঁদতে লাগলো ; নিজের সমস্ত অপরাধ আনুপূর্বিক স্বীকার ক'রে বললো, 'আপনি যে সর্বজ্ঞ, প্রভু, সে কথা আমার প্রথম বারেই মনে হয়েছিল। আমি মহাপাপী, আমাকে আপনি ক্ষমা করুন। ও বিষ আমাকে দিন, আমি আপনার সমক্ষে বিষ খেয়ে নিজের মহাপাপের প্রায়শ্চিত্ত করি।' ক্ষমাসুন্দর হাস্যে মিলার মুখ উদ্ভাসিত হয়ে উঠলো ; তিনি বললেন, 'কি বলছো তুমি, তাই কখনো পারি ? আমি বুদ্ধের সেবক—জেনেশুনে তোমাকে মৃত্যুর পথে এগিয়ে দেবো ? তোমার প্রতি আমার মমতা যে কতখানি তা যদি জানতে, তাহলে এমন কথা তুমি কখনোই বলতে না। বোধিসত্ত্বের কাছে শপথের বন্ধনে আমি বাঁধা ; অধ্যাত্মজীবনের ভিত্তি সেই নীতির বন্ধন যদি অমান্য করি, তার ফলে আমাকে কঠিন শাস্তি পেতে হবে। তুমি কেঁদো না, সংসারে মানুষের কত দুঃখ তা আমি জানি। তোমার জীবনের বেদনার সমগ্র ইতিহাসটিই আমি জানি, তোমার ভাগ্যে যত বিড়ম্বনা যত প্রতারণা ঘটেছে—কিছুই আমার অজানা নয়। তোমার দুঃখে আমি দুঃখিত। কি করবে তুমি—সমগ্র সংসার কর্মের দুশ্ছেদ্য বন্ধনে বাঁধা। তোমার প্রদত্ত এই বিষাক্ত খাদ্যে আমার মৃত্যু হয়েছে মনে ক'রে তুমি দুঃখ কোরো না। অন্য সময়ে এ বিষে আমার কোনরূপ ক্ষতিরই সম্ভাবনা ছিল না। কিন্তু এখন আমার এখানকার কর্ম সমাপ্ত হতে চলেছে এবং এই ভাবে মৃত্যুই যে আমার বিধিলিপি তাও আমার অজানা নেই। অতএব তোমার প্রদত্ত এই বিষাক্ত খাদ্যকে আমি অস্বীকার করতে পারি না। এই বিষকে আমার মৃত্যুর কারণ মনে ক'রে তোমার কোনরকম মনস্তাপ ভোগ করার হেতু নেই। তোমাকে প্রথমবার ফিরিয়ে দিলাম কেন জানো ? কারণ তখন আমার মনে হয়েছিল তুমি অকৃতকার্য হয়ে ফিরে না গেলে প্রতিশ্রুত পুরস্কার থেকে তুমি বঞ্চিত হতে। তাই ভাবলাম, আহা, যার লোভে মেয়েটা এমনতর দুষ্কৃতির বোঝা মাথায় নিতে চলেছে—তাও যদি সে না পায়,

সে বিড়ম্বনা বড়ই মর্মান্তিক হবে। তাই তখনই তোমার প্রদত্ত খাদ্য গ্রহণ করিনি। এবার আর সে বাধা নেই ; তোমার প্রাপ্যটুকু তুমি পেয়েছো ; —আমারও কাল পূর্ণ হয়েছে। যাতে তোমার আনন্দ সেটুকু যে তুমি পেয়েছো—এই আমার আনন্দ। এই প্রসঙ্গে আরও কয়েকটি কথা তোমাকে বলতে বড়ই ইচ্ছা করছে। কিন্তু তুমি কি আমার কথায় বিশ্বাস করতে পারবে ?'

হতভাগিনী নারী চোখের জল মুছে বললো, 'হ্যাঁ বাবা, পারবো।' মিলা হেসে বললেন, 'তাই তোমার মনে হচ্ছে, কিন্তু তুমি এখনই ঠিক পারবে না। তবু শুনে রাখো, ও লোকটির কথায় তুমি বিশ্বাস কোরো না—কারণ তোমার কাছে ওর দেওয়া প্রতিশ্রুতির কোন মূল্যই নেই। এখন থেকে যদি আশা না করো, তাহলে পরে আশাভঙ্গের ব্যথা ততটা বাজবে না। আমার বিরুদ্ধে লামা সাক্যা যা কিছু বলেছে—সে সবই যে মিথ্যা কথা, তাও তোমাকে জানিয়ে দিলাম। এখন তোমার মনে যেসব ভাব জাগছে—সে আসল অনুতাপ নয়। একদিন আসবে যেদিন তোমাদের উভয়ের জীবনেই অনুতাপের আগুন জ্বলে উঠবে। তখন যদি পারো দেহমনের শুদ্ধির জন্য সমুচিত কৃচ্ছ্রসাধনায় ভক্তিপথের কৃত্য কোরো। পুরোপুরি না পারলেও এই ধরনের পাপ থেকে বিরত হওয়ার জন্য প্রাণপণে চেষ্টা কোরো। আমার কাছে ও আমার ভক্তগণের কাছে সকাতরে পাপমুক্তির জন্য প্রার্থনা কোরো, এই আমার শেষ উপদেশ। কি বলো, আমার কথা রাখবে তো ?'

অশ্রু-বিগলিত নয়নে মেয়েটি বললো, 'নিশ্চয়ই রাখবো ; কিন্তু সে প্রেরণা সে শক্তি আপনাকেই দিতে হবে।' এ-কথার সরাসরি কোন উত্তর না দিয়ে মিলা যেন নিজের মনেই বললেন, 'কোন সহায়তা না পেলে নিজের সাধ্যে এগিয়ে যেতে এদের যে যুগযুগান্ত কেটে যাবে ঃ দুঃখের যে আর অবধি থাকবে না। এ দুজনের দুষ্কৃতির

বোঝাও যে আমারই দায়; আমি না বইলে এ বোঝা আর কে বইবে।' তারপরে সেই হতভাগিনী রমণীর দিকে ফিরে বললেন, 'তোমাদের এ পর্যন্ত দুষ্কর্মের দায় আমি নিলাম, কিন্তু আমার একটি আদেশ স্মরণে রেখো; এই ঘটনার কথা আমার জীবিতকালে যেন কেউ না জানে। আমার অন্য কোন কথা যদি স্মরণে না রাখো, নিজেদের স্বার্থে আমার এই কথাটি রেখো। শেষ পর্যন্ত এ-কথা গোপন থাকবে না—একদিন সত্য কথা সবাই জানবে, কিন্তু তোমরা নিজের মুখে এ ঘটনার উল্লেখ না করলেই হ'ল।'

বিষের পাত্রটি মিলা নিজের মুখে তুলে ধরলেন। বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে রমণী এই ভয়াবহ দৃশ্যটি দেখলো, কিন্তু বাধা দেবার কোনরূপ চেষ্টাই সে করতে পারলো না। শূন্য পাত্রটি মিলা নামিয়ে রাখলেন দেখে—সিদ্ধকাম হয়ে রমণী লামা সাফুয়ার কাছে ফিরে গেল। তার মুখে সমস্ত বিবরণ শুনে লামা উৎফুল্ল হয়ে বললেন, 'আরে রাখো তোমার অনর্থক অনুতাপ; যে যা বলে, সব কথাই কি সত্য বলে ভাবতে হবে? বিষ যখন পেটে গেছে তখন আর দুশ্চিন্তার কিছু নেই। বিষের কর্ম বিষই করবে। তবে হ্যাঁ, মিলার শেষ কথাটা দামী, সন্দেহ নেই; এ বিষয়ে কারুর কাছে ঘুণাক্ষরে কিছু বোলো না। এ উপদেশটা সত্যিসত্যিই মূল্যবান—সহজে ভুলে যাওয়া উচিত হবে না।

নিজের দেহের মধ্যে বিষক্রিয়া শুরু হয়ে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মিলা নিজের শেষ কর্তব্যে মনোযোগী হ'লেন। টিংরি ও নিয়ানাম প্রদেশে যেখানে যত শিষ্য-প্রশিষ্য ভক্ত বা দর্শনার্থী ছিলেন—সবাইকার ছোট বড় প্রাপ্য পরিশোধের উদ্দেশ্যে সকলকে আহ্বান পাঠিয়ে দিলেন। প্রত্যেকের কাছে অনুরোধ গেল যেন তারা আসবার সময়ে কিছু না কিছু অর্ঘ্য নিয়ে আসে। অপ্রতিগ্রাহী নির্লোভ মিলার কাছ থেকে এ ধরনের প্রত্যাদেশ পেয়ে সবাই বিস্মিত হয়ে ভাবতে

লাগলো যে এর পিছনে গভীর কোন একটি তাৎপর্য নিশ্চয়ই আছে, কিন্তু কি সে তাৎপর্য বা কেন এই জরুরি আমন্ত্রণ, সে কথাটি কেউই বুঝতে পারলো না। সংবাদটি লোকের মুখে মুখে দূর-দূরান্তের জনপদে দাবানলের মত ছড়িয়ে পড়লো। সবাই বুঝলো—এ ডাক উপেক্ষা করার মত নয়। যার কানে খবরটি পৌঁছালো—সেই সঙ্গে সঙ্গে হাতের কাজ ফেলে লেপ্‌চি চুবারের নির্জন গুহার উদ্দেশে বেরিয়ে পড়লো। পথের মধ্যে যার সঙ্গে যার দেখা হয়, সেই বলে, 'শুনেছো খবর ?' যে মিলার আপন বলে নির্দিষ্ট কোথাও কেউ নেই—তিনি যেন কেমন ক'রে, পরিচয় অপরিচয়ের সমস্ত মানবীয় গণ্ডী অতিক্রম ক'রে বিশাল মানবতার বুকের মধ্যে মুখ রেখে, একসঙ্গে সবাইকে কাছে টানতে লাগলেন। দীর্ঘ পার্বত্য পথের বাঁকের পর বাঁক অতিক্রম ক'রে, পিপীলিকা-শ্রেণীর মত অগণিত নরনারী মিলার গুহা-সন্নিহিত প্রশস্ত উপত্যকায় দিনের পর দিন সমবেত হতে লাগলো। জাহ্নবী স্রোতের মত অনর্গল ধারায় মিলা সমবেত জনতাকে সত্যের কথা, ধর্মের কথা, মুক্তির কথা শোনাতে লাগলেন। একদল আসে, আর একদল যায়,—মিলার বিরাম নেই, বিশ্রাম নেই ; লোকেও ক্ষুধা-তৃষ্ণা ভুলে মিলার কথাগুলি উৎকর্ণ হয়ে শোনে ; কেউ বা বোঝে, কেউ বা কিছু বোঝে না ; কেউ শোনে তাঁর সুমধুর কণ্ঠস্বর, কেউ দেখে তাঁর করুণাঘন মূর্তি। কারুর মনে হয়, এমনটি আর কখনো শুনিনি, কারুর মনে হয় এমনটি আর এ জীবনে প্রত্যক্ষ করিনি। কি যেন একটা নাম-না-জানা আনন্দের নেশায় বৃহৎ জনতার প্রত্যেকটি নরনারী ভরপুর হয়ে থাকে। সবাইকার মনে হয় এ যেন আর এক জগতের বিস্ময়কর সংঘটন। শোকার্ত যে আসে শোক ভুলে যায়, কামনা বেদনার পীড়ন সঙ্গে সঙ্গে প্রশমিত হয়ে যায়, ক্ষুদ্র বৃহৎ প্রত্যেকটি আধার কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে যায়। তাদের প্রত্যেকের মনে হয় গিরিরাজের শিলাখণ্ডগুলি থেকে আরম্ভ ক'রে,

প্রত্যেকটি বৃক্ষের শাখাপল্লব, পদপ্রান্তের তৃণগুলি, আকাশের মেঘখণ্ড পর্যন্ত স্তব্ধ হয়ে কান পেতে আছে। ঝর্ণার কলোচ্ছ্বাসে তারা শোনে মিলার কণ্ঠের ঝঙ্কার, তরুর মর্মরে তারা শোনে তারই প্রতিধ্বনি।

কোন কোন ভাগ্যবান মিলার মুখের পানে চেয়ে থাকতে থাকতে প্রত্যক্ষ করে জ্যোতিসমুদ্রে জ্যোতির্ময়ের আবির্ভাব—আকাশজোড়া মেঘের মত সুবিশাল, আদিত্যের মত বর্ণ-স্নিগ্ধ নয়নাভিরাম পরমানন্দের রূপ। রামধনুর সাতটি রং যেন সারা আকাশ জুড়ে সহস্র বর্ণে উদ্ভাসিত হয়ে উঠেছে, মিলার দেহ পরিবেষ্টন ক'রে আছে বিচিত্র বর্ণের জ্যোতির্মণ্ডল; আকাশের ভাসমান মেঘগুলি ছত্রের আকারে—পতাকা বা শ্বেত শঙ্খের আকারে, পুষ্পগুচ্ছের আকারে রূপান্তরিত হয়ে গেছে। কান পেতে তারা শোনে দূরাগত বংশীধ্বনি, বেণুবীণার অনাহত ঝঙ্কার, শঙ্খ-ঘণ্টার নিনাদ।

মিলার কাছাকাছি যারা ছিলো তারা জানতে চাইলো এই সব অনৈসর্গিক রূপান্তরের তাৎপর্য। তিনি বললেন, 'পৃথিবীতে যেমন তোমরা এসেছো, তেমনি সূক্ষ্ম রাজ্যের বহু অশরীরি আত্মা অতীন্দ্রিয় রাজ্যের নৈবেদ্য নিয়ে আমার সম্বর্ধনার জন্য মহাশূন্যের স্তরে স্তরে সমবেত হয়েছেন। তাঁদের চারিদিকে যে স্বচ্ছ আনন্দলোক তারই প্রভাবে এখানকার আকাশ-বাতাস বর্ণসমুজ্জ্বল হয়ে উঠেছে ঃ তোমাদের মনের আনন্দেও লেগেছে তারই স্পর্শ। এখন আর বলতে বাধা নেই যে উন্নততর সূক্ষ্মস্তরের দেবশক্তি ও মহাপুরুষেরা আমার এই ব্রহ্ম-বিদ্যার আলোচনা শোনবার জন্য জ্যোতির্ময় সূক্ষ্ম দেহে সমবেত হয়েছেন। এই আনন্দ সেই অপ্রাকৃত জগতের পুষ্পবৃষ্টি।'

প্রশ্নকারীরা জানতে চাইলো, 'তবে আমরা তাঁদের দেখতে পাই না কেন?' মিলা বললেন, 'তোমরা পাও না কারণ অজ্ঞানের অন্ধ-কারে তোমাদের দৃষ্টি আবৃত হয়ে আছে। আগন্তুকদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁরা অনাগমী স্তরের দেবতা, যাঁরা বহুজন্মের

পুণ্যফলে আসা যাওয়ার পালা সাঙ্গ করেছেন; ওঁদের দর্শন লাভ করতে হ'লে মোহমুক্ত দৃষ্টি চাই ও যথোপযুক্ত পবিত্রতা চাই, অনুচিত কর্মের বন্ধন ছিন্ন ক'রে প্রজ্ঞার স্তরে অধিষ্ঠান হওয়া চাই, কারণ দেবতাব দর্শনের জন্য দিব্যদৃষ্টি আবশ্যক। পূর্বজন্মের সংস্কার অনুসারে যাদের সৎকর্মে ও সদাচারে প্রবৃত্তি নেই—সেই মন্দমতি লোকেরা দেবলোকের মহিমা প্রত্যক্ষ করতে পারে না। বহুভাগ্যে সদিচ্ছা যখন জাগে, তখনই সমস্ত অপকর্মের সংস্কার পুড়ে ছাই হয়ে যায়। যেসব বদ্ধজীব নিজের প্রকৃত অবস্থা না জেনে অপরকে পরিচালিত করতে চায়, তারা নিজেদেরও অনিষ্ট ক'রে—অপরেরও অনিষ্ট করে। নিজেরা যদি দুঃখের হাত এড়াতে চাও, তা হ'লে অপরের অনিষ্টকর কর্ম থেকে প্রতিনিবৃত্ত হও। পাপের পথ ছাড়ো, পুণ্যের পথে চলো; অনুতপ্ত চিত্তে গুরু ও দেবতার চরণে আত্মসমর্পণ ক'রে তপশ্চর্যার পথে এগিয়ে যাও। তখন দেখবে দেবতামণ্ডলী তোমাদের দৃশ্যপথে জেগে উঠেছেন। এর পরে যখন নিজের ধর্মকায়া মহামনের রূপে প্রকাশিত হবে, তার পরে আর দেখার কিছু বাকি থাকবে না। তখনই হবে কর্মের পরিসমাপ্তি।'

গানের সুরে এই কথাগুলি বলার সঙ্গে সঙ্গে, যেসব লোকের আধ্যাত্মিক প্রস্তুতি ছিল তাঁদের মনের শেষ আবরণটুকু নিঃশেষে অন্তর্হিত হয়ে গেল। আধারের তারতম্য অনুসারে প্রত্যেকের মনোজগতে জেগে উঠলো আধ্যাত্মিক আলোড়ন—অনাস্বাদিত-পূর্ব আনন্দের অনুভূতি জাগলো প্রত্যেকের প্রাণে। নিজের তপস্যার প্রভাবে মিলা যেন একসঙ্গে সকলেরই চিত্তে মহাভাবের হিল্লোল জাগিয়ে দিলেন। সমবেত শিষ্য ভক্ত ও দেবতামণ্ডলীকে সম্বোধন ক'রে মিলা বললেন: 'আমি এখন বৃদ্ধ হয়েছি, এ জীবনে আর কবে আমরা এমনি ক'রে একসঙ্গে মিলিত হবো, তার কোন নিশ্চয়তাই নেই। অতীতের পুণ্যফলে আমরা আজ

এভাবে ধর্মসম্বন্ধে মিলিত হতে পেরেছি। আমার একান্ত অনুরোধ, তোমরা আমার ধর্মোপদেশ সযত্নে তোমাদের প্রাত্যহিক জীবনের কর্মধারায় রক্ষা কোরো। এই কথা যদি তোমরা স্মরণে রাখো, তাহলে জেনো যে, যে-কোন রাজ্যেই আমি পরিপূর্ণ বুদ্ধত্বে উপনীত হই—তোমরাই আমার প্রথম শিষ্যমণ্ডলীর রূপে সত্যলাভের অধিকারী হবে।'

নিয়ানাম প্রদেশের যেসব ভক্তমণ্ডীল সেখানে উপস্থিত ছিলেন, তাঁরা পরস্পরের মুখ-চাওয়াচায়ি করতে লাগলেন। অকস্মাৎ এই বার্ধক্যের প্রসঙ্গে কেন? মিলা এ-কথা কেন বলছেন? আর মিলিত হবার আশাই বা নেই কেন? মিলা কি সত্যিসত্যিই দেহত্যাগ ক'রে অন্য কোন জগতে প্রয়াণ করতে চাইছেন নাকি? তাই যদি হয়, এ ইচ্ছাময়কে প্রতিনিবৃত্ত করবে কার সাধ্য? কিন্তু তা বলে, এভাবে, এখান থেকেই মহাপ্রয়াণ করবেন, তাই বা কেমন ক'রে মেনে নেওয়া যায়? নিয়ানামের অধিবাসীরা সবাই মিলে মিলার পদতলে লুটিয়ে পড়লেন। তাঁদের মিনতি, মিলা যেন তাঁদের প্রতি করুণায়, শেষবারের জন্যও একবার নিয়ানামে পদার্পণ করেন; মরদেহ পরিত্যাগ করতে হলেও যেন যা করবার সেখান থেকেই করেন। এই জনশূন্য পার্বত্য প্রদেশ থেকেই তিনি মহাপ্রয়াণ করবেন—এ চিন্তাও তাঁদের অসহ্য। টিংরি প্রদেশের যাঁরা সেখানে উপস্থিত ছিলেন তাঁদেরও নিবেদন মিলা যেন একবার তাঁদের অঞ্চলে পদার্পণ ক'রে তবে ইতিকর্তব্য নির্ধারণ করেন।

এবার মিলা অনেকটা স্পষ্ট ক'রেই নিজের বক্তব্য বললেন, 'আমার শরীর বার্ধক্যে ভেঙে পড়েছে; অত দূরে যাওয়ার মত সামর্থ্য আমার কোথায়? দেবভূমি চুবারের এই অঞ্চলেই আমি দেহ রাখবো। শেষ সম্বর্ধনা জানিয়ে তোমরা যে যার ঘরে ফিরে যাও। উন্নততর লোকান্তরে আমাদের আবার সাক্ষাৎ হবে।'

ভক্তেরা আর্তনাদ ক'রে কেঁদে উঠলেন, 'তুমি ইচ্ছাময়, তোমার কথার উপরে কে কথা বলবে! যদি নিতান্তই এই যাত্রাই শেষ হয়, তুমি যেখানে যেখানে একদা পদার্পণ করেছো, যারা তোমার মুখ একটিবারের জন্যও দেখেছে, যারা তোমার কণ্ঠ শুনেছে, যেখানে যেখানে তোমার বাণী ছড়িয়েছে—সে সমস্ত পুণ্যবাণ ও পুণ্যতীর্থ যেন তোমার আশীর্বাদ লাভ করে। পৃথিবীতে কেহ যেন তা থেকে বঞ্চিত না হয়।'

মিলা বললেন, 'সমগ্র বিশ্বচরাচরে আমার আশীর্বাদ আমি অহোরাত্র সর্বজীবের মঙ্গলের জন্য ছড়িয়ে দিচ্ছি। সাধনাকালে তোমরা আমার আহার্য যুগিয়েছো: সেই কৃতজ্ঞতার ঋণ আমি ভুলিনি। তোমরা যে আমাকে বিশ্বাস করো, তোমরা যে আমার আশীর্বাদ কামনা করো—এ জন্যও আমি তোমাদের কাছে কৃতজ্ঞ। যাদের ভিক্ষান্নে আমার এ দেহ পরিপুষ্ট হয়েছে তারা দীর্ঘজীবি হোক্—সম্পন্ন হোক; তাদের চিন্তা শুদ্ধ হোক, জীবন ধর্মময় হোক। শান্তি বিরাজ করুক এই ভূমিতে, যুদ্ধবিগ্রহ দূরীভূত হয়ে যাক, শস্যসম্পদে ভূষিতা হয়ে উঠুক ধরিত্রী, ধর্মের ব্যাপারে যেন লোকের আনন্দ থাকে। যারা আমাকে দেখেছে বা আমার মুখের কথা শুনেছে, যারা আমার কাহিনী শুনেছে অথবা অন্তরে ধারণা করেছে, যারা আমার নামটি মাত্র শুনেছে তারাও যেন আনন্দলোকে আমার সঙ্গে মিলিত হয়। যারা ভবিষ্যতে আমার জীবনকাহিনী পাঠ করবে এবং অনুসরণ করবে, যারা আমার জীবনী ভাষান্তরিত করবে, বর্ণনা করবে অথবা পাঠ বা শ্রবণ করবে, যারা সশ্রদ্ধ চিত্তে আমার দৃষ্টান্ত অনুধাবন করবে—আমার দীর্ঘ জীবনের তপস্যার মূল্যে তাদের গতি নির্বিঘ্ন হোক, তাদের ধ্যান বাধামুক্ত হোক। যে যেখানে তপস্যার জন্য দৈহিক ক্লেশ বরণ করেছে তারই প্রতি রইলো আমার আশীর্বাদ; আমাকে যারা স্মরণ করবে তারাই যেন মুক্তির পথ খুঁজে পায়। যে

যে স্থানে আমি ভ্রমণ করেছি বা অবস্থান করেছি, যা কিছু আমি স্পর্শ করেছি—সে সবের মধ্যেই আমার পুণ্যসত্তা বিস্তৃত হয়ে থাক।'

মিলার বাক্যে কারুর আর সংশয়ের অবকাশ মাত্র রইলো না যে মিলা শীঘ্রই মরদেহ পরিত্যাগ করবেন। নিয়ানাম ও টিংরির অধিবাসীরা সাশ্রুনেত্রে পরমপুরুষ মিলাকে শেষ দেখা দেখে, একে একে বিদায় নিয়ে চলে গেলেন। ব্রিন্ জনপদের নবাগত অধিবাসীরা মিলাকে ঘিরে বসলেন। মিলা বললেন, 'অধ্যাত্মবিষয়ক প্রশ্ন বা সমস্যা যদি তোমাদের থাকে, আমাকে অবিলম্বে জিজ্ঞাসা ক'রে জেনে নাও, কারণ আমি আর বেশি দিন থাকবো না।' কিছুক্ষণ প্রশ্নোত্তরের পরে ভক্তেরা বললেন, 'আমাদের সবচেয়ে বড় প্রশ্ন—আপনি কেন আমাদের ছেড়ে যাবেন?' মিলা সহাস্যে উত্তর দিলেন, 'এর উত্তরও সহজ। আমার জীবন সমাপ্ত হয়েছে, কর্মও শেষ হয়েছে। জন্মের ঋণ পরিশোধের জন্য এবার মৃত্যুর প্রয়োজন।' ভক্তেরা বললেন, 'মৃত্যু যে তোমার ইচ্ছাধীন তা আমরা জানি; নির্বাণপথের যাত্রী তুমি—মৃত্যুর সাধ্য কি তোমার অনিচ্ছায় তোমার কাছে আসে!'

এতদিন পর্যন্ত মিলার দেহে রোগের কোন চিহ্ন ছিল না; কিন্তু এবার শরীরে হঠাৎ ভাঙনের চিহ্ন দেখা দিল। প্রধান প্রধান ভক্তেরা লৌকিকভাবে পূজা অনুষ্ঠানাদির ব্যবস্থা করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠলেন, সঙ্গে সঙ্গে অনেকে তাঁর নিরাময়ের জন্য সমবেতভাবে প্রার্থনা করবার উদ্‌যোগ করতে লাগলেন। রোগমুক্তির জন্য চিকিৎসার প্রয়োজনের কথাও মিলার কাছে সবাই মিলে নিবেদন করলেন। মিলা সব কথা শুনে বললেন, 'রোগ আসে যোগীর বন্ধুরূপে, তার ধর্ম-কর্মে উৎসাহ দিতে। শারীরিক পীড়া সত্ত্বেও, মৃত্যুভয় শিয়রে নিয়ে সে দ্বিধাহীন অচঞ্চল চিত্তে নিজের পথে এগিয়ে চলবে—এই তার আদর্শ। আমার কথা স্বতন্ত্র, কারণ আমার গুরুর

প্রসাদে রোগমুক্তির পন্থা আমার আয়ত্বাধীন। আমার জন্য প্রার্থনা, পূজা বা কোন দৈবশক্তির কিছুমাত্র প্রয়োজন নেই। ত্রিজগতের সমগ্র দুঃখকে আমি বন্ধুরূপে বক্ষে ধারন করেছি; অতএব কোনরূপ অশুভ শক্তি বা অকল্যাণকে এড়াবার প্রয়োজন আমার নেই। দুগ্র'হ আমার একান্ত বশীভূত; তারা আমার পরম অনুগত সেবক; বিষ আমার কাছে অমৃতের মত। নানা দ্রব্যগুণ-সমন্বিত ঔষধে আমার প্রয়োজন নেই। আমার এই দৃশ্যমান স্থূল দেহ ধর্মকায়ার বাস্তব রূপান্তর; কিন্তু এই ইন্দ্রিয়-গ্রাহ্য দেহের সত্যিকারের অস্তিত্ব নেই। এখন এ দেহের নিমজ্জন হবে জ্যোতির রাজ্যে। এজন্য কোনরূপ অনুষ্ঠানের প্রয়োজন নেই। সারাজীবন কুকর্মের বোঝা যারা ভারি ক'রে তোলে, তারাই মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়ে ভবিষ্যৎ পরিণতির ভয়ে মনকে বৃথা সান্ত্বনা দেবার জন্য এই সব অনুষ্ঠানের আড়ম্বর করে। আবার সেই জন্ম, আবার সেই রোগ, জরা, কামনা বেদনার পৌনঃপুনিক আয়োজন নিজের হাতে তাদের সম্পূর্ণ করতে হয়; ব্যর্থ শান্তি-স্বস্ত্যয়নে কিছুই নিবারিত হয় না। কালচক্রের অভ্রান্ত নির্দেশে ঘড়ির কাঁটার মত কর্ম ও কর্মফল ওতপ্রোত হয়ে আছে; মানুষের কোন শক্তি, কোন প্রতাপ, কোন স্পর্ধিত অহঙ্কার, কোন বিনীত দৈন্য তার নির্দিষ্ট গতিকে বিন্দুমাত্র ব্যাহত করতে পারে না। যারা কালের এই অমোঘ করাল মূর্তি অন্তরে প্রত্যক্ষ করেছে এবং সতর্ক চেষ্টায় বহু ক্লেশে পরিণতির ঊর্ধ্বে উঠে কালজয়ী হয়েছে, আমি তাদেরই একজন।'

যারা পূজা অর্চনা বা চিকিৎসার প্রস্তাব করেছিলেন, তাঁরা সে প্রসঙ্গ ত্যাগ ক'রে, কিভাবে কালজয়ী হওয়া যায়, সেই কথাই জানতে চাইলেন। মিলা হৃষ্টচিত্তে বলতে লাগলেন, 'যে কোন জাগতিক প্রতিষ্ঠা বা প্রচেষ্টার শেষ হয় দুঃখে; সঞ্চয় ক্ষয় হয়ে যায়, যা গড়ি তা ভাঙে, মিলনের আসনে আসে বিরহ, জন্মের অন্তে ঘটে মৃত্যু।

এই কথাটি সত্য বলে জেনে নিয়ে গোড়া থেকেই সঞ্চয়, সংগঠন, মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে বর্জন ক'রে, গুরুবাক্যে নিষ্ঠা সহকারে সত্যার্জনের কর্মে লেগে থাকতে হয়। এ বিষয়ে আমার ইচ্ছা আছে পরে আরও বলবো। তোমরা আমাকে মনে করিয়ে দিও।

গুরুর আসন্ন পরিনির্বাণের আশঙ্কায় বিহ্বল হয়ে শিষ্যেরা আবার বললেন, 'কিন্তু প্রভু, আবও কিছুকাল দেহে অবস্থান করলে আপনি তো আরও বহু বহু পথহাবাকে সত্যপথে ফিরিয়ে আনতে পারতেন। আপনার কিছুতেই প্রয়োজন নেই—দেহ থাকা না থাকা আপনার কাছে এক। কিন্তু আমরা, যাবা মাটিব মানুষ, তাদের তো এই পরম অবস্থা হয় নি। সামান্য একটু তান্ত্রিক ক্রিয়াকলাপ করলে বা রোগমুক্তির জন্য ঔষধ সেবন করলে যদি আমবা শান্তি পাই, আমাদের মিনতি আপনি স্বীকার করলেন না কেন?' উত্তবে মিলা বললেন, 'আমার কাল যদি পূর্ণ না হত, তাহলে উপলক্ষ্য হিসাবে আমি তোমাদের অনুরোধ মেনে নিতাম। কিন্তু এ-কথাও তোমবা জেনে রেখো যে নিছক নিজেব স্বার্থের জন্য দীর্ঘজীবন বা নিরাময়ের কামনায় তান্ত্রিক পূজা-বিধিব অপব্যবহাব কবা হয়। দৈবশক্তিকে তার উপযুক্ত মর্যাদা না দিলে তার পবিণাম শুভ না হয়ে অশুভ হয়ে থাকে। রাজাকে যদি বলো রাজকার্য না ক'রে তিনি যেন তাঁর বাড়ির ময়লা নর্দমা সাফ করুন—সে যেমন অমর্যাদাকব অনুবোধ—এও ঠিক তেমনি। সংসারী লোকেরা স্বার্থান্ধ হয়ে এমন কর্ম নিত্যই করছে; তাদের দোষ দেওয়া বৃথা। কিন্তু এতে যে অপবাধ হয়, এ-কথা তোমরা কখনোই ভুলো না।'

শিষ্যেরা বিনীতভাবে নিবেদন করলেন, 'কিন্তু আপনার ক্ষেত্রে সে কথা তো ওঠে না, কারণ আপনার সমগ্র জীবন জীবের কল্যাণে উৎসর্গীকৃত।' মিলা বললেন, 'আমার যে এখানকার কাল পূর্ণ হয়েছে। তথাগত বুদ্ধের কথা স্মরণ ক'রে দেখো—যতদিন তাঁর কাল পূর্ণ হয়নি,

তিনিও নিজেই জীবককে দিয়ে নাড়ি পরীক্ষা করিয়েছেন, ঔষধও সেবন করেছেন ; কিন্তু যখন কাল পূর্ণ হ'ল, সেই সর্বশক্তিমানও নিঃশব্দে মহাপ্রয়াণ করলেন। আমি যখন জানি যে আমার জীবন-কাল শেষ হয়েছে তখন চিকিৎসা বা শান্তি-স্বস্ত্যয়নে আমি কি ক'রে সম্মতি দেব ?'

মিলার কথা শুনে, শিষ্যদের মনের শেষ আশাটুকুও অন্তর্হিত হয়ে গেল। তারা বুঝলো যে এই স্বেচ্ছাময় পুরুষের মন কোন রকমেই আর ফেরানো যাবে না। পৃথিবীর খেলাঘরে জীবনের খেলা যাঁর সাঙ্গ হয়ে গেছে, তিনি আর কিসের লোভে এখানে বন্দী হয়ে থাকবেন ? মিলার অবর্তমানে তাঁর আশ্রিত ভক্তদের যে কি অবস্থা হবে—সে কথা এখন বলে আর লাভ নেই, কারণ মিলার দিক দিয়ে যে জীবন-মৃত্যুর প্রকৃত ব্যবধান কিছুমাত্র নেই—এ সত্য তাঁরা প্রত্যক্ষ করেছেন। তাই, মহাপ্রয়াণের পরে মিলার পরিত্যক্ত দেহটির কিরূপ ব্যবস্থা মিলা অনুমোদন করবেন, সেই প্রশ্নটিই তাঁরা উপস্থাপিত করলেন। মিলা বললেন, 'সাধারণতঃ শবদেহ বলতে যা বোঝায়, এ ক্ষেত্রে তা হবে না। আমার দেহ নিয়ে তোমাদের দুর্ভাবনার কিছুমাত্র হেতু নেই। আমার অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ায় কোনরকম লৌকিক কৃত্যেরই প্রয়োজন নেই—কোনরূপ স্তূপ বা সা-সা গঠনেরও কথা ওঠে না। আমি কোন সঙ্ঘের মঠাধ্যক্ষ নই যে আমার প্রতিনিধি নির্বাচনের প্রশ্ন উঠবে। যেসব নির্জন পর্বতকন্দরে আমার জীবন কেটেছে, সে সব সাধারণের সম্পত্তি। আমার শিষ্যদের সম্প্রদায় জগদ্‌ব্যাপি—সমগ্র জীবজগৎ তাদের সন্তান সন্ততি। কোনরূপ লৌকিক ধর্মাচরণের পরিবর্তে তোমরা তোমাদের প্রাত্যহিক দিনচর্যায় নিষ্ঠার সঙ্গে নিযুক্ত থেকো। আমাকে যখন বিশেষ কোন উপলক্ষ্যে স্মরণ করবে, তখন সেই স্মরণে সমস্ত মনপ্রাণ সমর্পণ কোরো। সাধনার ব্যাপারে যদি দেখো কোন একটি পন্থা অনুসরণের ফলে মন্দভাব জাগ্রত হচ্ছে, কিংবা

স্বার্থপরতা উদ্বুদ্ধ হচ্ছে—সে পথ, যতো ভালোই হোক, তৎক্ষণাৎ বর্জন কোরো ; আর যে পথে চললে মন পঞ্চবিধ রিপুর প্রভাব থেকে মুক্ত হয়, সে পথ লোকের মতে বিসদৃশ হলেও—সেই পথই গ্রহণ কোরো। মনে রেখো জীবন ক্ষণস্থায়ী বুদ্বুদের মত ; ধ্যানের মধ্যে যতো ডুবে থাকবে ততই মঙ্গল।'

শিষ্যরা বললেন, 'আমরা আপনার ধর্মোপদেশ শুনতে চাই।' মিলা হেসে বললেন, 'জানা কথা অনেক শুনে কি হবে ? যেটুকু শুনবে তা পালন করা চাই। এমনভাবে চলো যাতে কৃতকর্মের জন্য অনুশোচনা করতে না হয়। যা কিছু মনের মধ্যে গ্লানি বা বিকারের সৃষ্টি করে, সে সব বর্জন ক'রে যদি চলো, তাহলে আর শাস্ত্রনির্দেশ লঙ্ঘন করা হবে না। নানা তন্ত্র অধ্যয়নে কি হবে, যদি ধর্মবস্তু নিজের স্বভাবে পরিণত না হয় ? পৃথিবীকে যদি বর্জন করতে না পারো, জাগতিক স্পৃহার ঊর্ধ্বে যদি উঠতে না পারো, তাহলে ধ্যান হবে কেমন ক'রে ? উৎসবের আড়ম্বরে কোন্ দৈন্য চাপা পড়বে—যদি কায়-মনো-বাক্যে ধর্মের পথকে গ্রহণ করতে না পারো ? ক্রোধকে যদি অনুরাগের শাসনে আনতে না পারো, কেবল ধৈর্যের শিক্ষার মননে কি হবে ? চাওয়া পাওয়ার সমস্ত পক্ষপাতিত্ব কাটিয়ে উঠতে না পারলে কেবল পূজায় কি লাভ ? স্বার্থপরতাকে যদি হৃদয় থেকে উন্মূলিত করতে না পারো—কেবল মুষ্টিভিক্ষা প্রদানে কি উপকার হবে ? প্রার্থনা যদি অন্তরের অন্তস্থল থেকে উৎসারিত না হয়, বিশ্বাসভক্তি যদি জীবনে জাগ্রত না হয়, অনুতাপ অনুশোচনা যদি অন্তরে অঙ্কুরিত না হয়—কেবল মৌখিক আলোচনায় কতটুকু ফল ? যাতে কোন উপকার নেই, তাতেই আছে অপকার—এই কথাটি মনে রেখো। গুরুর প্রত্যেক কথাটি যদি অভ্রান্ত বলে প্রতীতি না হয়, মিথ্যা আড়ম্বরে কি লাভ ? যে যোগী নিজের উদ্দেশ্য সফল করেছে, তার আর অন্য কোন কর্তব্যের বন্ধন নেই।'

মিলার অন্তিমকালের এই সমস্ত উপদেশ দানের মাঝখানেই তাঁর শারীরিক ক্ষেত্রে বিষক্রিয়ার লক্ষণ প্রকাশ পেতে লাগলো। সমবেত ভক্ত ও শিষ্যমণ্ডলী দিনে দিনে উৎকণ্ঠিত হয়ে উঠতে লাগলেন। এ যাবৎ যাঁর দেহের কোনরূপ বিকার কেউ প্রত্যক্ষ করেনি, আজ তাঁরই রোগশূন্য দেহে নানাবিধ ব্যাধির চিহ্ন আত্মপ্রকাশ করতে দেখে সকলেই বিস্মিত হলেন। কেবল এইটুকুই তাঁরা বুঝলেন যে মিলা নরলীলা সম্বরণ করবেন এবং এই সমস্ত লক্ষণ তারই পূর্বাভাষ। সর্বসাধারণের এই উৎকণ্ঠার মাঝখানে, কি মনে ক'রে একদিন লামা সাফুয়া কিছু মাংস ও ছাংয়ের অর্ঘ্য নিয়ে মিলার কাছে এসে উপস্থিত হলেন। তিনি যে কেন এলেন তার সঠিক উদ্দেশ্য তাঁর নিজের কাছেও ছিল অস্পষ্ট। মিলার প্রতি কোনরূপ ভক্তিশ্রদ্ধার ভাব যে তাঁর মনে ছিল না, একথা নিশ্চিত ক'রেই বলা যায়। কিন্তু তথাপি, কৌতূহলের চেয়ে জোরালো কি একটা দুর্বার আকর্ষণে তিনি, হয়তো বা নিজের অজ্ঞাতসারেই, প্রভাবিত হয়েছিলেন। মিলার কাছে তাঁর যে কিছু প্রাপ্য আছে এ-কথা তাঁর একবারও মনে হয় নি। কিন্তু অধ্যাত্মজগতের দেনাপাওনার রহস্য জানবার অধিকার যার হয় নি—সেও যে কড়ায় গণ্ডায় তার প্রাপ্য থেকে বঞ্চিত হয় না, সে সত্য তিনি না জানলেও, যিনি জানবার তিনি জানতেন।

স্বভাবসিদ্ধ আড়ম্বরের সঙ্গে লামা সাফুয়া পীড়িত মিলার আসনের পাশটিতে এসে বসলেন। গম্ভীর মুখে দুশ্চিন্তার আবরণ টেনে সবাইকে শুনিয়ে শুনিয়ে বলতে লাগলেন, 'তাই তো। সাধুর পবিত্র দেহে এমন উৎকট ব্যাধি সঞ্চারিত হবার কথা তো নয়। এ অতি অন্যায়, অপ্রত্যাশিত ব্যাপার। কিন্তু এতবড় দুর্ভোগ যখন ঘটেছে তখন তো আর চারা নেই। এর একটা বিহিত করা দরকার। সম্ভব হলে রোগযন্ত্রণা শিষ্যভক্তেরা সবাই মিলে ভাগ ক'রে নেওয়া যেতে পারে। দরকার হলে, আমি নিজের দেহেই এই ব্যাধি গ্রহণ করতে প্রস্তুত

আছি। আমার এ দেহ লামার দেহ—অতএব তপস্যাপূত; মিলা যদি তাঁর দেহ থেকে তাঁর পীড়া দেহান্তরে সঞ্চারিত করতে পারেন—আমি সেজন্য প্রস্তুত।'

অপাঙ্গে মিলার ভাবলেশহীন, নির্বিকার মুখের পানে দৃষ্টিপাত ক'রে লামা সাফুয়া তাঁর মনের ভাব অনুমান করবার চেষ্টা করলেন। কিন্তু বৃথা চেষ্টা; মিলার মুখে কিছুমাত্র ভাবান্তর দেখা গেল না। কে জানে এর মনের মধ্যে কি আছে? এ বড় গভীর জলের মাছ। লামা সাফুয়া ভিতরে ভিতরে চঞ্চল হয়ে উঠলেন। নিজের মনকে সান্ত্বনা দিয়ে বলতে লাগলেন, ভয় ভাবনার কিছু নেই, মিলা সাধারণ মানুষ্ ছাড়া অন্য কিছুই নয়, গোপন রহস্য ভেদ করার সামর্থ্য তার নেই। কিন্তু পাপীর মনের স্বাভাবিক আতঙ্ক তাঁকে স্থির থাকতে দিল না। মরীয়া হয়ে তিনি আবার বললেন, 'মিলার অসুখের খবর পেয়ে আমি এলাম। সিদ্ধযোগীর দেহে এমন উৎকট রোগের প্রকাশ অস্বাভাবিক সন্দেহ নেই। কিন্তু তাই বলে মানবীয় কর্তব্য অবহেলা করলে তো চলবে না। শুনেছিলাম, মিলার নাকি বহু অলৌকিক শক্তি আছে। আমি অবশ্য স্বচক্ষে কিছুই দেখিনি—সাক্ষাৎ ভাবে কিছুই জানি না। দেহান্তরে রোগ সঞ্চালনের শক্তি যদি মিলার থাকে, তাহলে তিনি সচ্ছন্দে আমার দেহে এই ব্যাধি প্রেরণ করুন: আমি মানবতার কল্যাণে স্বেচ্ছায় সে রোগযন্ত্রণা গ্রহণ করবো।'

সমবেত সকলেই বললেন, 'সাধু, সাধু!' স্মিতহাস্যে মিলা বললেন, 'এ রোগ সত্যিই আমার হবার কথা নয়। কিন্তু তুমি নিশ্চয় ভালো ক'রেই জানো যে এ ছাড়া আমার গত্যন্তর ছিল না। যোগীর ব্যাধি ও সাধারণ লোকের ব্যাধির মধ্যে পার্থক্য থাকাই স্বাভাবিক। আমি তো মনে করি যে এ ব্যাধি আমার সম্পদ। জীবন-মৃত্যুর সমগ্র রহস্য আমার কাছে সুস্পষ্ট: একটির স্বাভাবিক পরিণতি হয় আর একটিতে; এ নিয়ে কোনরূপ দুশ্চিন্তা আমার অন্তরকে পীড়িত করে

না। জীবন-মৃত্যুর উর্ধ্বে দাঁড়িয়ে আমি এখন তাদের খেলা দেখি। আমার দেহের শিরায় শিরায় রন্ধ্রে রন্ধ্রে রোগের বীজাণুগুলি বিস্তার লাভ করছে। পাপ, অজ্ঞানের আভরণ পরে জ্যোতির্ময় সত্ত্বা নিজের লীলায় বিভোর হয়ে আছে। যে আমাকে যা দিয়েছে তাই যেন হয়ে উঠেছে আমার অলঙ্কার। সেই অলঙ্কারভূষিত হয়ে আমি প্রার্থনা করি যেন কুচিন্তার পাপ বিশ্ব হতে বিদূরিত হয়ে যায়। আমার এই ব্যাধি আমি স্বেচ্ছায় বরণ ক'রে নিয়েছি। ইচ্ছামাত্র আমি এর হাত থেকে মুক্তি পেতে পারি; কিন্তু এ অলঙ্কারকে পরিত্যাগ করবার কোন হেতু খুঁজে পাই না।'

মিলার বাক্য শুনে, লামা সাফুয়া কেবল এইটুকুই বুঝলেন যে মিলার মনে তাঁর সম্বন্ধে একটা কালো সংশয়ের ছায়াপাত হয়েছে মাত্র; কিন্তু তিনি ধ্রুব ভাবে কোনরূপ সিদ্ধান্ত করতে না পেরে, বড় বড় কথা বলে, নিজের দ্বিধাকে ঢাকবার চেষ্টা করছেন। ইচ্ছামাত্র ব্যাধিকে দেহ থেকে বিতাড়িত করবার সাধ্য থাকলে কেউ কখনো রোগযন্ত্রণা সাধ ক'রে ভোগ করে নাকি? তিলে তিলে যে মরছে, সেও দেখো, আত্মম্ভরিতার মোহ কাটিয়ে উঠতে পারছে না। তিনি বেশ নিশ্চিত ভাবে এবার বুঝে নিলেন যে—মিলার কোনরূপ অলৌকিক শক্তিই নেই, অথচ এই সত্যটি স্বীকার করতে তিনি অনিচ্ছুক।

লামা সাফুয়া মিলার শক্তিহীনতার সম্বন্ধে নিশ্চিন্ত হয়ে এবার নড়ে চড়ে স্থির হয়ে বসলেন। বললেন, 'মিলা, তোমার এই ব্যাধির আসল কারণটি জানলে ভালো হ'ত। যদি এ ব্যাধি আধিভৌতিক হয়, শাস্ত্রে তারও বিবিধ প্রতিকার আছে। যদি এ রোগ নিছক শারীরিক অসাম্যের ফলে ঘটে থাকে, তাহলে যেসব বহুবিশ্রুত প্রক্রিয়ায় সাম্য ফিরিয়ে আনা যায়, তাদেরই সাহায্য নেওয়া উচিত। আসল ব্যাপার কি একমাত্র তুমিই বলতে পারো। আমি আগে বলেছি, এখন আবার বলছি—যদি তুমি সক্ষম হও, আমার দেহে তোমার রোগ সঞ্চারিত ক'রো,—আমি প্রস্তুত।'

একটুখানি হেসে মিলা বললেন, 'অহঙ্কারের অপদেবতা জনৈক মানুষের উপরে ভর করেছিল। আমার ব্যাধির মূলে আছে সেই অপদেবতার কুদৃষ্টি। তারই ফলে সৃষ্টি হয়েছে এই দৈহিক বিপর্যয়। দানব আমার দেহকে এমন ক'রে আশ্রয় করেছে যে তাকে স্থানচ্যুত করা সম্ভব নয়। কেমন ক'রে আমার ব্যাধি সারবে? যদি আমার দেহাশ্রিত দানবকে তোমার দেহে মুহূর্তের জন্যও প্রেরণ করি, তুমি তার যন্ত্রণা সহ্য করতে পারবে না। অতএব এ প্রসঙ্গ থাক—আমি আমার রোগযন্ত্রণা অন্য দেহে সঞ্চারিত করবো না।'

মিলার এ বাক্যে অস্পষ্টতার ছায়া মাত্র ছিল না; আর কেউ কিছু না বুঝলেও লামা সাফুয়ার মনে এই অহঙ্কারের অপদেবতাটির পরিচয় সুস্পষ্ট হয়ে ওঠাব কোনরূপ বাধাই আর থাকবার কথা নয়। কিন্তু দুর্মতির পথেই যার জীবনে চরমতম সৌভাগ্যেব অভ্যুদয় হবে, সে এইখানেই থামবে কেন? লামা সাফুয়া বুঝেও বুঝতে চাইলেন না, বললেন, 'হোক আমার অসহ্য; তোমার সাধ্য থাকলে তুমি তোমার রোগযন্ত্রণা আমার দেহে সঞ্চারিত ক'রে দাও।' মনে মনে বললেন, 'নিজের অক্ষমতাকে স্বীকার করতে চাও না—এও তোমার সেই অহঙ্কারের অপদেবতা। তোমার এই অক্ষম গর্বকে আমি লোকসমক্ষে প্রকাশ ক'রে দেব; তোমার উন্নত অভ্রভেদী শির আমি ধূলায় অবলুণ্ঠিত করবো, তবে আমার নাম লামা সাফুয়া। তুমি মরেও আমার কাছে নিষ্কৃতি পাবে না।'

মিলা তাঁর মনের ভাব বুঝে বললেন, 'বেশ কথা। কিন্তু তার আগে আমি আমার রোগযন্ত্রণা ওই নিষ্প্রাণ দ্বারটির উপরে সঞ্চারিত ক'রে দিই—তুমি তার ফলাফল নিজের চোখে দেখো। তার পরেও যদি তোমার এই অভিপ্রায় থাকে, তুমি আমার রোগযন্ত্রণা নিজের দেহে গ্রহণ কোরো।'

নির্জীব কাঠের দরজাটিতে মিলার রোগযন্ত্রণা সঞ্চারিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গে বিশাল কপাটদ্বয় থরথর ক'রে কাঁপতে লাগলো, তার মধ্যে প্রচণ্ড বিক্ষোভের চিহ্ন দৃশ্যমান হয়ে উঠলো। মনে হ'ল যেন যে কোন মুহূর্তে বিরাটকায় কাষ্ঠখণ্ডগুলি চূর্ণ-বিচূর্ণ হয়ে কব্জা থেকে খসে পড়ে যাবে। সঙ্গে সঙ্গে মিলার দেহের রোগচিহ্ন নিশ্চিহ্ন হয়ে মিলিয়ে গেল।

দর্শকের মধ্যে এমন অনেকেই ছিলেন যাঁরা মিলার অলৌকিক ক্ষমতার কথা প্রত্যক্ষভাবে অবগত ছিলেন। তাঁরা নিঃশব্দে লামা সাক্যুয়ার মুখের পানে চেয়ে মিটিমিটি হাসতে লাগলেন। কাষ্ঠনির্মিত দ্বারের দুরবস্থা স্বচক্ষে নিরীক্ষণ ক'রেও লামা সাক্যুয়া নিজের মনকে এই বলে বোঝালেন যে উপস্থাপিত দৃশ্যটি নিছক ঐন্দ্রজালিক—এর সঙ্গে মিলার শারীরিক ব্যাধির কিছুমাত্র সম্বন্ধ নেই। প্রখ্যাত যাদুকরের ভোজবাজী দেখে সাক্যুয়া বিহ্বল হবেন কেন? এখন যদি তিনি পিছিয়ে যান, তাতে স্বভাবতঃই মিলার বিজয় সূচিত হবে। তাই, পরম বিজ্ঞের মত ভঙ্গি ক'রে তিনি বললেন, 'মরা কাঠের উপরে তোমার রোগের বিক্রম একটা দর্শনীয় বস্তু সন্দেহ নেই। এবার যদি আমার দেহে তোমার রোগের প্রতিক্রিয়া সঞ্চারিত করতে পারো—তবে তো বুঝি!'

এই উদ্ধত উক্তি উপেক্ষা ক'রে শান্ত কণ্ঠে মিলা বললেন, 'বেশ, তবে তাই হোক। তোমার মহানুভবতায় তুমি যখন আমার রোগ-যন্ত্রণার অংশীদার হতেই চাইছো, তোমাকে আমার পীড়ার একটুখানি ভগ্নাংশ উপহার দিলাম। কিন্তু সহ্যশক্তির অতীত বলে বোধ হলে সে কথা ব্যক্ত করতে দ্বিধা কোরো না—আমিও তাহলে সঙ্গে সঙ্গে নিজের পীড়া ফিরিয়ে নেবো।'

লামা সাক্যুয়া প্রবল আত্মপ্রত্যয়ের সঙ্গে জোর দিয়ে বললেন, 'না, তার হয়তো প্রয়োজন হবে না—কারণ এ আমার সাধনার দেহ।' কিন্তু কথাটি শেষ করার আগেই রোগশক্তির প্রভাবে মুহ্যমান হয়ে

পড়লেন : তাঁর মনে হ'ল যেন প্রবল অগ্নিশিখার মত একটা প্রচণ্ড দাহিকাশক্তি তাঁর প্রত্যেকটি অঙ্গে অসহ্য বিক্ষোভের সৃষ্টি করেছে। তাঁর সারা দেহ কাষ্ঠখণ্ডের মত কাঁপতে লাগলো, দেহের প্রতি রোমকূপে যেন এক আগুনের জ্বালা ফুটে উঠলো। তাঁর মনে হ'ল, এই যদি মৃত্যুযন্ত্রণা হয়—এর চেয়ে সহস্রবার মৃত্যুও ভাল। বেদনায় বিহ্বল হয়ে তিনি তাঁর অভ্রভেদী অহঙ্কারের উচ্চাসন থেকে মিলার পায়ের তলায় নেমে এলেন। সমস্ত হিংসা-দ্বেষ-প্রতিকূলতা বিস্মৃত হয়ে, মিলার দুটি পাদপদ্ম নিজের মাথায় তুলে নিয়ে অশ্রুসিক্ত নয়নে কাতর কণ্ঠে বলতে লাগলেন, 'হে প্রভু, হে তথাগত,—এ যন্ত্রণা আমারই প্রাপ্য। অহঙ্কারে, গর্বে, হিংসায় আমি অন্ধ হয়ে ছিলাম বলেই এতদিন তোমাকে চিনতে পারিনি। স্বার্থান্ধ হয়ে তোমার দেহে আমি মহাপাপী এই বিষক্রিয়া সঞ্চারিত করেছি। আমার যা কিছু আছে—সমস্ত সম্পত্তি তুমি অনুগ্রহ ক'রে গ্রহণ করো। আমার প্রাপ্য শাস্তি আমাকে দাও। কিন্তু নিজের শ্রীমুখে একবার বলো যে আমার সমস্ত পাপ তুমি মার্জনা করেছো। আমার ইহ-পরকালের দুর্গতি থেকে তুমি আমাকে রক্ষা করো। তোমার দয়ার অন্ত নেই, ক্ষমার সীমা নেই। আমার মত পাতকীকে তুমি ছাড়া আর কে ত্রাণ করবে?'

লামা সাক্যুয়ার অনুতাপের আন্তরিকতায়, সদয় কোমল কণ্ঠে মিলা বললেন, 'কিছুই আমি চাই না। তোমার সম্পদ তোমারই থাক। আমি আমার জীবিতকালে কোনদিনই কোনরূপ জাগতিক সামগ্রী কামনা করিনি। আজ মৃত্যুশয্যায় তোমার ঐশ্বর্য নিয়ে আমি কি করবো? এখন থেকে ধর্মপথে অটল হয়ে থেকো—তাহলেই হবে। আমি তোমার এই পাপকর্মের জন্য সর্বান্তকরণে প্রার্থনা করবো। তোমার পাপের বোঝা আমি নিজে নিলাম। আমার অন্তরে তোমার জন্য বেদনা বোধ জেগেছে বলেই আমি বিশ্বাস করি যে এই কর্মের

ভোগ তোমাকে আর সইতে হবে না। এ জন্মে তুমি কুসঙ্গ পরিহার ক'রে চোলো, তাহলেই পরবর্তী জীবনে তুমি ধর্ম সম্বন্ধ লাভ করবে এবং ধর্মপথের যাবতীয় বিঘ্ন বিদূরিত হবে। তোমার মত কাতর হয়ে যারা অনুতাপ করবে, তারা যেন সকলেই বোধিসত্বের আশীর্বাদে সত্যপথের আশ্রয় লাভ করে।'

মিলা তাঁর রোগযন্ত্রণা নিজের দেহে ফিরিয়ে নিলেন। লামা সাফুয়া সুস্থ হলেন। কিন্তু এই কয়েক মুহূর্তেই যেন তাঁর জন্মান্তর লাভ হয়ে গেল। তাঁর মনে হ'ল যেন তাঁর বুকের উপর থেকে গর্ব ও লোভের জগদ্দল পাথরটি নেমে গেছে। তাঁর মনে হ'ল সারাজীবনের বহু দুষ্কৃতির মূল্যে তিনি যা কিছু জমিয়েছেন সে সবই অর্থহীন। ধন-সম্পদ নিয়ে কি হবে: তারা তাঁর অন্তরের অপরিমেয় শূন্যতা পূরণ করতে পারবে না। যা কিছু তাঁর আছে—সে বোঝা মাথার উপর থেকে না নামালে তাঁর মুক্তি নেই কারণ সে সমস্তই তাঁর নীচতা, ক্ষুদ্রতা, কার্পণ্যের পণ্য। তিনি বললেন, 'তোমার নিজের কোন প্রয়োজন না থাকে, তবু আমার মিনতি, তুমি আমার সর্বস্ব গ্রহণ ক'রে আমাব মুক্তির পথ নিজের হাতে খুলে দিয়ে যাও। আমার পাপের ধন ধর্মপথের পথিকদের প্রয়োজনে যাতে লাগে, সে ব্যবস্থা তুমিই ক'রে দিয়ে যাও; এত দয়া যখন করেছো—তখন আমার একটি মাত্র প্রার্থনাও তুমি শোনো।'

মিলা কিছুতেই জাগতিক ধনসম্পদের ভার নিতে রাজী না হওয়ায়, শেষ পর্যন্ত মিলার ভক্তমণ্ডলী লামা সাফুয়ার বিশাল ধনসম্পদ সংকার্যে ব্যয় করবার দায়িত্ব গ্রহণ করলেন। লামা সাফুয়া মোহগ্রস্ত মিথ্যা জীবন পরিহার ক'রে সত্যিকারের লামা হয়ে গেলেন।

লামা সাফুয়ার পুনর্জন্ম বিধান ক'রে মিলা সমবেত ভক্তমণ্ডলীর উদ্দেশ ক'রে বললেন, 'এবার আমি চুবারের পর্বতগহ্বরে ফিরে গিয়ে দেহরক্ষা করতে চাই। যোগীর মহাপ্রয়াণের পক্ষে এই গ্রাম্য পরিবেশ

অনুকূল নয়। হিমালয়ের লোকালয় শূন্য সেই দুর্গম প্রদেশ আমাকে আকর্ষণ করছে, কারণ সেইখানেই আছে অখণ্ড শান্তি। মৃত্যুর পক্ষে সেই স্থানই প্রশস্ত।'

ভক্তেরা এই প্রস্তাব শুনে শিউরে উঠলেন, কারণ ব্যাধিগ্রস্ত ভগ্ন দেহ টেনে নিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার দুরধিগম্য অত্যুচ্চ প্রদেশে মিলার পক্ষে যাত্রা করা আত্মহত্যারই সমতুল্য হবে। দীর্ঘ বন্ধুর পার্বত্যভূমির প্রতি পদবিক্ষেপে বিপদের আশঙ্কা তো আছেই: সুস্থ দেহেও সে পথের যাত্রা লোকে শেষ যাত্রা বলে মনে করে। এই মৃত্যুপথযাত্রী ওই দুরূহ দুস্তর পথে কেমন ক'রে চলবেন। শরীর সুস্থ থাকলে মিলাকে তাঁর অনুরাগীবৃন্দ সানন্দে বহন ক'রে নিয়ে যেতেন; কিন্তু দেহে এত বড় যন্ত্রণা নিয়ে, দেহের উপরে এত বড় অত্যাচার তিনি কি সইতে পারবেন! সবাইকার মনের ভাব বুঝে মিলা হেসে বললেন, 'কারুর মাথায় চড়ে চলা আমার স্বভাববিরুদ্ধ; যোগীর পক্ষে পরনির্ভরশীল হতে নেই। তোমরা কোন দুশ্চিন্তা কোরো না, পদব্রজেই আমি যাবো। পীড়া আমার দেহের; তার সঙ্গে আমার সম্বন্ধ কি? আমি কি দেহ? দেহের পীড়া দেহ ভোগ করুক: দেবতাত্মা হিমালয়ের উন্নত শিখর থেকে আমার ডাক এসেছে, বিলম্ব করবার আর উপায় নেই। তোমরা যারা সেখানে যেতে চাও নিশ্চিন্ত মনে বেরিয়ে পড়ো: ল্যাপচি চুবারের পবিত্র ভূমিতে তোমাদের সঙ্গে আমার মিলন হবে। দুশ্চিন্তা মনে স্থান দিও না: দেহে বাস ক'রেও আমি দেহাতীত। এই স্থানে এই দেহে যে রোগের লীলা প্রকাশ হওয়ার কথা—তা হয়ে গেল। চুবারের উচ্চভূমিতে যে মৃত্যুর প্রকাশ-লীলা হওয়ার কথা—সেও সেইখানেই ঘটবে। রোগও আমার নয়, মৃত্যুও আমার নয়। আমি সাক্ষীভূত সনাতন: দেহ উপলক্ষ্য ছাড়া আর কিছুই নয়। কয়েকজন মাত্র আমার সঙ্গে চলো: বাকি সবাই দলে দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন পথ ধরে চুবারের দিকে এগিয়ে চলো।'

রোগশয্যা ছেড়ে মিলা তখনই উঠে পড়লেন—সবাইকার মনে হ'ল যেন এ আর এক মানুষ : রোগ যাঁকে স্পর্শ করতে পারে না, জরা যাঁর ধারে-কাছে কোথাও নেই। দীর্ঘ পদবিক্ষেপে মিলা সঙ্গের লোকদের পিছনে ফেলে এগিয়ে গেলেন এবং এই সময়েই ঘটলো এক অত্যাশ্চর্য ব্যাপার : প্রত্যেকটি মণ্ডলী পৃথকভাবে মিলার সঙ্গ লাভ করলো। আগেকার দল দেখলো মিলা পিছনের দল থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে তাদের সহযাত্রী হয়েছেন ; পিছনের দল দেখলো মিলা হাসিমুখে তাদেরই সঙ্গে হাস্য পরিহাস করতে করতে হেঁটে চলেছেন। কোথাও মিলা জরাজীর্ণ দেহে ভক্তদের কাছে সেবা গ্রহণ করছেন, কোথাও বা সঙ্গীদের হিতোপদেশ শোনাচ্ছেন, কোথাও বা দীর্ঘ পদ-বিক্ষেপে সবার অগ্রে পথ দেখিয়ে চলেছেন। যেসব ভক্তেরা চুবারের পথে যাত্রা করেন নি, তাঁরা দেখছেন মিলা তাঁদেরই সান্নিধ্যে বসে বৈরাগ্যের বাণী শোনাচ্ছেন। যেসব গৃহী ভক্তেরা সংসারের কর্তব্য ছেড়ে মহাপ্রয়াণতীর্থে যাত্রা করবার অনুমতি পান নি—তাঁরা দেখছেন মিলা তাঁদের ঘরে এসে ভক্তির অর্ঘ্য গ্রহণ করছেন। দলে দলে প্রত্যেকেই ভাবছেন মিলা তাঁর কাছে ছাড়া অন্য কোথাও নেই। এক মিলা যেন বহুরূপে—সহস্র মিলায় রূপান্তরিত হয়ে এই একটি লীলা বিস্তারিত করতে করতে সকলের যাত্রাপথকে রমণীয় ক'রে তুলতে লাগলেন।

ক্রমে ক্রমে একে একে যখন বিভিন্ন পরিব্রাজকমণ্ডলী চুবারে এসে মিলিত হলেন, কেবল তখনই আসল রহস্যটি ফাঁস হয়ে গেল। প্রত্যেকটি দলই দাবী করতে লাগলেন যে মিলা তাঁদের সঙ্গেই সর্বক্ষণ ছিলেন ; যাঁরা বহু পূর্বে এসেছেন তাঁরাও যে কথা বলেন, যাঁরা বহু পরে এসেছেন তাঁদেরও সেই কথা। কোন দলই অন্য কোন দলের কথা মানতে চান না, কারণ নিজের চক্ষু-কর্ণকে বিশ্বাস না ক'রে উপায় কি ? একদল বলেন, 'সে কি কথা ? মিলা বরাবর

আমাদের সঙ্গেই ছিলেন—পথে কতক্ষণ পর্যন্ত প্রত্যেকের কাঁধে ভর দিয়ে হেঁটেছেন—একসঙ্গে আমরা বিশ্রাম করেছি—আমাদের প্রস্তুত-করা আহার্য গ্রহণ করেছেন—আমাদের আসনে উপবেশন করেছেন : অথচ তোমরা অনেক পরে ভিন্ন পথ দিয়ে এসেও সে দাবী করো কেমন ক'রে ? যাঁর সঙ্গে তোমরা এলে কই সে মিলা ?' নিকটে উপবিষ্ট মিলাকে যখন তাঁরা দেখিয়ে দিলেন, তখন সবাই দেখলেন সেই অদ্বিতীয় পরম পুরুষ বসে বসে হাসছেন।

'উনি তো আমাদের সঙ্গেই এসেছেন—সত্য কি না জিজ্ঞাসা করো।'

মিলা বললেন, 'নিশ্চয়, তোমাদের সঙ্গেই তো এলাম।'

'তবে আমাদের সঙ্গে কে এলেন ?'

সস্মিত মুখে মিলা বললেন, 'কেন আমিই তো !'

'আর আমাদের সঙ্গে ?'—জিজ্ঞাসা করলেন আরও একটি দল।

মিলা বললেন, সেও আমিই !'

একজন জিজ্ঞাসা করলেন, 'আপনি আমাদের সঙ্গে আহার করেন নি ?'

মিলা বললেন, 'নিশ্চয়ই, তাতে সন্দেহ কি ?'

'কখন আহার করলেন? আপনি তো বললেন আপনার ক্ষুধা নেই।'

কলহাস্যে মিলা বললেন, 'একবার আহার করলে আর ক্ষুধা থাকবে কি করে ?'

'কার কথা সত্য, কার কথাই বা মিথ্যা ?'

মিলা বললেন, 'কারুর কথা মিথ্যা নয়। আমি যে সবাইকার সঙ্গে, সবাইকার মধ্যে ছিলাম। আমার যাত্রার কাল সমাগত। কতদিন পরে আবার হয়তো সবাই একত্র মিলিত হবো—এমনি ক'রে একত্র পথ চলবো। তাই কোন দলকেই আমার সঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করবার ইচ্ছা হ'ল না। তাই তোমাদের সঙ্গে একটু খেলা ক'রে

নিলাম। তা ছাড়া—আমি তো একই। নিজেকে নির্দেশ করতে হলে সবাই তো 'আমি'ই বলে। 'আমি'র অধিকার নিয়ে কে আর কবে বিবাদ বিসংবাদ করে? সর্বভূতে যে 'আমি'—সেই আমি সকলের। কারুর প্রতি তার বিশেষ অনুরাগ বা বিশিষ্ট বিরাগ নেই। আমার নিজের ব্যক্তিগত যে 'আমি' ছিল সে তো আর এখন নেই; তাই সেই 'আমিকে' নিজস্ব ক'রে পৃথকভাবে দেখবার কারণও আর নেই। তাই আমার 'আমি' কোন স্থানে বা কোন কালে আর আবদ্ধ থাকতে চায় না; বিশাল বিশ্বে যে যেখানে আছে তাদের সকলের মধ্যে—যেখানে যত প্রাণ, যেখানে যত অনু পরমাণু সমস্ত কিছুর মধ্যে ছড়িয়ে পড়তে চায়। আমার 'আমি' থাকলে—সেটিকে জড়িয়ে ধরে রাখতে পারতাম: কিন্তু যা আমার নয়, তাকে আমি আগলে রাখি কেমন ক'রে? সামান্য একটু ইচ্ছার বা খেয়ালের উদয় হলেই, আমার 'আমি' আমার এই দেহটাকে নিয়ে এমনি ক'রেই শেষ খেলাটি খেলে নিতে চায়।

ল্যাপচি চুবারে পৌঁছেই মিলা রোগের অভিনয়টি সম্পূর্ণ করবার খেলায় মেতে গেলেন। তাঁর দেহ দিনে দিনে ক্ষীণ হ'তে লাগলো, আহারও ক্রমে বন্ধ হতে লাগলো—কিন্তু প্রফুল্লতা কিছুমাত্র কমলো না। হাসিমুখে যার দিকে চান, তারই মনে যেন আনন্দের তরঙ্গ ওঠে। সমগ্র পার্বত্য প্রকৃতি যেন তাঁর খুশির হিল্লোলে অপরূপ হয়ে উঠলো। সকাল থেকে সন্ধ্যা পর্যন্ত আকাশে ছড়িয়ে থাকে রামধনুর বহু-বিচিত্র বর্ণালী, তুষার মৌলী হিমালয়ের শিখরে শিখরে অপ্রাকৃত জ্যোতির দীপ্তি জ্বলে উঠে। অদৃশ্যের পটভূমিকায় শঙ্খঘণ্টার ধ্বনি ওঠে; বায়ুর প্রবাহে কাঁপতে থাকে মৃদঙ্গের ঝঙ্কার; সকলের প্রাণ মেতে ওঠে নাম-না-জানা এক আশ্চর্য সৌরভে। কি একটা অব্যক্ত অনির্বচনীয় প্রভাবে দিঙ্মণ্ডল যেন রাত্রিদিন আলোড়িত হতে থাকে। যারা অনুভব করে তারা সবাই বোঝে এসব কিসের ইঙ্গিত।

শিষ্যদের মধ্যে যাঁরা শীর্ষস্থানীয় তাঁরা নিবেদন করলেন, 'প্রভু আমরা আপনার অন্তিম আদেশ ও নির্দেশের প্রয়াসী। এই মরদেহ পরিত্যাগ ক'রে আপনি কোন্ লোকে অবস্থান করবেন সে কথা জানবার জন্যে আমাদের কৌতূহল হয়েছে। প্রার্থনার কালে আপনাকে আমরা কোন্ লোকে স্মরণ করবো? আপনার শেষ আদেশ বা অনুজ্ঞা যদি কিছু থাকে তাও আমরা জানতে চাই।'

মিলা বললেন, 'নিজ নিজ ভক্তিবিশ্বাস নিয়ে আমাকে তোমরা স্মরণ কোরো। আন্তরিকতার সুরটি বাজলেই হ'ল: কোথায় কি ভাবে প্রার্থনা করবে, সেটা তোমরা নিজেরাই স্থির করে নিও। তাহলেই তোমরা আমাকে তোমাদের চোখের সামনে দেখতে পাবে। কেবল দেখো যেন বিশ্বাসভক্তির মূলটি দৃঢ় হয়। এ দেহ ছেড়ে আমি এখন আনন্দলোকে প্রয়াণ করবো—কিন্তু যেখানেই থাকি তোমাদের আন্তরিক প্রার্থনা আমার কাছে পৌঁছাবে। এইবার আমার শেষ নির্দেশ শোনো। তোমরা সবাই উপস্থিত আছো—কিন্তু রেচুং এখনও হাজির হতে পারেন নি। আমি জানি তিনি সত্বর এসে এখানে পৌঁছাবেন, কিন্তু ততক্ষণ আমার দেহধারন করা চলবে না। কিন্তু রেচুং না আসা পর্যন্ত আমার মৃতদেহ অপর কেহ যেন স্পর্শ না করে। এই আমার প্রথম নির্দেশ। এইবার আমার জাগতিক ধনসম্পদের একটা ব্যবস্থা ক'রে যেতে চাই। আমার এই বাঁশের যষ্ঠিখণ্ড আর এই তুলার জামাটি রইলো রেচুংয়ের জন্য: এ দু'টি বস্তু সঙ্গে থাকলে তার আধ্যাত্মিক কল্যাণ হবে। এই টুপিটি আর অগুরু কাঠের ছোট লাঠিটি রইলো উপটন্পার সম্পদ। । আর বাকি রইলো এই কাঠের জলপাত্র, অগ্নি উৎপাদক এই লৌহ ও প্রস্তর-খণ্ড, একখণ্ড ক্ষুদ্র বস্ত্র ও হাড়ের তৈরি ছোট চামচটি। আমার আসনের এই কাপড়টিও তোমরা ছোট ছোট ক'রে কেটে নিজেদের মধ্যে ভাগ ক'রে নিও। আমার দান যৎসামান্য—কিন্তু এদের মধ্যে আমার যে আশীর্বাদ ছড়ানো

আছে তার মূল্য নগণ্য নয়। এই তব বস্তু ছাড়াও আর একটি বৃহৎ সম্পদ আমার আছে। আমার সমস্ত জীবন ধরে আমি যত সোনা সংগ্রহ করেছি, সে সব জমানো আছে ওই অগ্নিকুণ্ডের নীচে। সে সমস্ত রইলো আমার প্রধান অপ্রধান সমস্ত শিষ্যশিষ্যার জন্য। অগ্নিকুণ্ডের তলদেশ খনন করলে সে ঐশ্বর্য উদ্ধার হবে : তারই মধ্যে লিখিতভাবে সে সব বণ্টনেরও নির্দেশ দেওয়া আছে। আমার দেহত্যাগের পরে তোমরা সমবেত প্রচেষ্টায় এই সমস্ত সঞ্চিত ঐশ্বর্য নিজেদের মধ্যে নির্দেশমত ভাগ ক'রে নিও।'

'তোমাদের প্রাত্যহিক দিনচর্যার বিষয়ে এইবারে আমার শেষ উপদেশ শ্রবণ করো। তোমাদের মধ্যে হয়তো এমন অনেকেই আছে যাদের ধারণা তারা কামনা-কলুষ-মুক্ত পবিত্রতায় অধিষ্ঠিত হয়ে গেছে ; কিন্তু তাদের ব্যবহারিক শুচিতার অভ্যন্তরে নাম বা খ্যাতির মোহ আত্মগোপন ক'রে আছে। মোহাচ্ছন্ন অন্ধের মত তারা ধর্মকর্ম দানধ্যান সবই করে—কিন্তু তাদের এ সমস্ত কর্মের আত্মাত্মিক মূল্য এক কাণাকড়িও যে নয় এ সংবাদ তারা জানে না। সৎকর্মের মধ্যে অসৎ উদ্দেশ্যের খাদ মিশিয়ে তারা সমস্ত কিছুকে ব্যর্থতায় পরিণত করে। এদের কাছে আমার এই মিনতি, যেন এরা মোহমুক্ত দৃষ্টি দিয়ে নিজের কর্মকে সৎপথে প্রতিষ্ঠিত করে। পৃথিবীতে লোভের অন্ত নেই, প্রত্যেকটি কর্তব্যের পাশ দিয়ে ছদ্মবেশী কামনারা মানুষকে পথভ্রান্ত ক'রে ছুটিয়ে নিয়ে বেড়ায়। সন্ন্যাসের পথ যারা গ্রহণ করেছে, তারা যেন এই প্রলোভন এড়িয়ে চলার মত শক্তি সঞ্চয় করে।

ভক্তেরা জিজ্ঞাসা করলেন, কিন্তু সন্ন্যাসী যারা তারা কি তবে লোকহিতার্থে কোন উদ্যমই করবে না ?' উত্তরে মিলা বললেন, 'সাধকের উদ্যমের কেন্দ্র একটি ছাড়া দুটি হওয়ার অর্থ নেই। লোকহিত ভালো কথা সন্দেহ নেই : তাকে অসার্থক বা অর্থহীনও বলি না। কিন্তু সাধক জীবনে সাধনার অতিরিক্ত অন্য কোন উদ্দেশ্যেরই স্থান

নেই। জীবন দীর্ঘ, উপকারপ্রার্থী লোকেরও সীমা সংখ্যা নেই; কাজেই সে সুযোগ বা সুবিধার অভাব না হবারই কথা। কিন্তু যার নিজের জীবনই অপরিণত, সে কার কোন উপকারে লাগছে? সর্বগ্রাসী অভাব যার জীবনকে সঙ্কুচিত ক'রে রাখলো, সে কাকে কতটুকু দিয়ে সাহায্য করতে পারবে?

শিষ্যেরা বললেন, 'কিন্তু একেবারে নিঃস্বার্থ ভাবে কারুর জন্য কিছু করলেও কি সন্ন্যাসধর্মের প্রত্যবায় হয়?' মিলা বললেন, 'নিশ্চয়ই নয়; কিন্তু তেমন নিঃস্বার্থ ভাবে পরোপকার করার মত মন হওয়াটাই যে অনেক পরের কথা। মনে হয়, আমি নিঃস্বার্থ; কিন্তু একটু তলিয়ে খুঁজে দেখলেই চোখে পড়ে সূক্ষ্ম স্থূল নানাবিধ স্বার্থের প্ররোচনা আছে সেই তথাকথিত নিঃস্বার্থতার অন্তরালে। আমাদের মন ছদ্মবেশ ধারনে ভারি চতুর, আত্মপ্রতারণা তার পক্ষে অতি স্বাভাবিক। সন্ন্যাসীর পক্ষে তাই সতর্ক হয়ে চলাই বিধি, কারণ তাহলে আর নিছক পরোপকারের আপাতসুন্দর মোহজালে জড়িয়ে পড়ার আশঙ্কা থাকে না। জনকল্যাণের কথা বলছো? সমগ্র জীবনের একটিমাত্র উদ্দেশ্যই তো জনকল্যাণ। তাই আমি বলি, জনকল্যাণই যদি করতে চাও—তার আগে নিজের জীবনে বুদ্ধত্বের উচ্চতম সত্তায় প্রতিষ্ঠিত হয়ে নাও; তখন দেখবে সমগ্র জীবজগৎ তোমার মুখাপেক্ষী হয়ে চেয়ে আছে।

'তাই আমি বলি, বিনম্র হও, পথের পরিত্যক্ত দৈন্যের বসনে দেহকে আবৃত করো, সুখাদ্যের স্পৃহা মন থেকে নির্মূল ক'রে দাও, খ্যাতির মোহ চিন্তা থেকে সম্পূর্ণভাবে অপসারিত করো; তপশ্চর্যার চাপে দেহমন নিপীড়িত হোক। এই কঠিন বেদনার পথ দিয়ে যে জ্ঞানের অভ্যুদয় হবে—মূল্য একমাত্র তারই। কঠিনের এই পথকে জীবনে যদি বরণ ক'রে নিতে পারো, তবেই তোমাদের জীবনের চরম লক্ষ্য সুগম হয়ে ধরা দেবে। প্রথমেই চাই পথপ্রদর্শক গুরু। যে

পথে চলতে চাও সে পথের নির্ভেজাল খাঁটি তত্ত্বটি প্রথমেই জেনে নিতে হয়। কেবল সংসার ত্যাগ ক'রে আত্মনিগ্রহ করলে কি হবে? কুপ্রবৃত্তিচয় যদি প্রশমিত না হয়, তা হলে ধর্মের বাঁধাবুলি আউড়ে কি লাভ? পথ ভালো ক'রে না জেনে, কেবল অধ্যবসায়ে ও আগ্রহে বিপথগামী হওয়ার সম্ভাবনাই অধিক। নিজের স্বার্থটাই যদি তোমার কাছে বড় হয়ে থাকে, তাহলে তো সন্ন্যাস ও সংসারে কোনরকম পার্থক্যই থাকে না। সর্বস্ব ত্যাগ যদি না করো, তাহলে ধ্যানের ফল কি ফলবে? নিজের ক্ষুধার্ত কামনা যদি শান্ত না হয়, তাহলে প্রাচুর্যে সুখ পাবে কেমন ক'রে? যখনই তোমার মন থেকে জাগতিক লাভের প্রত্যাশা ক্ষয় হয়ে যাবে—তখনই দেখবে তোমার পথের সমস্ত বাধা সরে গেছে। তখনই আসবে তোমার জীবনে প্রকৃত কল্যাণের শুভক্ষণ। তখনই তোমরা বিশ্বের কল্যাণে নিজেকে উৎসর্গ ক'রে ধন্য হতে পারবে। জীবন সাফল্যের সেই আনন্দলোকে তোমাদের সঙ্গে আবার আমার মিল হবে।'

এই কথা বলতেই মিলার স্বর রুদ্ধ হয়ে গেল। মহাযোগীর দেহ সমাধিমগ্ন হয়ে গেল।

মিলার দেহ স্থির, মুখে স্মিত হাসি, চোখদুটি অর্ধনিমীলিত—আসনে উপবিষ্ট মূর্তির পানে চেয়ে বোঝবার উপায় নেই তিনি কিভাবে আছেন। ব্রাহ্ম মুহূর্তে রজনী প্রভাতকল্পা—কিন্তু দিনের আলো তখনো পর্যন্ত অন্ধকারের বুক চিরে আবির্ভূত হয় নি। বিশ্বপ্রকৃতি যেন রুদ্ধ নিশ্বাসে আসন্ন মহাপ্রয়াণের অপেক্ষায় স্তব্ধ হয়ে আছে। জ্বল্‌জ্বল্ ক'রে জ্বলছে মহাশূন্যে জ্যোতিষ্কমণ্ডলীর মাঝখানে সপ্তর্ষির মহিমময় প্রকাশ। নিম্নে যতদূর দৃষ্টি যায় তুষারাবৃত হিমাদ্রিশিখর অনন্তের পানে ঊর্ধ্ববাহু হয়ে আছে। সমবেত জনসঙ্ঘের মুখে কথা নেই। সবাই অপলক নেত্রে মিলার মুখের পানে চেয়ে আছে। মিলার নিজের হাতে জ্বালানো ধুনির অগ্নিশিখার আলো পড়েছে মিলার মুখে। সেই

কম্পমান শিখায় মহাযোগীর পার্থিব দেহটি মনে হচ্ছে যেন জ্যোতির্ময় স্ফটিকের মত স্বচ্ছ।

দিনের আলো মহাব্যোম বিদীর্ণ ক'রে প্রকাশ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে সমগ্র গগনমণ্ডলে আলোর প্লাবন সহস্র বর্ণের বিচিত্র আলিম্পনে ছড়িয়ে পড়লো। নবোদিত সূর্যের প্রথম রশ্মিরেখা যেন কাঞ্চনজঙ্ঘার প্রতিফলনটিকে মিলার পূত দেহটির উপরে ন্যস্ত ক'রে অপরূপ জ্যোতির্মণ্ডলের সৃষ্টি করলো। সঙ্গে সঙ্গে পরিচিত পৃথিবীর রূপ যেন অকস্মাৎ পরিবর্তিত হয়ে গেল। সমস্ত আকাশ জুড়ে ফুটে উঠলো এক অপরূপ বর্ণাঢ্য সহস্রদল পদ্ম : মেঘে মেঘে, মুহূর্তে মুহূর্তে, বিকশিত হয়ে উঠলো তার আরক্তিম দলগুলি। আকাশে আকাশে ছড়িয়ে পড়লো হোলিখেলার মহোৎসব।

তথাগত বুদ্ধের পরিনির্বাণকালের নৈসর্গিক বিবর্তন কাহিনী যাঁদের স্মরণে ছিল, তাঁরাও কেবল স্তম্ভিত হয়ে মিলার বিগতপ্রাণ দেহের পানে চেয়ে রইলেন, কারণ মৃত্যুর এমন মনোহর রূপ তাঁরা আর কখনো প্রত্যক্ষ করেন নি। এই যদি মৃত্যু হয়, তাহলে এমন মৃত্যু কে না প্রার্থনা ক'রে। ১১৩৫ খৃষ্টাব্দে, ঠিক চুরাশি বৎসর বয়ঃক্রমকালে বুদ্ধের মত মিলাও লীলা সম্বরণ করলেন। কিন্তু এই মহাসমাধিই যে মৃত্যু সে কথা কারুরই মনে হ'ল না। এ কেমন মৃত্যু—যার উপরে করাল কালো অমঙ্গলের এতটুকু ছায়া কোথাও নেই? অনেকক্ষণ পরে, রূঢ় দিবালোকে সবাই যখন বুঝলো যে মিলার অমর আত্মা পার্থিব দেহ পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছে, তখন কারুর মনে বিন্দুমাত্র ভাবান্তর ঘটলো না। মিলার দেহত্যাগের সংবাদ দাবানলের মত উপত্যকাভূমির দিক্‌দিগন্তে ছড়িয়ে পড়লো। নিয়ানাম ও ব্রীনের অধিবাসীরা যে যেখানে ছিল দলে দলে চুবার্‌রের পুণ্যভূমির পানে পাড়ি দিল। প্রথমতঃ এই দুটি দলের মধ্যে মিলার মরদেহের অধিকার নিয়ে মনোমালিন্যের সূত্রপাত হ'ল, কিন্তু শেষ পর্যন্ত দৈবক্রমে এ ভাব স্থায়ী

হ'ল না। মিলার অন্তিম নির্দেশ ক্রমে তারা সম্মিলিত ভাবে রেচুংয়ের আগমনের অপেক্ষা করতে লাগলো। এইভাবে সেই উন্মুক্ত প্রান্তরে অগণিত নরনারী ছয় দিন ছয় রাত পর্যন্ত একভাবে রয়ে গেল; পূজা প্রার্থনা স্তোত্র গীতের সমন্বয়ে দেবভূমি অহোরাত্র মুখরিত হতে লাগলো।

আশ্চর্যের বিষয় মিলার মরদেহের কিছুমাত্র বৈলক্ষণ্য দেখা গেল না। কিন্তু সকলেই লক্ষ্য করলেন যেন দেহটি দিনে দিনে শিশু-বালকের দেহের মত ক্ষুদ্রাকার ধারন করছে এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্রমশঃ অধিকতর জ্যোতির্ময় হয়ে উঠছে ঃ সে জ্যোতি চন্দ্রালোকের মত স্নিগ্ধ —কিছুক্ষণ চেয়ে থাকলে আর চোখ ফেরানো যায় না। সকলেরই মনে আশঙ্কা জাগতে লাগলো হয়তো বা আরও দীর্ঘদিন অপেক্ষা করলে, এইভাবে ছোট হতে হতে দেহটি ক্রমে একেবারে নিশ্চিহ্ন হয়ে যাবে ঃ —কর্পূরের মত ক্ষয় হয়ে দৃষ্টিসীমার বহির্দেশে মিলিয়ে যাবে ঃ মরদেহের অগ্নিসংকার করা আর হবে না। কিন্তু মিলার শেষ আদেশ অগ্রাহ্য করাও তো চলে না। সবাই উৎকণ্ঠিতভাবে রেচুংয়ের আগমনের অপেক্ষায় পথ চেয়ে রইলেন।

মিলার মহাপ্রয়াণ-কালে রেচুং ছিলেন লরো-দল বিহারে। স্বপ্ন-যোগে মহাগুরুর দেহত্যাগের ইঙ্গিত পেয়ে তিনি তৎক্ষণাৎ যাত্রা করলেন। তিনি যেখানে অবস্থান করছিলেন সেখান থেকে চুবার-ক্ষেত্র প্রায় দু-মাসের হাঁটা পথ। অগত্যা সিদ্ধিশক্তির সহায়তায় এই দীর্ঘ পথ অতিক্রম ক'রে, তিনি মিলার দেহত্যাগের সপ্তম দিবসের প্রাতে চুবার সান্নিধ্যে এসে পৌঁছালেন। অত্যুচ্চ দীর্ঘ পথের সীমান্তে দাঁড়িয়ে চুবার-শিখরের পানে তাকিয়ে তিনি স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। নিসর্গের এমন অপরূপ শোভা কল্পনারও অতীত; আকাশে এত রঙ, বাতাস এত লঘু, পৃথিবী এত সুন্দর! এর পিছনে নিশ্চয়ই কোন গভীর রহস্য আছে। কি সে রহস্য অনুমান করতে গিয়ে বারং-

বার তাঁর পূর্বরাত্রির স্বপ্নের কথা মনে আসতে লাগলো। তবে কি গুরুদেব মরদেহ পরিত্যাগ ক'রে চলে গেছেন? তবে কি তাঁর সেই ইচ্ছাময়ের ইচ্ছা ছিল না যে দূরপ্রবাসী ভক্ত তাঁর শেষ দেখা পায়? রেচুং দু-হাতে মুখ ঢেকে বালকের মত উচ্ছ্বসিত হয়ে কেঁদে উঠলেন।

অন্তরীক্ষচারী করুণাময় গুরু আর দূরে থাকতে পারলেন না—রেচুংকে প্রবোধ দেবার জন্য সশরীরে প্রকট হলেন। বললেন, 'রেচুং, তুমি বড় দেরি ক'রে এলে!' সে স্বরে স্নেহ ঝরে পড়ছে—অনুযোগের লেশমাত্র নেই। রেচুং বললেন 'প্রভু, মাত্র গতরাত্রে আমি স্বপ্ননির্দেশ পেয়েছি।' মিলা বললেন, 'রেচুং, সেজন্য ক্ষোভের কিছু নেই। আমার দেহ তোমার জন্য অপেক্ষা ক'রে আছে। ধীরেসুস্থে তুমি এসো—আমি এগিয়ে যাই।' রেচুং গুরুর পাদপদ্ম মস্তকে ধারন করলেন। তাঁর সর্বাঙ্গে অভয়কর বুলিয়ে দিয়ে মিলা সেই পথের প্রান্ত থেকেই অদৃশ্য হয়ে গেলেন।

অনেকখানি পথ অতিক্রম ক'রে, বহুকষ্টে জনারণ্যের মধ্য দিয়ে পথ ক'রে রেচুং মিলার সমাধিস্থ দেহের কাছাকাছি পৌঁছে দেখলেন, বিশাল গুহাভ্যন্তরে শেষ কৃত্যের যাবতীয় সম্ভার থরে থরে সাজানো আছে। পবিত্র দেহটিকে রেচুং নিজের বক্ষে পরম ভক্তিভরে ধারন করার সঙ্গে সঙ্গে সকলেরই মনে হ'ল যেন বিগতপ্রাণ দেহে পুনরায় প্রাণসঞ্চার হয়েছে। সমগ্র জনতা উৎকর্ণ হয়ে শুনতে লাগলো মিলার কণ্ঠের অশরীরি বাণী: 'অ।নত্য দেহ সারাজীবন ধরে খুঁজে বেড়ায় ভোগসুখের উপকরণ; সেইজন্যই দেহা অনন্তকালেও তার পরম মুক্তির পথটি সন্ধান করতে পারে না। সকলের চেয়ে বড় অপরাধী এই দেহের ক্ষুধাকে, ভোগসুখের আমন্ত্রণকে তোমরা বর্জন করো।'

'এই ক্ষণভঙ্গুর দেহের আড়ালে আছে অসত্য মন। দেহের কামনাকে সত্য বলে মেনে নিয়ে, সেই মন নিজেকে দেহীর রূপে রূপান্তরিত করে বলেই নিজের প্রকৃত সত্তাকে উপলব্ধি করতে পারে

না। মনের প্রকৃত স্বরূপকে যেন তোমরা প্রত্যক্ষ ক'রে এই অজ্ঞানের বন্ধন থেকে মুক্তি লাভ করো।'

'বুদ্ধি নিজকৃত অজ্ঞানের ছদ্মবেশ ধারন ক'রে জ্ঞানের গর্বে উল্লসিত হয়ে থাকে বলেই, আত্মরক্ষায় তার নিয়ত প্রয়াস। কোথা থেকে কে এসে, কখন তাকে আঘাত করবে এই ভয়ে সন্ত্রস্ত হয়ে তার জীবন কাটে বলেই সত্যের সন্ধান সে পায় না। সাংসারিক ক্ষুদ্র বুদ্ধিকে বর্জন ক'রে তোমরা যেন পরাবুদ্ধির আশ্রয় লাভ করো।'

'আর এক অপরাধী এই স্বয়ম্ভু চৈতন্য, যে দেহের সাজে সজ্জিত হয়ে, নরলীলার অজ্ঞানতায় আত্মহারা হয়ে অবস্থান করে;—নিজের স্বরূপ বিস্মৃত হয়ে মনের দাসত্ব স্বীকার ক'রে নেয়।'

'মোহাচ্ছন্ন অজ্ঞানের তিমির গর্ভে, দুর্মতির প্রেরণায় হয় পাপের জন্ম। প্রিয় অপ্রিয়ের বোধজাত কর্মসংস্কার—সাম্য স্থাপনে বাধা দেয় বলেই, মন অভ্রান্ত ভূমিকে খুঁজে পায় না। প্রিয় অপ্রিয়ের মোহজাল বিদীর্ণ ক'রে, সত্যান্বেষী তোমরা নিজের সত্বাকে চিনে নাও। সূক্ষ্ম তর্কজালকে সদর্পে অস্বীকার ক'রে লোকাতীত অনন্ত সত্যকে জীবনে তোমরা প্রতিফলিত করো। জীবনের পরে জীবন—লোকের পরে লোক—একটিমাত্র চৈতন্যের বহুতর বিকাশ। সেই অখণ্ড, অভগ্ন, সমগ্র চৈতন্যের আলোয় পথ দেখে—সত্যপথযাত্রী পরম পথিক যেন সম্মুখের পথে এগিয়ে যায়।'

মিলার দেহ বিশাল কাষ্ঠস্তুপের উপরে শায়িত ক'রে তাতে এবার অগ্নিসংযোগ করা হ'ল। লেলিহান শিখা যেন আনন্দে নেচে উঠলো। শুষ্ক কাষ্ঠের মধ্যে কোথায় ছিল এত ধ্বনি, এত সৌরভের সমারোহ, এত রূপের সমন্বয়! আকাশে বাতাসে বেণু-বীণা মৃদঙ্গের ঐকতান বাজতে লাগলো। আধার অনুসারে প্রত্যেকেই নানাবিধ অলৌকিক দৃশ্য দেখতে লাগলো। সমস্ত রাত্রি এইভাবে কাটলো। প্রভাতে চিতাগ্নি নির্বাপিত হলে দেখা গেল চিতাস্থলে ভস্মাবশেষ

কোথাও কিছু নেই—পূতাস্থি সমেত সকল ছাই অন্তর্হিত হয়ে গেছে যে বিশাল গুহাটির মধ্যে মিলার দেহ ভস্মীভূত করা হয়েছিল, ত. মধ্যে এতটুকু অঙ্গারের চিহ্নমাত্র নেই।

মিলা অন্তিমকালে যে স্বর্ণভাণ্ডারের কথা বলে গিয়েছিলেন, এব শিষ্যেরা তারই সন্ধানে সচেষ্ট হয়ে উঠলেন। অগ্নিকুণ্ডের তলদে খনন ক'রে পাওয়া গেল একখানি ক্ষুদ্র বস্ত্রখণ্ডে মোড়া একটি ছো. ছুরি এবং ছোট একখণ্ড শর্করা। মিলার হাতে লেখা একটি পত্র পাওয়া গেল: তাতে লেখা আছে 'এই বস্ত্রখণ্ড ও শর্করাখণ্ড আমা তোমাদের কাছে শেষ দান। এই দুটি বস্তুই দৈবপ্রদত্ত এবং অক্ষয় এই ছুরিকার সাহায্যে বস্ত্রখণ্ডকে যতভাগেই কাটো এর শেষ হবে না: শর্করাখণ্ডও ফুরাবে না। যে কেহ এই শর্করা আস্বাদ করবে বা এই বস্ত্রখণ্ড স্পর্শ করবে, সাংসারিক ক্ষেত্রে তার আর অধোগতির সম্ভাবনা থাকবে না। মিলারেপার নামটি মাত্র যে শুনবে বা যে তাঁর জীবনকাহিনী পর্যালোচনা করবে—তার জীবনেও আধ্যাত্মিক উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। আমার সমগ্র জীবনের সাধনা আমি সমগ্র মানবতাকে দিয়ে গেলাম: যে যেখানে তৃষিত, যে যেখানে জিজ্ঞাসু, যে যেখা সত্যার্থী, আর্ত, প্রপীড়িত—উত্তরাধিকার সূত্রে আমি তারই।'